প্রকাশক
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রথম বাংলা সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, জুন ১৯৬০

মুদ্রক
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা-১৩

শ্রীনরেন্দ্রনাথ সিংহ

প্রীতিভাজনেষু

সূচিপত্র

খেলার রাজা দাদা

অতিকায় জাহাজখানার মধ্যরাত্রিতে নিউ ইয়র্ক থেকে বুয়েনার্স-এ যাত্রা করার কথা। শেষ মুহূর্তে মানুষের যেমন কর্মতৎপরতা বেড়ে যায় ঠিক তেমনিভাবে গোটা জাহাজখানাও কলরবে আর কর্মচাঞ্চল্যে মুখর হ'য়ে উঠেছে। যেসব দর্শনার্থীরা বন্ধুবান্ধবদের বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে এসেছেন তারা সব ভিড়ের মধ্যে ছিটকে পড়েছেন এদিক-ওদিকে। বালক-ভৃত্যরা উচ্চকণ্ঠে যাত্রীদের নাম ডাকতে ডাকতে সাধারণের ব্যবহার ঘরগুলোর মধ্য দিয়ে লঘু পায়ে ছোটাছুটি করছে, বোঁচকা-বুঁচকি, পার্সেল ও ফলের গাদাগুলোকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এখান থেকে সেখানে, দর্শনার্থীদের জন্যে নির্দিষ্ট পথ দিয়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছুটে বেড়াচ্ছে, এবং এসবের সঙ্গে তাল রেখে অবিরাম বেজে চলেছে জাহাজের অর্কেস্ট্রা। ডেকের যে অংশটায় যাত্রীরা পায়চারি ক'রে থাকেন, আমি ভিড় এড়িয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করছিলাম। ঠিক এই সময় কয়েকটা আলোর ছটা ঝিলিক মেরে ছড়িয়ে পড়ল আমাদের কাছাকাছি। স্পষ্টই বোঝা গেল যে, শেষ মুহূর্তে সাংবাদিকরা কোনো বিশিষ্ট একজন যাত্রীর ফোটো নিচ্ছেন। আমার বন্ধুটি সেই দিকে একবার দৃষ্টি তুললেন এবং মুচকি হেসে বললেন, "সেই বিচিত্র লোকটি, জেন্টোভিক এই জাহাজেই চলেছে দেখছি।"

আমার মুখের দিকে চেয়ে বন্ধুটি বুঝতে পারলেন যে, তাঁর কথার কোনো অর্থবোধই আমার হয়নি। তাই ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দেবার জন্য তিনি বললেন, "ঐ হচ্ছে বিশ্ববিজয়ী দাবা খেলোয়াড়, মির্কো জেন্টোভিক। যুক্তরাষ্ট্রের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রদর্শনী খেলা দেখানো শেষ ক'রে এখন চলেছে আর্জেন্টিনা বিজয়-অভিযানে।"

এই কথা বলতে গিয়ে বিশ্ববিজয়ী তরুণ দাবা খেলোয়াড়ের নামটাই যে শুধু মনে প'ড়ে গেল তা নয়, সেই সঙ্গে তার খেলোয়াড় জীবনের অদ্ভুত খ্যাতি সম্পর্কে কয়েকটা খুঁটিনাটি ঘটনাও মনে পড়ল। আমার চেয়ে আমার বন্ধুটি সংবাদপত্র পড়েন বেশি মনোযোগ দিয়ে। তাই তিনি নিপুণ হাতে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলিকে কাহিনীর সুতো দিয়ে ক্রমে ক্রমে গেঁথে তুললেন। প্রায়

বছর খানিক আগে জেন্টোভিক এক লাফে উঠে এল প্রবীণ ও প্রখ্যাত দাবা খেলোয়াড়দের সমপর্যায়ে। খ্যাতির দিক থেকে অ্যালেখিন, ক্যাপাব্লাঙ্কা, লাস্কের প্রভৃতির সঙ্গে তারও নাম করত সবাই। ন' বছর বয়সের সেই বালক প্রতিভা রেসেভস্কির কথা মনে পড়ে। উনিশ শো বাইশ খ্রীস্টাব্দে নিউ ইয়র্কে এসে দাবা খেলায় কৃতিত্ব দেখায় সে। তারপর এই নবাগত জেন্টোভিক উল্কার মতো খ্যাতির দ্যুতি ছড়িয়ে দেয় দাবা খেলার জগতে। জেন্টোভিকের বিদ্যাবুদ্ধির বহর দেখে গোড়াতে কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে, তার ভবিষ্যৎ এমন গৌরবোজ্জ্বল হবে। সে যে কোনো ভাষাতেই বানান ভুল না ক'রে একটি ছত্রও লিখতে পারে না তেমন গোপন খবরটাও অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হ'য়ে পড়ে। তার একজন সহকর্মী একদিন বিরক্ত হ'য়ে ব্যঙ্গোক্তি ক'রে ওঠে, "ও ছুঁড়ির সর্বাঙ্গের এ অক্ষর সমপরিমাণ।" তার বাবা ছিলেন যুগোস্লাভিয়ার পার্বত্যবাসী অত্যন্ত দরিদ্র। দানিয়ুব নদীতে নৌকো বাইতেন—মাঝিগিরি ছিল তার পেশা। শস্য-বোঝাই একটা স্টিমারের সঙ্গে ধাক্কা লেগে একদিন তার নৌকোখানা গেল ডুবে। তিনিও মারা গেলেন। সেই গ্রামের গির্জার পুরোহিত দয়াপরবশ হ'য়ে পিতৃমাতৃহীন বালকটির ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিলেন। জেন্টোভিকের বয়স তখন দশ। সে ছিল অত্যন্ত অলস প্রকৃতির। কথা বলত ধীর ও মন্থর গতিতে। গ্রামের স্কুলে সে পড়ত বটে, কিন্তু একটা কথাও তার মাথায় ঢুকত না। সেইজন্য পুরোহিত মশাই তাকে নিজেই বাড়িতে বসে পড়া শেখাবার চেষ্টা করলেন।

চেষ্টা তার সব ব্যর্থ হ'ল। যে লেখা তাকে অন্তত একশোবার শেখানো হয়েছে সেই লেখাই তাকে আর একবার লিখতে বললে জেন্টোভিক অর্থশূন্য উদাস দৃষ্টিতে আঁচড়গুলোর দিকে চেয়ে থাকত। অত্যন্ত সহজ বিষয়ের অর্থবোধও তার মগজে প্রবেশ করত না। চোদ্দ বছর বয়সেও সে আঙুল গুনে হিসেব করত, বই কি বা খবরের কাগজ পড়ত, তাও খুব কষ্ট ক'রে ক'রে। তাই ব'লে মির্কোর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ কেউ আনতে পারত না যে, সে অবাধ্য কিংবা অনিচ্ছুক প্রকৃতির বালক। যা কিছু ওকে করতে বলা হ'ত তা-ই সে করবার চেষ্টা করত—জল আনত, কাঠ কাটত, খেতখামারে কাজ করত, এমন কি রান্নাঘরও ধুয়ে-মুছে সাফ ক'রে দিত। তার ওপরে যে-কোনো কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করা চলত।

অত্যন্ত ধীরে-সুস্থে করলেও সব রকমের হুকুম পালন করতে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না তার। এই বোধবুদ্ধিহীন বালকটির যে-আচরণের দ্বারা দয়ালু পুরোহিত মশাই সবচেয়ে বেশি বেদনা বোধ করতেন তা হচ্ছে মির্কোর সক্রিয় সহযোগিতার সম্পূর্ণ অভাব। জোর ক'রে ঘাড়ে চাপিয়ে না দিলে সে কোনো কাজই করতে চাইত না। কোনোরকম প্রশ্ন করা তার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। সমবয়সী বালকদের সঙ্গে খেলা করবার প্রবৃত্তি হ'ত না। নিজে যেচে গিয়ে সে কাজ করবে এমন ইচ্ছাও কেউ কখনো তার মধ্যে দেখতে পায়নি। গৃহকর্ম শেষ ক'রে মির্কো অলস ঔদাসীন্যে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত আকাশের দিকে। চারণভূমির চরণ-নিরত মেষগুলির শূন্যগর্ভ দৃষ্টির সঙ্গে ওর চোখের তুলনা করা চলত। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিন্দুমাত্র যোগাযোগ ছিল না ওর। প্রতিদিন অভ্যাসমতো সান্ধ্যভোজ সেরে পুরোহিত মশাই যখন লম্বা পাইপে তামাক টানতে টানতে গ্রামের পুলিশ সার্জেন্টের সঙ্গে তিন বাজি দাবা খেলতেন, তখন এই গবচন্দ্রটি নিঃশব্দে ব'সে থাকত তাদের পাশে। ঘুম-চোখের ঘন পল্লবের তলা দিয়ে চক-কাটা ফলকের দিকে সে চেয়ে থাকত। অথচ দেখে মনে হ'ত, মির্কো বুঝি ঘুমোচ্ছে-- খেলার প্রতি বুঝি তার ঔদাসীন্যের সীমা নেই।

একদিন শীতকালের সন্ধ্যাবেলা দুজনাতে ব'সে তন্ময় হ'য়ে দাবা খেলছিলেন। মনে হ'ল একটা ঘোড়াগাড়ি ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ক্রমশঃ তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। সত্যিই তাই। গাড়ি থেকে নেমে এল একজন কৃষক। মাথার টুপিটি তার বরফে ঢেকে গিয়েছে। দ্রুত পায়ে সামনে এগিয়ে এসে পুরোহিতকে সে বলল যে, তার মা মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। এক্ষুনি তাকে একবার যেতে হবে। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারলে হয়তো মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তিনি শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে পারবেন। ধর্মযাজকটি তক্ষুনি রওনা হ'য়ে গেলেন। পুলিশ সার্জেন্ট তখন কি করেন—নতুন ক'রে তিনি পাইপে অগ্নিসংযোগ করলেন। গেলাসের বাকি বিয়ারটুকু শেষ ক'রে এবার উঠে পড়াই ভালো। মোটা চামড়ার বুট জুতোটা পরতে গিয়ে হঠাৎ তার নজরে পড়ল যে, অসমাপ্ত খেলার ছকটার দিকে মির্কো চেয়ে আছে অপলক দৃষ্টিতে।

তিনি জানতেন যে, কি ক'রে ঘুঁটি চালতে হয় তা এই গবচন্দ্রটির ধারণা নেই। তবুও পুলিশ সার্জেন্ট পরিহাসছলে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে ভায়া,

খেলাটা শেষ করতে চাও নাকি ?" মির্কো তার সলজ্জ দৃষ্টি তুলে সম্মতি জানাল এবং নিঃশব্দে পুরোহিতের জায়গাটাতে গিয়ে ব'সে পড়ল। চোদ্দ চালের পরে সার্জেণ্ট সাহেব হেরে গেলেন। তিনি মেনে নিলেন যে, কোনো আকস্মিক কারণে কিংবা অসতর্কতার জন্যে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়নি। মির্কো ওস্তাদের মতো খেলেই তাঁকে হারিয়ে দিয়েছে। আরও এক বাজি খেলা শুরু করলেন পুলিশ সার্জেণ্ট।

একটু পরেই পুরোহিত মশাই ফিরে এসে খেলার খবর শুনে বিস্মিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "অবাক কাণ্ড! এ যে দেখছি বালামের সেই গাধাটির মতো—", বাইবেলের ঘটনাবলী সম্বন্ধে সার্জেণ্টের বিশেষ কিছু জ্ঞান ছিল না ব'লেই ধর্মযাজকটি বাইবেলের কাহিনীটা উদ্ধৃত ক'রে বললেন যে, প্রায় দু' হাজার বছর আগে ঠিক এই রকমই একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল : বোবা গদভের মুখ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল জ্ঞানের কথা।

অনেক রাত হ'য়ে গিয়েছিল। তবুও পুরোহিত মশাই তাঁর এই নিরক্ষর সহকারীটিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান না ক'রে পারলেন না। খেলা শুরু হ'ল। মির্কো অতি সহজে পুরোহিতকেও হারিয়ে দিল। সে খেলল খুব ভেবে-চিন্তে। চালগুলো ধীরে ধীরে দিল বটে, কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা কি বা দুর্বলতা প্রকাশ পেল না। যতক্ষণ না খেলা শেষ হ'ল ততক্ষণ পর্যন্ত এক মুহূর্তের জন্যেও মির্কো তার চোখ দু'টি ওপরে তোলেনি, ছক-কাটা ফলকের মধ্যে আবদ্ধ ক'রে রাখল। বড় ওস্তাদের মতোই ঘুঁটি চালত সে। পরে বহুবার আরও খেলা হয়েছে। কিন্তু পুরোহিত মশাই কিংবা পুলিশ সার্জেণ্ট একটি বাজিও আর জিততে পারেননি।

এই আশ্রিত বালকটির নানাবিধ অক্ষমতা সম্বন্ধে পুরোহিতের অজানা কিছু ছিল না। তবুও তাঁর কৌতূহল হ'ল জানবার যে, মির্কো শুধুমাত্র তার দাবা খেলার প্রতিভার দ্বারা কঠোরতর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হ'তে পারবে কিনা। গ্রামের নাপিতকে ডেকে আনালেন পুরোহিত মশাই। মির্কোর চুল ছাঁটানো হ'ল। তারপর যখন মনে হ'ল একবার তাকে পাঁচজনের সামনে উপস্থিত করা যেতে পারে তখন তাকে স্লেগাড়িতে চাপিয়ে তিনি নিয়ে চললেন নিকটবর্তী এক শহরের দিকে। তিনি জানতেন ঐ শহরে মির্কোর চেয়েও বড় বড় দাবা খেলোয়াড় সব আছে। এবং এও তিনি জানতেন যে, বড় স্কোয়ারের সামনে

যে কাফেটা আছে সেখানে গেলে ঐসব দাবাড়েদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নিশ্চয়ই হবে। পুরোহিত মশাই যখন আড্ডায় ঢুকে পড়লেন বছর বয়স্ক কিশোর খেলোয়াড়টিকে এগিয়ে দিলেন, দাবাড়েদের দলটি তখন চঞ্চল ও সচকিত হ'য়ে উঠল। ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট গায়ে দিয়েছে মির্কো, পায়ে পরেছে মোটা বুট জুতো। লজ্জাবিনত মুখে নিঃশব্দে সে দাঁড়িয়ে রইল টেবিলের এক পাশে। তারপর খেলবার জন্য ডাক পড়ল তার।

পয়লা বাজি হেরে গেল মির্কো। হারবার অবশ্যি কারণ ছিল একটা। সে তার ওস্তাদকে কোনোদিনও সিসিলীয় পদ্ধতিতে আত্মরক্ষা করতে দেখেনি। তাই সে বিরুদ্ধ পক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারল না। পরের বাজি খেলতে বসল সবচেয়ে সেরা খেলোয়াড়ের সঙ্গে। এবার কোনো পক্ষেরই হার-জিত হ'ল না, হ'ল সমানে সমান। কিন্তু তৃতীয় বাজিতে এবং তারপর যতবারই খেলা হ'ল প্রত্যেকবারেই মির্কো হারিয়ে দিল সবাইকে।

যুগোস্লাভিয়ার ছোট ছোট শহরগুলিতে চাঞ্চল্যকর ঘটনা খুব বেশি ঘটে না। তাছাড়া এই গেঁয়ো ছেলেটির আবির্ভাবে এবং সে যে খ্যাতনামা খেলোয়াড়দের হারিয়ে দিয়েছে সেই খবর শুনে শহরের সর্বত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হ'ল। সর্বসম্মতিক্রমে স্থির করা হ'ল যে ছেলেটিকে পরের দিন পর্যন্ত ঐ শহরেই রেখে দেওয়া হবে। দাবা খেলার ক্লাবটিতে বিশেষ একটি অধিবেশন হবে ব'লে ঘোষণা করাও হ'ল। দাবা-পাগল কাউন্ট সিনৃজিক-কে আমন্ত্রণ ক'রে ডেকে আনবার ব্যবস্থা হ'ল। আশ্রিত বালকটির জন্যে পুরোহিতের মনে গর্বের আর সীমা ছিল না। কিন্তু রবিবার তাকে গ্রামের গির্জায় গিয়ে প্রার্থনাসভায় যোগ দিতে হবে ব'লে তিনি নিজে এখানে থাকতে পারলেন না। পরবর্তী পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার জন্যে ছেলেটিকে রেখে যেতে সম্মত হলেন তিনি। স্থানীয় দাবাড়ের দল জেণ্টোভিক-কে শহরের এক হোটেলে এনে তুলল। এর আগে সে কখনো হাতমুখ ধোওয়ার জন্যে আলাদা ঘর দেখেনি। হোটেলে এসে সেই সব দেখে বিস্মিত বোধ করল মির্কো।

রবিবার বিকেলবেলা দাবার আড্ডায় ভিড় জমল খুব। ঘরে আর তিল-ধারণের জায়গা নেই। এক নাগাড়ে চার ঘণ্টা ধ'রে খেলে গেল মির্কো। একটি কথাও সে বলল না, এক মুহূর্তের জন্যেও চঞ্চলতা প্রকাশ করল না, ধীরস্থিরভাবে ফলকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রাখল—আর এক এক ক'রে

প্রত্যেকটি খেলোয়াড় হেরে যেতে লাগল ওর কাছে। শেষ পর্যন্ত এক অদ্ভুত প্রস্তাব উপস্থিত করল খেলোয়াড়রা। এবার আর একের বিপক্ষে অপরের খেলা নয়। মির্কোকে একই সঙ্গে খেলতে হবে অনেকের বিপক্ষে। প্রস্তাবটা একেবারে আনকোরা নতুন। এই নতুন কৌশলের রহস্য বুঝতে সময় লাগল একটু। তারপর যখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পারল তখন আর মির্কোকে কেউ রুখতে পারল না। ভারি জুতোয় মচমচ আওয়াজ তুলে সে এ টেবিল থেকে উঠে অন্য টেবিলের ছকে গিয়ে চাল দিয়ে বেড়াতে লাগল। এবং সঙ্গে আটজনের বিপক্ষে খেলে গেল সে। সাতটি খেলায় জয়লাভ করল মির্কো।

এইভাবে দাবাড়েদের টনক নড়ে উঠল। গুরুতর পরামর্শ চলতে লাগল নিজেদের মধ্যে। ছেলেটি যদিও শহরের বাসিন্দে নয়, তবুও এদের মধ্যে জেগে উঠল এক অদ্ভুত জাতীয়তাবোধ। গর্বে স্ফীত হয়ে উঠল ওরা। শহরটা এত ছোট যে এর অস্তিত্ব এযাবৎকাল কারো চোখেই পড়েনি। এবার একটা মস্ত সুযোগ এসেছে। এখানকার প্রতিনিধি হিসেবে মির্কোকে যদি পৃথিবীর সুবিখ্যাত খেলোয়াড়দের সঙ্গে দাবা খেলতে পাঠানো যায় তাহলে পৃথিবীর মানচিত্রে এই ক্ষুদ্র শহরটির স্থান চিরস্থায়ী হবে।

ফোলার নামে একটি লোককে ডেকে আনা হল। নানারকম কাজের দালালি করত সে। স্থানীয় চিত্রানুষ্ঠানের জন্যে যে সব শিল্পীবৃন্দের প্রয়োজন হত তাদের যোগাড় করে নিয়ে আসত ফোলার। সে এসে বললে যে, ভিয়েনার একজন দাবা খেলার বিশেষজ্ঞের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। তাঁর কাছে ছেলেটিকে নিয়ে যাবে পেশাদারী খেলা শেখাবার জন্যে। বছর খানিক তার কাছে শিক্ষানবিসি করতে পারলে খেলার ত্রুটিবিচ্যুতি সব শুধরে নিতে পারবে মির্কো। কাউন্ট সিমজিক যদিও ষাট বছর ধরে প্রতিদিন দাবা খেলে আসছেন তবুও তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে, সারা জীবনে এমন একজন প্রবল প্রতিপক্ষের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেনি। অতএব জামিনদার হিসেবে তক্ষুনি তিনি চুক্তিপত্রে সই করে দিলেন। দানিয়ুব নদীতে নৌকো বাইত ওর বাবা। যেই মুহূর্তে কাউন্ট চুক্তিপত্রে সই করলেন সেই মুহূর্ত থেকেই এই মাঝির ছেলের চমকপ্রদ জীবনের সূত্রপাত হল।

দাবা খেলার প্রতিটি কলাকৌশল আয়ত্ত করতে মির্কোর মাত্র ছয় মাস সময় লাগল। কিন্তু একটা ত্রুটি তার তবু রয়েই গেল। ক্রমে ক্রমে এই

ত্রুটিটা খেলোয়াড়দের চোখে প্রকট হ'য়ে ওঠে এবং অনতিবিলম্বে ওকে কেন্দ্র ক'রে পরিহাসের প্রলয় বইতে থাকে। কোনো খেলাই সে মনে রাখতে পারত না। খেলোয়াড়ী পরিভাষায় যাকে 'গাইবী খেলা' বলে তেমন খেলা খেলতে পারত না মির্কো। চোখ বুজে ছক-কাটা ফলকটাকে কল্পনা করার ক্ষমতা ছিল না ওর। চৌষট্টিটা সাদা কালো চতুষ্কোণ ঘর, আর বত্রিশটা ঘুঁটি ওর চোখের সামনে থাকা চাই। যখন তার নামের খ্যাতি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে তখনও সে পকেটে ক'রে ছোট্ট একটা ছক-কাটা দাবার ফলক ব'য়ে বেড়াত। ফলকটা সামনে না থাকলে নতুন ক'রে একটা খেলার কৌশল গ'ড়ে তুলতে কিংবা কোনো সমস্যার প্রত্যক্ষ সমাধান করতে সে পারত না। প্রকৃতপক্ষে এই ত্রুটিটা এমন কিছু মারাত্মক নয়, তবুও দাবাড়েমহলে তাই নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্কের সৃষ্টি হ'ত খুব। কোনো খ্যাতনামা গায়ক অথবা বাদক যদি সামনে স্বরলিপি না রেখে গাইতে অথবা বাজনা পরিচালনা করতে না পারেন তাহ'লে রসিকমণ্ডলে যে ধরনের সমালোচনার সৃষ্টি হ'য়ে থাকে এও ঠিক তেমনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিরাট সাফল্য অর্জন করল মির্কো। সতেরো বছর বয়সেই গোটা হাঙ্গেরীর পুরস্কার পেয়েছে। যখন আঠারো তখন সে হাঙ্গারির সেরা খেলোয়াড়। যখন পৃথিবী জয় করল তখন তার বয়স মাত্র কুড়ি। যেসব দুঃসাহসিক খেলোয়াড়রা তাদের চিন্তা, বুদ্ধিবিবেচনা এবং কুশলতায় মির্কোর চেয়ে অনেক উঁচুতে ছিলেন তাঁরাও এর স্থূল ও বাস্তববুদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠলেন না—একে একে মির্কোর কাছে পরাজয় স্বীকার করলেন। এই সম্পর্কে নেপোলিয়ান আর হ্যানিবলের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এঁরা দু'জন বিশ্ববিখ্যাত যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও, নেপোলিয়ান হেরে যান অপদার্থ কুটুসাভের কাছে। আর হ্যানিবলের পরাজয় ঘটে ফেবিয়াসের মতো একজন জড়বুদ্ধি-সম্পন্ন মূর্খ লোকের হাতে। ঘটনাচক্রে এই গ্রাম্য চাষীর কাছে যেসব ওস্তাদ দাবা খেলোয়াড়দের নাজেহাল হ'তে হ'ল তাঁদের মধ্যে ছিলেন দার্শনিক, গণিতজ্ঞ এবং নানা ধরনের সৃজনশীল প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তির দল। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন দাবা-জগতের বিশেষজ্ঞ এবং সম্মানিত প্রতিনিধি। অথচ এঁদেরই জগৎটা সহসা আক্রমণ ক'রে বসল এমন একজন লোক যার কোনো পরিচয় নেই—একেবারে অচেনা! সুচতুর সাংবাদিকরাও এই চাষী-ছেলেটার

মুখ থেকে একটা কথাও বার করতে পারলেন না—গল্প তৈরি করবার উপাদান পেলেন না তাঁরা। তা সত্ত্বেও মির্কো সম্বন্ধে নানারকমের বিকল্প কাহিনী লোকমুখে প্রচারিত হ'তে লাগল সর্বত্র। যদিও সে অপ্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড় ছিল, তবুও যেই মুহূর্তে খেলা শেষ ক'রে উঠে পড়ত সে, তক্ষুনি তার চেহারাটা হ'য়ে পড়ত যাত্রার দলের সঙের মতো কিম্ভূতকিমাকার ও হাস্যোদ্দীপক। তার সাজসজ্জার মধ্যে কিছুমাত্র খুঁত ছিল না। মুক্তোখচিত গলার টাই-পিন আর সুন্দর ক'রে কাটা হাতের নখ থাকা সত্ত্বেও তার চালচলন ও হাবভাব ছিল গেঁয়ো লোকের মতো। যেন পুরোহিতের রান্নাঘর পরিষ্কার করাই ওর একমাত্র কাজ—এর তাতেই সে অভ্যস্ত। নিজের খ্যাতি এবং প্রতিভাকে শুধুমাত্র অর্থোপার্জনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করত সে। এক এক সময় তার অর্থলোলুপতার হীন মনোবৃত্তি এমনভাবে স্পষ্ট হ'য়ে উঠত যে, তার সহযোগীরা বিদ্রূপ ও বিরক্তি প্রকাশ না ক'রে পারতেন না। এক শহর থেকে অন্য শহরে ঘুরে বেড়াত মির্কো। থাকত সবচেয়ে শস্তার হোটেলে। মজুরি পেলেই যে-কোনো ক্লাবে গিয়ে ব'সে পড়ত দাবা খেলতে। বিজ্ঞাপনের জন্যে একটা সাবান তৈরির কোম্পানিকে সে তার নিজের ছবিও বিক্রি ক'রে দিয়েছিল। প্রতিযোগীদের নিন্দা বিদ্রূপের খবর তার কানে পৌঁছত না। তারা জানতেন যে, জেন্টোভিকের বিদ্যাবুদ্ধি কিছু নেই। গেলিশিয়ার একটি অভাবপীড়িত ছাত্র একবার দাবা খেলার দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা বই লিখে একজন ব্যবসাবুদ্ধিসম্পন্ন প্রকাশককে দেয় ছাপবার জন্যে। মির্কো তার অজ্ঞতার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে বই-এর ওপর নিজের নাম বসিয়ে দেয়। অর্বাচীনদের স্বভাবই এই যে, হাস্যকর ঘটনার তাৎপর্য তারা বুঝতে পারে না। বিশ্বজয়ী খেলোয়াড় হওয়ার পরেই জেন্টোভিকের ধারণা জন্মাল যে, পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সে গণনীয় ও মাননীয় ব্যক্তি। বিচক্ষণ ও খ্যাতনামা শিক্ষিত লোকদের সে পরাজিত করেছে এবং তাঁদের চেয়ে রোজগারও ওর বেশি। অতএব আত্মগর্বে ফুলে উঠল মির্কো। এবং গোড়ায় যে ওর অনিশ্চয়তা-বোধ ছিল, তাও আর রইল না।

জেন্টোভিকের শিশুসুলভ খ্যাতির ক্ষুধা সম্বন্ধে একাধিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করবার পর আমার বন্ধুটি বললেন, "এত দ্রুত খ্যাতি অর্জন করার পরে মগজহীন গবুচন্দ্রটির মাথাটা যে ঘুরে উঠবে না তেমন অসম্ভব আশা পোষণ

করা কি কারও পক্ষে সম্ভব? আর অহমিকার আতিশয্যে সে ফুলে উঠবেই বা না কেন? ওর গ্রামের সবাই মিলে সারা বৎসর কাঠ কেটে কষ্ট ক'রে যা রোজগার করে তার চেয়ে বেশি রোজগার করত মির্কো একা—তাও মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই। কষ্ট করতে হ'ত না, কুড়ি বছর বয়েসের যুবকটি শুধু ছকের ওপর ঘুঁটি চেলে যেত। তা ছাড়া, পৃথিবীতে রেমব্রাণ্ট, বিঠোফেন, দান্তে এবং নেপোলিয়নের মতো লোক জন্মেছিলেন সেই সম্বন্ধে তোমার যদি কোনো জ্ঞানই না থাকে তাহ'লে নিজেকে একজন বিরাট ব্যক্তিরূপে কল্পনা করা কি সহজ কাজ নয়? স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন লোকটির মাথায় শুধু একটা ধারণাই ছিল যে, গত কয়েক মাসের মধ্যে দাবা খেলায় একটা বাজিও সে হারেনি। এবং দাবা খেলা আর অর্থোপার্জন ছাড়াও যে জীবনের অন্য কোনো মূল্যবোধ থাকতে পারে তেমন কথা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারত না। অতএব আত্মগর্বে স্ফীত হ'য়ে ওঠবার মতো যথেষ্ট কারণ আছে বই কি।"

বন্ধুর কথা শুনে আমার কৌতূহল জাগল। যারা নির্দিষ্ট কোনো এক বিষয়ে উন্মত্তের মতো বিভোর হ'য়ে থাকতে পারে তাদের প্রতি চিরদিনই আমার প্রবল আকর্ষণ ছিল। আমার বিশ্বাস, যে ব্যক্তি যত বেশি কঠিনতর পরিবেশের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ ক'রে রাখতে পারে সে তত তাড়াতাড়ি তার সত্যানুসন্ধানের গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছতে পারে। এই ধরনের মানুষরাই সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কালক্রমে নিজের মধ্যেই সৃষ্টি করে বিশিষ্ট এক জগৎ। সেই ছোট্ট জগৎটাতে ডুবে থাকে তারা—স্তূপে আবদ্ধ বল্মীকের মতো একান্তে কাজ ক'রে চলে। আমার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনো কিছু আর গোপন করলাম না। রিয়ো পর্যন্ত পৌঁছতে বারো দিন লাগবে। একই জাহাজের যাত্রী আমরা। অতএব ঠিক করলাম যে, এই বারোটা দিন আমার কাজ হবে, ঐ একপেশে বুদ্ধিসম্পন্ন লোকটাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

বন্ধুটি আমায় সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেন, "মনে হয় তোমার উদ্দেশ্য সফল হবে না। আমি ভালো ক'রেই জানি যে, আজ পর্যন্ত কেউ ওর মনের কথা জানতে পারেনি। মনস্তাত্ত্বিক গবেষণার উপাদান খুঁজে পাওয়া অসম্ভব হয়েছে। ত্রুটিবিচ্যুতি ওর যতই থাকুক না কেন, এই ধূর্ত ক্ষেত-মজুরটি জানে যে, কি ক'রে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে হয়। উপায়টা খুবই সোজা। নিজের সমব্যবসায়ীদের সঙ্গে অতি সাধারণ সরাইখানায় দেখা-সাক্ষাৎ করা

ছাড়া বাইরের অন্য কোনো লোকের সঙ্গে সর্বপ্রকার আলোচনা সযত্নে এড়িয়ে চলে জেণ্টোভিক। যখনই সে টের পায় যে, আশেপাশে কোনো শিক্ষিত লোক এসে উপস্থিত হয়েছেন তখনই সে গুটিপোকার মতো নিজের খোলের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে আত্মগোপন করে। সেই কারণেই কেউ বলতে পারবেন না যে, মির্কোকে তিনি নির্বোধের মতো কথা বলতে শুনেছেন। অথবা এমন কথাও তাঁর পক্ষে ব্যক্ত করা অসম্ভব যে, জেণ্টোভিকের অন্তহীন অজ্ঞতার আঁচ পেয়েছেন তিনি।"

প্রকৃতপক্ষে বন্ধুটি আমার ঠিক কথাই বলেছিলেন। জাহাজ ছাড়বার পর প্রথম ক'দিন তার কাছে এগোতে পারা গেল না। যদিই বা পারলুম তাও একরকম গায়ে প'ড়ে। এরকম গায়ে প'ড়ে কারো সঙ্গে আলাপ করা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। মাঝে মাঝে তাকে ডেকের ওপর পায়চারি করতে দেখতুম। হাত দুটো পেছন দিকে দিয়ে গুরুগম্ভীরভাবে যেন আত্মচিন্তায় ডুবে থাকত সে। ভঙ্গিটা তার নেপোলিয়নের একটা অতি-পরিচিত ছবির সঙ্গে মিলে যায়। তার দেখা পাওয়াই একটা দুরূহ ব্যাপার ছিল। ধূমপানের অথবা মদ্যপানের ঘরে সে আসত না। এমন কি বিশ্রামকক্ষেও তাকে দেখতে পাওয়া যেত না। জাহাজে যারা খাবার পরিবেশন করে তাদেরই একজনের কাছে গোপনে খোঁজ নিয়ে জানলাম যে, জেণ্টোভিক তার নিজের কেবিনে প্রায় সারাটা দিনই ব'সে থাকে দাবার ছকটি সামনে নিয়ে। পুরনো খেলাগুলোর মহড়া দেয়, আর সেই সঙ্গে নতুন সমস্যার সমাধান খোঁজে।

তিন দিন পরে আমার রাগের মাত্রা গেল বেড়ে। আমি যতই তার কাছে এগিয়ে যেতে চাইছি ততই যেন ওর আত্মরক্ষার ছলাকলা দুর্ভেদ্য হ'য়ে উঠছে। এর আগে কোনো বিখ্যাত দাবাড়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটেনি আমার। আজ তাই বিশেষ ক'রে ঐ লোকটির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভেবে আমি কূলই পেলুম না যে, লোকটার বুদ্ধিবৃত্তি বিশ্বসংসারের সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কি ক'রে শুধু ঐ চৌষট্টিটা সাদা কালো চতুষ্কোণ ঘরের মধ্যে আজীবন আবদ্ধ হ'য়ে আছে! রাজকীয় এই খেলার মধ্যে যে রহস্যজনক আকর্ষণ বিদ্যমান সে সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল। মানুষ যত রকমের খেলা আবিষ্কার করেছে তার মধ্যে খেলার রাজা

দাবা-ই শুধু দৈবের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর নির্ভর করে না। বিশেষ ধরনের মানসিক উৎকর্ষের ওপরই খেলার কৃতিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু দাবাকে শুধু 'খেলা' হিসেবে বিবেচনা করলে একে খুব খাটো করা হয় না কি? দাবা খেলা শুধু বিজ্ঞান কিংবা বিশেষ একটি প্রায়োগিক কৌশল নয়, শিল্পও। এ খেলা চিরপুরাতন, অথচ চিরনূতন; অভ্যাসপ্রসূত যন্ত্রচালিত বটে, কিন্তু কল্পনাশক্তিরও প্রয়োজন প্রচুর, জ্যামিতিক চতুষ্কোণের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আবার অনন্ত প্রসারতার মধ্যে এর বুদ্ধির বিচরণভূমি; নূতন কৌশল প্রয়োগের অবকাশ অনেক অথচ বন্ধ্যা; চিন্তার উৎকর্ষ আছে, কিন্তু তার সিদ্ধির তৃপ্তি নেই, গাণিতিক কৃতিত্ব থাকলেও তার ফল কিছু থাকে না; এ শিল্প, অথচ সৃষ্টি নয়; এতে ভাস্কর্যের মহিমা আছে কিন্তু বস্তু নেই। পরস্পর-বিরোধী বহু গুণের এক বিচিত্র সমাবেশ বুকে নিয়ে মহম্মদের শবাধারটির মতো এ যেন স্বর্গমর্ত্যের মাঝখানে নিত্য দোদুল্যমান। তা সত্ত্বেও দাবা খেলা দুর্মর। পৃথিবীর বড় বড় কীর্তি এবং মহৎ গ্রন্থের চেয়ে এর আয়ু কোনো অংশে কম নয়। বরং দীর্ঘস্থায়ী। দাবাই একমাত্র খেলা যার আসর পাতা আছে সব দেশে এবং সব যুগে। কেউ জানে না কোন্ মহাগুরুর কৃপায় এই খেলাটি মানবসমাজে প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল। দাবার চালে জীবনের এক-ঘেয়েমি কাটে, মননের উৎকর্ষ বাড়ে, নীরস মেজাজ উদ্দীপনায় সজীব হ'য়ে ওঠে। তবুও যেন প্রশ্ন জাগে মনে কোথায় এর শুরু আর কোথায় এর শেষ। খেলার নিয়মকানুন এত সহজ যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত অনায়াসে শিখতে পারে। অকর্মণ্য লোকেরা আবার এর প্রলোভন এড়াতে না পেরে খেলার মধ্যে ডুবেও যায়। অথচ এই অপরিবর্তনীয় দাবার চতুষ্কোণ ঘরগুলি থেকে তৈরি হয় এমন এক ধরনের ওস্তাদ যার সঙ্গে অন্য কোনো খেলোয়াড়ের তুলনাই হয় না। এরা জন্মেছে শুধু দাবা খেলবার জন্যেই। গণিতজ্ঞ, কবি এবং সংগীত রচয়িতারা যেমন এক একজন বিশেষ ধরনের প্রতিভাবান ব্যক্তি, এরাও ঠিক তাই—দূরদৃষ্টি, ধৈর্য ও কলাকৌশলের বিশিষ্টতায় অনন্য। অবিশ্যি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, এরা একস্তরের মানুষ নয়। যে যুগে দেহতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা চলত তখন যদি কেউ এইসব ওস্তাদ দাবাড়ীদের মাথা চিরে পরীক্ষা করবার চেষ্টা করতেন তাহ'লে দেখতে পেতেন যে, এদের মাথায় সত্যিই এক বিশেষ ধরনের মাংসপেশী আছে যার প্রয়োজন শুধু দাবা

খেলবার জন্যেই। অপরের মাথায় এই মাংসপেশী গজায় না। কোনো দেহতত্ত্ববিদ জেন্টোভিকের মস্তিষ্ক পরীক্ষা করতে গিয়ে যদি দেখতে পেতেন যে, তার নিশ্প্রাণ প্রস্তরীভূত বুদ্ধিবৃত্তির মাঝখানে শুধু একটিমাত্র প্রতিভা সূক্ষ্ম স্থতোর মতো ভেসে রয়েছে তাহ'লে তিনি চমৎকৃত না হ'য়ে পারতেন না। এ যেন এক প্রাণহীন শৈলস্তরের মধ্যে সোনার রেখা!

কিন্তু আমি বুঝতে পারি না যে, একজন স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কি ক'বে তার জগৎটাকে কেটে-ছেঁটে ক্রমে ক্রমে ছোট্ট একটা সাদা কালো ছক-কাটা ফলকের মধ্যে এনে সংকুচিত ক'রে ফেলে। তাও ফলকের ওপর পথটা তার একমুখো। পথেব ওপর দিয়ে বত্রিশটা ঘুঁটি সামনে-পেছনে চালতে চালতে সে কামনা কবে জীবনের চূড়ান্ত জয়লাভ। মন যাব সচল ও সক্রিয় তেমন একজন লোক দশ, বিশ, এমন কি ত্রিশ চল্লিশ বছর ধ'বে অবিশ্রান্তভাবে নিজের সবটুকু মানসিক শক্তি দিয়ে একটা কাঠের তৈরি ছক-কাটা ফলকের ওপর কাঠেরই তৈবি রাজাকে কোণঠাসা করবাব চেষ্টা ক'রে যাচ্ছে, এ তত্ত্ব আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না! এদের এই প্রচেষ্টা আমাব কাছে হাস্যকর মনে হয়।

প্রকৃতির দুর্বোধ্য খেয়ালপ্রসূত সেইবকম একটি বিচিত্র জীবকে এই বোধহয় সর্বপ্রথম আমি নিজের এত কাছাকাছি পেয়ে গিয়েছি। তার ও আমার মাঝখানে মাত্র গোটা ছয় কেবিনের ব্যবধান। এই ধরনেব মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা সম্বন্ধে আমার তো আগ্রহের আর সীমা ছিল না—কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য আমাব যে, এতো কাছে পেয়েও লোকটির সান্নিধ্য লাভে বঞ্চিত হচ্ছি আমি। অদ্ভুত সব ফন্দী আমার মাথায খেলতে লাগল। ভাবলুম, প্রসিদ্ধ এক সংবাদপত্রের প্রতিনিধি হিসেবে তার সাক্ষাৎপ্রার্থী হ'য়ে জেন্টোভিকের দম্ভের মাত্রা বাড়িয়ে দিই। আমি জানি তার টাকার লোভ প্রচণ্ড। তাকে যদি বলি, স্কটল্যাণ্ডে আমরা প্রদর্শনী খেলা দেখিয়ে বেড়াব? এবং তাতে আয়ের সম্ভাবনা প্রচুর? শেষ পর্যন্ত ভাবলুম, শিকারী যেমন পাখির কণ্ঠস্বর অনুকরণ ক'রে তাদের প্রলুব্ধ করে, আমিও তেমনি ওস্তাদ দাবাড়ের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্যে নিজেকে একজন দাবা খেলোয়াড় ব'লে জাহির করি না কেন?

দাবা আমি খেলি বটে, কিন্তু এর নেশাব মধ্যে আমি কখনও ডুবে যাইনি।

তার কারণ, এটা আমার কাছে একটা অবসর বিনোদনের উপায় ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। ঘণ্টা খানিকের জন্যে খেলতে বসলেও কখনই আমি ভাবি না যে, মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে নিজেকে পীড়িত ক'রে তুলছি। বরং এর ঠিক উল্টোটাই হয়। শ্রান্তি আর মানসিক উৎকণ্ঠা দূর করবার জন্যেই খেলতে বসি। দাবাকে আমি শুধু খেলা হিসেবেই দেখি। অথচ এর সত্যিকারের অনুরক্তদের কাছে দাবা খেলা একটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপার। প্রেমের খেলার মতো দাবাও একা একা খেলা যায় না। কিন্তু আমি তখন পর্যন্তও জানতুম না যে, জাহাজে অন্য কোনো দাবা-প্রেমিক আছে কিনা। অপরিচয়ের বিবর থেকে টেনে বার করবার জন্যে আমি একটা মামুলি ধরনের ফাঁদ পাতলুম। আমার স্ত্রী আমার চেয়েও কাঁচা খেলোয়াড়। তবুও তাঁকেই জুড়ি হিসেবে সঙ্গে নিয়ে ধূমপানের ঘরে চ'লে এলুম আমি। তারপর একটা দাবার ছক নিয়ে খেলতে বসলাম আমরা। মনে মনে জানি এটা সত্যিকারের খেলা নয়, জেণ্টোভিক-কে ধরবার জন্য জাল ফেললাম আমরা। সত্যি সত্যি ফাঁদ পাতা সার্থক হ'ল বুঝি! ছ'টি মাত্র চাল দিয়েছি এমন সময় একজন পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। একজন তো খেলা দেখবার জন্যে অনুমতি চাইলেন। অচিরে বাঞ্ছিত একজন জুড়ি এসে উপস্থিত হলেন ধূমপানের ঘরে। ভদ্রলোকটির নাম ম্যাকআইভার। স্কটল্যাণ্ডের লোক ইনি। ইঞ্জিনিয়ার। শুনলাম, ক্যালিফোর্নিয়ায় মাটি খুঁড়ে তেলের খনি আবিষ্কার করেছেন এবং তা থেকে প্রচুর পয়সাও উপার্জন করেছেন তিনি। বেশ গাঁট্টাগোট্টা চেহারার লোকটি। চৌকোণ চোয়ালের ওপর বসানো রয়েছে দৃঢ়সংবদ্ধ দাঁতের সারি; গায়ের চামড়া এত বেশি আরক্তিম যে, মনে হয় অত্যধিক পরিমাণে মদ্যপান করেন তিনি। খেলবার সময় তাঁর পালোয়ানের মতো প্রশস্ত কাঁধ দুটো অপ্রীতিকরভাবে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। ম্যাকআইভার এমন এক বিশেষ জাতের মানুষ যাঁরা জীবনে শুধু জয়মাল্যেরই সন্ধান পেয়েছেন, পরাজয়ের স্বাদ পাননি। সামান্য একটা নির্দোষ প্রতিযোগিতায় হেরে গেলেও এঁরা মনে করেন, আত্মমর্যাদার জগৎটা বুঝি ভেঙেচুরে ধূলিসাৎ হ'য়ে গেল। যে-কোনো উপায়ে সাফল্য-লাভে অভ্যস্ত এই মানুষটি নিজের সম্বন্ধে এত বেশি উচ্চ ধারণা পোষণ করেন যে, বিন্দুমাত্র বাধা পেলেই তিনি ভাবেন তাঁকে বুঝি অপমান করা হ'ল।

প্রথম বাজি হেরে যাওয়ার পর মুখ গোমড়া ক'রে ব'সে রইলেন। তারপর তিনি উদ্ধত মেজাজে পরাজয়ের কারণটা সবিস্তারে বিবৃত করতে গিয়ে বললেন যে, মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ার দরুন প্রথম বাজিটা হেরে গেলেন। পরের বাজিটাও জিততে পারলেন না। তখন তিনি বললেন যে, পাশের ঘরে এত বেশি গণ্ডগোল হচ্ছিল ব'লেই মাথা ঠিক রেখে চালগুলো দিতে পারেননি তিনি। প্রতিটি পরাজয়ের পরেই প্রতিশোধের স্পৃহা তাঁর বাড়তে থাকে। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী গোমড়া-মুখো লোকটির কাণ্ড দেখে প্রথম প্রথম একটু আমোদ উপভোগ করছিলুম। কিন্তু সময় যত পার হ'য়ে যেতে লাগল ততই আমার মনে হ'তে লাগল যে, আমোদ উপভোগ করা তো আমার আসল উদ্দেশ্য নয়। আমি খেলতে বসেছি শুধু সেই ওস্তাদ খেলোয়াড়টিকে প্রলোভন দেখিয়ে টেবিলে টেনে আনবার জন্যে। এবং যতক্ষণ না সেই উদ্দেশ্য আমার সফল হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ম্যাকআইভারের সঙ্গে আমায় খেলতেই হবে।

তৃতীয় দিন যখন আমরা খেলতে বসলুম তখন জেন্টোভিক আমার ফাঁদে প্রায় পা দিয়ে ফেলেছিল আর কি! ডেকে পায়চারি করতে করতে হয়তো আমাদের সে দেখতে পেয়েছিল। কিংবা নিজের উপস্থিতির দ্বারা ধূমপানের ঘরটিকে ধন্য করবার উদ্দেশ্যে এখানে এসে উপস্থিত হ'ল জেন্টোভিক। যাই হোক, সে যেই মুহূর্তে বুঝতে পারল আমরা তার কারবারে অনধিকার হস্তক্ষেপ দ্বারা ছেলেমানুষি করছি তখুনি সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু এগিয়ে এল আমাদের দিকে। এগিয়ে এল বটে, কিন্তু খানিকটা ইচ্ছাকৃত ব্যবধানও সৃষ্টি করল সে। আমি টের পেলুম, ছক-কাটা দাবার ফলকটির ওপর একবার সে তার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ফেলল। সেই সময় ম্যাকআইভার তাঁর নিজের চাল দিচ্ছিলেন। একটা মাত্র চাল দেখেই জেন্টোভিক বুঝতে পারল যে, আমাদের এই অপেশাদারী খেলা তার মতো একজন বিশেষজ্ঞের মনোযোগ আকর্ষণ করার যোগ্যই নয়। যতটুকু দেখেছে তাই যথেষ্ট। লাইব্রেরিতে ঢুকে কোনো একটা বাজে গোয়েন্দা গল্পের বই হাতে পড়লে আমরা যেমন তার পাতা পর্যন্ত উল্টে দেখি না, জেন্টোভিকও ঠিক তেমনি অবজ্ঞাভরে আমাদের দিকে পেছন ফিরে ঘুরে দাঁড়াল এবং তারপর একটি কথাও না ব'লে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার উপেক্ষাভরা অকরুণ দৃষ্টির

খোঁচা খেয়ে মনটা আমার বিকৃত হ'ল। মনের ভার লাঘব করবার উদ্দেশ্যেই ম্যাকআইভারকে বললুম, "তোমার চাল দেখে ওস্তাদ খুশি হন নি।"

"কে ওস্তাদ?"

আমি বললুম, "যে লোকটি আমাদের খেলার দিকে অপ্রসন্ন দৃষ্টি ফেলে এইমাত্র এখান থেকে চ'লে গেল। জেণ্টোভিক এর নাম—বিশ্ববিজয়ী দাবা খেলোয়াড।" একটু থেমে ম্যাকআইভারকে আমিই বললুম আবার যে, তার উপেক্ষা আমাদের গায়ে লাগবে না। তেল যদি না জোটে গরিবরা শুধু জল দিয়েই রান্না করে খায়। আমি সবিস্ময়ে দেখলুম আমার এই সাধারণ কথাগুলোর ফলে অপ্রত্যাশিত এক ব্যাপার ঘ'টে গেল। ম্যাকআইভার তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। আমরা যে খেলছিলুম তাও তিনি ভুলে গেলেন। বিশ্বজয়ী দাবাড়ের সঙ্গে খেলবার জন্যে আকাঙ্ক্ষা তার প্রবল হ'য়ে উঠল। তিনি জানতেন না যে জেণ্টোভিক এই জাহাজেরই যাত্রী। তার সঙ্গে অন্তত এক বাজি খেলতেই হবে। জীবনে তিনি মাত্র একবারই একজন সুবিখ্যাত খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাও তাতে তিনি একা তার জুড়ি হিসেবে খেলতে পারেননি। তিনি ছিলেন চল্লিশ-জনের মধ্যে অন্যতম। ম্যাকআইভারের মনে পড়ল, তবুও সেই খেলায় উত্তেজনার অন্ত ছিল না। শুধু কি তাই? তিনি প্রায় কিস্তি মাত ক'রে ফেলেছিলেন আর কি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি জেণ্টোভিককে চিনি? বললুম, না। আমি কি তাকে খেলবার জন্যে আমন্ত্রণ করতে পারি? বললুম পারি না। আমি জানতুম জেণ্টোভিক নতুন লোকের সঙ্গে পরিচিত হ'তে কুণ্ঠা বোধ করে। তা ছাড়া তৃতীয় শ্রেণীর একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে অত বড় একজন বিখ্যাত জবরদস্ত খেলোয়াড় খেলবেই বা কি? তাতে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ থাকত না। ম্যাকআইভারের মতো একজন দাম্ভিক লোকের কাছে 'তৃতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড়' কথাটা উল্লেখ করা উচিত হয়নি। বিরক্ত বোধ করলেন তিনি। চেয়ারে গা এলিয়ে বসে রূঢ় ভাষায় তিনি ঘোষণা করলেন যে, একজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে খেলবার জন্যে বিনীত আহ্বান পেলে জেণ্টোভিক প্রত্যাখ্যান করবে না বলেই তাঁর বিশ্বাস। প্রত্যাখ্যান যেন না করে তার জন্যে তিনি নিজেই এবার চেষ্টা করবেন। ওস্তাদের চেহারার খানিকটা বর্ণনা শুনেই ম্যাকআইভার ঝড়ের

বেগে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আমাদের অসমাপ্ত খেলার কথাটা মনেও রইল না তাঁর। ডেকের দিকে ছুটে গিয়ে জেণ্টোভিক-কে পাকড়াও করবার জন্যে অধৈর্য হ'য়ে উঠলেন তিনি। ভেবেছিলাম বাধা দিই তাঁকে। কিন্তু এবারও আমার মনে হ ল, এই দুর্জয় শক্তিসম্পন্ন মানুষটিকে প্রতিনিবৃত্ত করা অসম্ভব। বিশেষ ক'রে তিনি যখন তাঁর উদ্দেশ্যসাধনে মন একবার স্থির ক'রেই ফেলেছেন।

গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে আমি প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। প্রায় মিনিট দশেক পরে ফিরে এলেন ম্যাকআইভার। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে মনে হ'ল, মেজাজ তার ভালো নয়। একটু পরেই জিজ্ঞাসা করলুম, "কি হ'ল, মশাই ?" বিরক্তির সুরে জবাব দিলেন তিনি, "আপনি ঠিকই বলেছিলেন লোকটা অভদ্র। নিজের পরিচয় নিজেই দিলুম। তাতেও লোকটা করমর্দন করবার জন্যে হাতটা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিল না। আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করলুম যে, আমাদের সঙ্গে দু'এক বাজি দাবা খেললে আমরা সবাই গর্বিত ও সম্মানিত বোধ করব। লোকটা কাঠখোট্টার মতো কড়া মেজাজে বললে যে, সে দুঃখিত, খেলা অসম্ভব। তার এজেণ্টের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর করা আছে, পারিশ্রমিক ছাড়া সে কারো সঙ্গেই দাবা খেলতে পারবে না। তার ন্যূনতম পারিশ্রমিক, প্রতিটি খেলার জন্যে দু শো পঞ্চাশ ডলার।"

কথা শুনে হেসে ফেললুম আমি। একটা লোক যে শুধু কালো ঘর থেকে সাদা ঘরে ঘুটি চেলে চেলে এত টাকা আয় করতে পারে তেমন কথা আমি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারিনি। অবশেষে আমি মন্তব্য করলুম, "আশা করি, বিদায় নিয়ে আসবার সময় আপনিও তার মতো সৌজন্য প্রকাশে কার্পণ্য করেননি।"

আমার রসিকতার কথা শুনেও ম্যাকআইভারের অটুট গাম্ভীর্য বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হ ল না। তিনি বললেন, "খেলা হবে আগামী কাল বেলা তিনটের সময়। এই ধূমপানের ঘরেই খেলতে বসব আমরা। আশা করি আমাদের সে অতি সহজেই কেটেকুটে মাংসখণ্ডে পরিণত করতে পারবে না।"

"অবাক কাণ্ড! আপনি কি তাকে দু'শো পঞ্চাশ ডলার পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হ'য়ে এসেছেন ?"

"কেন হব না, বলুন ? খেলাটা তো তার পেশা। আমার যদি এখন

দাঁতব্যথা শুরু হয় তাহ'লে জাহাজের কোনো সহযাত্রী ডেন্টিস্টকে কি বলব, বিনে পয়সায় দাঁত তুলে দিতে? মোটা পারিশ্রমিক দাবি করা তার পক্ষে অন্যায় হয়নি।" যে-কোনো লাইনের বিখ্যাত লোকেরা ঝানু ব্যবসাদার। আমার নিজের তো ধারণা, ব্যবসার মধ্যে জটিলতা যত কম থাকবে ব্যবসা হবে তত ভালো। আমি বরং নগদ টাকা ফেলে দিয়ে কাজ করিয়ে নেব, কিন্তু হাত পেতে তোমার ঐ জেণ্টোভিকের দয়ার দাক্ষিণ্য গ্রহণ ক'রে বিনিময়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সুযোগ নিতে চাইব না। যাই হোক, ক্লাবে গিয়ে কতদিন তো দু'শো পঞ্চাশ ডলারের বেশি হেরে গিয়েছি, কিন্তু দিগ্বিজয়ী কোনো খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তৃতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড় যদি জেণ্টোভিকের কাছে হেরেই যায় তাতে লজ্জার কি আছে।"

'তৃতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড়' কথাটা আমিই উল্লেখ করেছিলাম। এখন বুঝলাম, ম্যাকআইভারের আত্মগরিমায় আঘাত লেগেছে খুব। কৌতুক বোধ না ক'রে পারলুম না। শেষ পর্যন্ত ভাবলুম, লোকটির অপূর্ণ উচ্চাশা সম্বন্ধে রসিকতা আর না করাই ভালো। বিশেষ ক'রে তিনি নিজেই যখন গৌরী সেন সেজে ব'সে আছেন, টাকা খরচ করতে রাজী তখন আমার পক্ষে আর কোনো মতামত না দেওয়াই ভালো। এই সুযোগে বিচিত্র ঐ জীবটির সঙ্গে যে আমার পরিচয় ঘটবে সেই তো আমার লাভ। সহযাত্রীদের মধ্যে চার-পাঁচজন দাবা খেলা জানেন ব'লে ঘোষণা করেছিলেন। খবরটা তাঁদের কানে তক্ষুনি পৌঁছে দিলাম। আগামী কল্যের জন্যে শুধু যে আমাদের টেবিলটাই রিজার্ভ ক'রে রাখলাম তা নয়, আশপাশের আরও কয়েকটা টেবিলও আমাদের দখলে রইল। অন্যান্য যাত্রীরা পায়চারি করতে করতে আমাদের খেলা দেখায় যেন বিঘ্ন সৃষ্টি না করতে পারেন সেইজন্যে এমন ব্যবস্থাই করলুম আমি।

পরের দিন যথাসময়ে আমরা সদলবলে সেই ঘরে এসে উপস্থিত হলুম। ওস্তাদের ঠিক উল্টো দিকে মাঝখানের আসনটা নির্দিষ্ট করা হইল ম্যাকআইভারের জন্য। তিনি কড়া তামাকের সিগার টানতে লাগলেন ঘন ঘন এবং একটার পর একটা। বারবার অস্থিরভাবে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখছেন। বুঝলাম, অত্যধিক উত্তেজনার লক্ষণ এগুলো। জেণ্টোভিক এল দশ মিনিট দেরি ক'রে। এই ক'টা মিনিটের বিলম্ব যেন আমাদের পক্ষে

অসহ্য হ'য়ে উঠল। তার ফলে ওস্তাদের উপস্থিতির গুরুত্ব বেড়ে গেল আরও শতগুণ। এই ধরনের ঘটনা যে ঘটবে তার আভাস পেয়েছিলাম আমার সেই বন্ধুটির বর্ণনা থেকে।

অত্যন্ত শান্ত ও অবিচলিতভাবে জেণ্টোভিক এগিয়ে এল টেবিলের কাছে। কাউকে কোনো অভিবাদন জানাবার প্রয়োজন বোধ করল না সে। তার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হ'ল, সে যেন বলতে চায়, 'তোমরা তো নিশ্চয়ই জানো আমি কে। কিন্তু তোমাদের পরিচয় আমি জানতে চাই নে।' যাই হোক, খাঁটি পেশাদারের মতো সে খেলার শর্তগুলি নির্ধারিত ক'রে দিল। সে প্রস্তাব করল, আমরা সবাই সমবেতভাবে তার একার বিরুদ্ধে খেলব। একই সময়ে আলাদা আলাদা প্রত্যেকের সঙ্গে খেলা চলবে না। কারণ, জাহাজে এতগুলি দাবার ছক সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। প্রত্যেকটা চাল দেওয়ার পরেই টেবিল থেকে উঠে পড়বে সে। এবং ঘরের এক কোনায় গিয়ে অপেক্ষা করবে। সে কাছে থাকলে আমরা হয়তো ঘাবড়ে যেতে পারি। অতএব তার অনুপস্থিতির অবসরে আমরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে চাল দিতে পারব। আমাদের চাল দেওয়া হ'য়ে গেলে চামচে দিয়ে গেলাস বাজিয়ে আওয়াজ করতে হবে। কারণ, টেবিলের ওপর অন্য কোনো রকমের ঘণ্টা রাখার ব্যবস্থা ছিল না। জেণ্টোভিক প্রস্তাব করল, আমাদের সুবিধেমতো প্রত্যেকটা চালের জন্য দশ মিনিট ক'রে সময় নিতে পারি। ভীত ও সংকুচিত ছাত্রের মতো আমরা তার প্রত্যেকটি প্রস্তাবই বিনা প্রশ্নে স্বীকার ক'রে নিলুম। প্রথমেই কালো ঘুঁটি বেছে নিল জেণ্টোভিক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে প্রথম চালটা চালল। তারপর এক মুহূর্তও আর দেরি করল না। ঘরের এক কোনায় গিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় অলস ঔদাসীন্যে একটা সচিত্র সাময়িক পত্রিকার পাতা ওল্টাতে লাগল।

খেলার বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। যা হওয়া উচিত ছিল তাই হ'ল। মাত্র চব্বিশটি চালের মধ্যেই আমরা মাত হ'য়ে গেলাম। আমাদের পরাজয় সুসম্পূর্ণ হ'ল। একজন খ্যাতিসম্পন্ন আন্তর্জাতিক ওস্তাদের পক্ষে আমাদের মতো আধ ডজন অপটু খেলোয়াড়কে বাঁ হাত দিয়ে খেলে হারিয়ে দেওয়া খুব একটা বড় কথা নয়। আমরা বিরক্তি বোধ করলুম অন্য কারণে। তার ইচ্ছাকৃত উদ্ধত ব্যবহার দেখে আমরা প্রতি মুহূর্তে অনুভব করতে লাগলুম যে,

আমরা তার বাঁ হাতের সঙ্গেও খেলবার উপযুক্ত নই। চাল দেবার সময় প্রতিবারই এমন একটা ভঙ্গী করে যেন ছকের দিকে সে পুরোপুরি দৃষ্টি ফেলতে চায় না। যদি বা ফেলে তাও চকিতের জন্য। তারপর আমাদের পাশ দিয়ে এমন অলস-মন্থর পায়ে হেঁটে চ'লে যায় যেন আমাদেরও সে কতকগুলি প্রাণহীন কাঠের ঘুঁটির মতো মনে করে। পথের ঘেয়ো কুকুরের দিকে না চেয়েও মানুষ যেমন রুটির টুকরো ছুঁড়ে ফেলে দেয়, আমাদের প্রতি জেণ্টোভিকের আচরণও ঠিক সেই ধরনের অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ হ য়ে উঠল। আমার মতে, তার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র অনুভূতি থাকত তাহ'লে সে বন্ধু-ভাবাপন্ন হ'য়ে আমাদের ভুলচুকগুলি দেখিয়ে দিত এবং উৎসাহিত করত। এমন কি খেলা শেষ হওয়ার পরেও এই উপমানবিক স্বয়ংসক্রিয় দাবা-যন্ত্রটি আমাদের সঙ্গে একটি কথাও বলল না। শুধু 'কিস্তি মাত্' শব্দ দু'টি উচ্চারণ ক'রে আড়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল আর বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল আমরা দ্বিতীয় বাজি খেলতে চাই কিনা। আমি তার আগেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছি। দুঃসহ অপমান অসহায়ভাবে হজম করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ ছিল না। আমি ভেবেছিলুম, আমাদের খেলায় অর্থঘটিত অংশটা যখন শেষ হ'ল তখন পারস্পরিক পরিচয়ের পালাও শেষ হ'য়ে গেল। এমন সময় আমার পাশ থেকে ম্যাকআইভার কর্কশ সুরে ব'লে উঠলেন, "প্রতিশোধ।" রাগে আমার কণ্ঠরোধ হ'য়ে এল।

তাঁর প্রতিশোধের ঘোষণা শুনে চমকেও উঠলাম আমি। মনে হ'ল, ম্যাকআইভার এখন আর একজন বিনয়ী ভদ্রলোক নন, তিনি যেন একজন মুষ্টিযোদ্ধা—ঘুষি বাগিয়ে দাঁড়িয়েছেন আক্রমণের জন্য। জেণ্টোভিকের অপমানসূচক ব্যবহারের জন্য, না তাঁর বিকারগ্রস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মনে পরাজয়ের আঘাত লেগেছে ব'লে তিনি এমন চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন আমি তা বুঝতে পারলুম না। তবে এটা ঠিক যে, মুহূর্তের মধ্যে তাঁর চেহারা ও চরিত্রের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। রাগে সারা মুখ লাল হ'য়ে উঠল তার। অবরুদ্ধ ক্রোধের চাপে নাকের ছিদ্র দুটো বিস্ফারিত হ'ল। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলছেন তিনি। ঠেলে বেরিয়ে আসা মারমুখো চোয়াল আর দাঁত দিয়ে চেপে ধরা ঠোঁটের মাঝখানে ভাঁজ পড়েছে। চোখে তাঁর বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দেখেই বুঝতে পারলুম তিনি আর ক্রোধ সংবরণ করতে পারছেন না। পরাজিত

জুয়াড়ীর মতো ম্যাকআইভারও উত্তেজিত হ'য়ে উঠেছেন। বুঝলাম, মেজাজ তাঁর বিগড়ে গেছে। এখন তিনি যথাসর্বস্ব পণ ক'রেও জেণ্টোভিকের সঙ্গে বাজির পর বাজি শুধু খেলতেই থাকবেন যতক্ষণ না তিনি অন্তত একটিবার কিস্তি মাত করতে পারেন। জেণ্টোভিক যদি ম্যাকআইভারের দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান গ্রহণ করে তাহ'লে আমি জানি, বুয়েন আয়ার্স পৌঁছবার আগেই সে কয়েক সহস্র মুদ্রা পকেটস্থ ক'রে নেবে। ম্যাকআইভারের মধ্যে সোনার খনির সন্ধান পাবে জেণ্টোভিক।

অত্যন্ত ধীরস্থির এবং বিনীত ভাবে জেণ্টোভিক বলল, "বেশ, তাই হোক। আপনারা কিন্তু এবার কালো ঘুঁটি নেবেন।"

দ্বিতীয় বাজির খেলার ফলও প্রথম বাজির মতোই হ'ল। পার্থক্য যা ঘটল তা হচ্ছে এই যে, ইতিমধ্যে কৌতূহলী দর্শকের ভিড় বাড়ার দরুন দলটি আমাদের ভারি হয়ে উঠল। এবং খেলাটির মধ্যে খানিকটা প্রাণের সঞ্চারও হ'ল। ম্যাকআইভার ছকের দিকে এমনভাবে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন যেন, তাঁর ইচ্ছাশক্তির আকর্ষণে গোটা দলটাকে জয়ী ক'রে তুলতে চান। আমি বুঝতে পারছি, তিনি খুশি মনে সহস্র মুদ্রা খরচ করতেও রাজী যদি একবারটি তিনি শুধু প্রতিপক্ষের মুখের দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করতে পারেন, 'কিস্তি মাত।' অদ্ভুত মনে হ'তে পারে তবু এ কথা ঠিক যে, তাঁর এই আকস্মিক উত্তেজনা আমাদের অজ্ঞাতসারে সকলকেই যেন পেয়ে বসল। আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত হ'য়ে উঠলুম। প্রত্যেকটা চাল দিচ্ছি নিজেদের মধ্যে পরামর্শ এবং চুলচেরা বিচার ক'রে ক'রে। আগের বাজিতে ঠিক এমনটা হয়নি। জেণ্টোভিক-কে টেবিলে ডেকে আনবার সংকেত জানাবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বিচার-বিশ্লেষণ চলে পূর্ণোদ্যমে। আমরা সতেরো চালের মুখে এসে সবিস্ময়ে দেখতে পেলুম, এমন একটা অপ্রত্যাশিত রকমের সুবিধেজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, আর একটা ঘর পর্যন্ত বড়েটাকে ঠেলে দিতে পারলেই দ্বিতীয় মন্ত্রীটিকে আমরা দখলে আনতে পারি। এমন একটা সুবিধের জন্য আমরা যে খুব একটা স্বস্তি পাচ্ছি তা নয়। যে সুবিধেটা আমরা জেণ্টোভিকের কাছ থেকে আদায় ক'রে নিয়েছি ব'লে ভাবছি, তা হয়তো তার বঁড়শিতে গাঁথা টোপমাত্র—আমাদের মুখের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছে। এই সুবিধেজনক পরিস্থিতির কথাটা সে হয়তো অনেক

আগেই ভেবে রেখেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা সবাই মিলে ভেবে-চিন্তে এবং আলোচনা ক'রে কিছুতেই মেনে নিতে পারলুম না যে, চালটা তার সত্যি সত্যি বঁড়শির টোপ। আমাদের চাল দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় দশ মিনিট প্রায় শেষ হ'য়ে আসছিল। ঝুঁকি নেওয়ার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলাম আমরা। শেষ ঘরটিতে ঠেলে দেওয়ার উদ্দেশে বড়ের ওপর হাত রেখেছেন ম্যাকআইভার এমন সময় পেছন থেকে কে যেন তাঁর হাতটা চেপে ধ'রে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি চাপা কণ্ঠে ব'লে উঠল, "দোহাই আপনার, ও চালটা দেবেন না!"

একই সঙ্গে আমাদের মুখগুলো সব পেছন দিকে ঘুরে গেল। লোকটিকে মনে হ'ল চেনা-চেনা। বয়েস বোধহয় পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়। ডেকের ওপর পায়চারি করতে দেখেছি একে। তার বুদ্ধিদীপ্ত মুখটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তখুনি। সবচেয়ে অবাক হয়েছিলুম তার খড়িমাটির মতো সাদা মুখটির বিবর্ণতায়। এখন মনে হ'ল, আমরা যখন ঈষৎ পূর্বের সমস্যার মধ্যে মগ্ন হ'য়ে ছিলুম তখনই এই লোকটি আমাদের দলের সঙ্গে ভিড়ে পড়েছে। বোধহয় মিনিট চার-পাঁচের বেশি হবে না। আমরা সবাই তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলুম। এমন সময় সে দ্রুত কণ্ঠে পুনরায় ব'লে যেতে লাগল, "আপনারা বড়েটাকে ঠেলে দিয়ে যে চালটা দিতে যাচ্ছেন তার পরিণাম ভালো নয়। মন্ত্রী এগিয়ে এলেই উনি গজ দিয়ে আক্রমণ করবেন। আপনারা তখন ঘোড়া চেলে রুখতে চাইবেন অতি অবশ্যই। কিন্তু ইতিমধ্যে উনি তাঁর বড়ে চেলে ব'সে থাকবেন। ঘোড়া দিয়ে তখন আর আপনারা কোনো কিছুই রুখতে পারবেন না। মাত্র ন'-দশ চালের মধ্যেই আপনাদের খতম ক'রে দেবেন উনি। উনিশশো বাইশ সালে পিস্টানি ব'লে একটা জায়গায় আন্তর্জাতিক দাবা খেলার প্রতিযোগিতা হয়। তখন অ্যালেখিন এই নিয়মে খেলে বগুল্জেকে হারিয়ে দেন। প্রকৃতপক্ষে এই নতুন নিয়মটার স্রষ্টাকর্তা অ্যালেখিন নিজেই।"

বড়ে থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন ম্যাকআইভার। চাল দিলেন না। আমাদের মতো তিনিও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন হঠাৎ-আবির্ভূত ত্রাণকর্তাটির দিকে। আমরা ভাবলুম, যে লোকটি ন'-দশটা চাল বাকি থাকতেই অগ্রিম কিস্তি মাতের কথা ব'লে দিতে পারে সে নিশ্চয়ই সুদক্ষ একজন দাবা খেলোয়াড়। হয়তো আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিজয়ী

হওয়ার জন্যে সেও খেলতে চলেছে। অতএব আমাদের এই চরম সংকট-মুহূর্তে তার আকস্মিক আবির্ভাব এবং তার অযাচিত উপদেশ প্রত্যক্ষ একটা দৈব ঘটনা ব'লেই মনে হ'ল।

সর্বপ্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠলেন ম্যাকআইভার। তিনি নিচু স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "বলুন, আমরা এখন কি কবব ?"

অপরিচিত আগন্তুক বলল, "এখন এগিয়ে যাওয়ার দরকার নেই—এড়িয়ে যাওয়ার পন্থাই বরং ভালো। রাজাটিকে আগে বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। তাহ'লে প্রতিপক্ষ হয়তো আক্রমণেব ভিন্ন পথ ধরবে। তখন আপনারা তাকে নৌকো দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে পাবেন। আব দু' চালেব মধ্যে উনি শুধু বড়েটাই হারাবেন না, যেটুকু সুবিধা তিনি ক'রে নিয়েছিলেন তাও নষ্ট হবে। আপনারা যদি আত্মবক্ষাব পন্থাটা ঠিকমতো ধ'রে থাকতে পারেন, তাহ'লে হয়তো হার হবে না, খেলাটা সমান সমান হবে। এ বাজির পক্ষে তাই পরম লাভ।"

বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেলুম। যেন হাঁপিয়ে উঠলুম আমবা। আগন্তুক হিসেব করছিল খুব দ্রুত, কিন্তু তার নির্ভুলতাব কৃতিত্বও কম নয়। লোকটির কাণ্ড দেখে আমাদেব মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। মনে হচ্ছিল, মুদ্রিত পৃষ্ঠা থেকে যেন চালগুলো প'ড়ে যাচ্ছে সে! তাব হস্তক্ষেপের ফলে আমাদেব খেলার মোড় ফিরে গেল অপ্রত্যাশিতভাবে। এখন মনে হচ্ছে, বিশ্ব-বিজেতার সঙ্গে আমরা সোজাসুজি হেরে যাব না—খেলা শেষ হবে সমানে সমানে। আমরা একদিকে স'রে দাঁড়ালুম। ছকের ওপর দৃষ্টি রাখতে তার যেন কোনো রকম বাধার সৃষ্টি না হয়।

ম্যাকআইভার আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহ'লে সাতের ঘরেই রাজাকে সরিয়ে আনব কি ?"

"নিশ্চয়ই। আসল কথা হচ্ছে, আপাতত ডুব মারতে হবে।"

তার কথামতোই চাল দিল ম্যাকআইভার। তারপর গেলাস বাজিয়ে আওয়াজ করতেই জেণ্টোভিক তার অভ্যাসমতোই ধীরস্থির গতিতে এসে উপস্থিত হ'ল টেবিলের কাছে। ছকের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েই চাল দিল সে। আমাদের নতুন বন্ধুটি যেমন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন ঠিক সেই রকমই হ'ল। জেণ্টোভিক তার বড়েটিকে রাজার পেছন দিকে নিয়ে এসে

দাঁড় করাল। ইতিমধ্যে বন্ধুটি ফিসফিস স্বরে বলতে আরম্ভ করেছে, "নৌকোটাকে এবার চার নম্বর ঘরে নিয়ে চলুন। তাহ'লে নিজের বড়েকে সাবধান করবেন উনি। যদিও তাতে তাঁর রক্ষা পাওয়ার পথ নেই। যা হোক, ওর বড়ে নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। ঘোড়াটাকে পাঁচের ঘরে তুলে দিয়ে আক্রমণ করুন। এবার দু' পক্ষের মধ্যে সমতা রক্ষা হ'ল। এর পর থেকে আর আত্মরক্ষার পন্থা অবলম্বনের দরকার নেই, শুধু আক্রমণ চালিয়ে যাবেন।"

কি যে ব'লে যাচ্ছে লোকটি আমাদের মাথায় ঢুকছে না। মনে হ'ল, তার কথাগুলো চীনা ভাষার মতো দুর্বোধ্য। কিন্তু তবুও তার কথা শুনেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো ম্যাকআইভার চাল দিয়ে যেতে লাগলেন। আবারও আমরা গেলাসে আওয়াজ ক'রে জেণ্টোভিক-কে আসবার জন্য সংকেত জানালাম। এই প্রথম চট ক'রে সে চাল দেওয়ার জন্য হাত বাড়াল না। এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ছকের দিকে। অজ্ঞাতসারে তার চোখের ভুরু কুঁচকে এল। তারপর ভেবে-চিন্তে ঘুটি চালল সে। এবারেও ঐ অপরিচিত ভদ্রলোকটির ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হ'ল। এর পর এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘ'টে গেল! জেণ্টোভিক চ'লে যেতে যেতে মুহূর্তের জন্য সহসা দাঁড়িয়ে পড়ল। ওপর দিকে দৃষ্টি তুলে আমাদের সবাইকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। সে নিশ্চয়ই চেনবার চেষ্টা করছে আমাদের ঐ নবাগত বন্ধুটিকে, যার চালের ফলে তাকে আজ এমন অনভ্যস্ত বাধার সামনে এসে দাঁড়াতে হয়েছে।

এই মুহূর্ত থেকে আমাদের উত্তেজনার আর সীমা রইল না। এর আগে পর্যন্ত আমরা জেতবার আশা না ক'রেই খেলেছি। কিন্তু এখন? জেণ্টোভিকের হৃদয়হীন উপেক্ষার যোগ্য একটা উত্তর দিতে পারব ভেবে উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলুম। ভাবাবেগে দেহের কম্পন অনুভব করলুম আমরা। অনাবশ্যক সময় নষ্ট না ক'রে বন্ধু আমাদের পরের চালটাও দেখিয়ে দিলেন। জেণ্টোভিক-কে ডাকবার জন্য গেলাসে আওয়াজ করতে গিয়ে আঙুল আমার কেঁপে উঠল। জয়ের স্বাদ পাচ্ছি আমরা—এই তো প্রথম। গত দু দিন থেকে জেণ্টোভিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাল দিয়েছে। এখন সে দ্বিধা করতে লাগল। তারপর সহসা ব'সে পড়ল চেয়ারে! তার উন্নাসিক ভাবটা নষ্ট হ'ল ব'লে আমাদের মধ্যে আর স্তরের বৈষম্য রইল না। আমরা যে

তার সমকক্ষ খেলোয়াড় সেই কথাটা মেনে নিতে বাধ্য করলুম তাকে। খেলার কৃতিত্বে সমকক্ষ না হই, ব্যবহারে সে আমাদের ছোট করবে কেন? চেয়ারে ব'সে সে যেন ধ্যান করছে—গভীর চিন্তায় ডুবে গেল জেণ্টোভিক। তারপর বহুক্ষণ ধ'রে ছকের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রাখল। ঘন পল্লবের আড়ালে চোখের মণি দুটো কোথায় যে তলিয়ে গেল তা আর টের পাওয়ার উপায় রইল না। চিন্তার বোঝা এত ভারি হ'য়ে উঠল যে, তার মুখটা ক্রমশই বিস্ফারিত হ'তে দেখলুম আমরা। বোকা-হাবলার মতো হাঁ করা মুখ! খানিকক্ষণ চিন্তা করার পর চাল দিল জেণ্টোভিক। তারপর উঠে পড়ল সে। ঠিক সেই মুহূর্তে অর্ধ-স্বগত কণ্ঠে বন্ধু আমাদের ব'লে উঠল, "ব্যস, আক্রমণের গতি থামিয়ে দিয়েছি আমরা! চমৎকার চাল হয়েছে! কিছুতেই আর নতি স্বীকার করবেন না। দাবা বদল করতে এবার ওকে বাধ্য করুন—বদল করতেই হবে ওঁকে। এ ছাড়া উপায় নেই। বদলাবদলি হ'য়ে গেলে খেলাটা সমানে সমানে শেষ হবে। হবেই—ভগবানের সাধ্য নেই ওকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার।"

ম্যাকআইভার আর দ্বিধা করলেন না। তার কথামতোই চাল দিলেন তিনি। তারপর প্রকৃতপক্ষে খেলা চলল দু'জনের মধ্যেই—আমরা সবাই অনাবশ্যক বাহুল্যে পরিণত হ'য়ে গেলুম। এরা এমন সব অদ্ভুত ধরনের চাল দিতে লাগল যার তাৎপর্য আমাদের বোধগম্য হ'ল না। গোটা সাতেক চাল চালবার পর জেণ্টোভিক মুখ তুলল ওপর দিকে এবং ঘোষণা করল, "ড্র—কোনো পক্ষেরই হার-জিত নেই।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য সারা ঘরময় বিরাজ করতে লাগল নিবিড় নৈঃশব্দ্য। গোটা পরিবেশটার ওপর নেমে এল যেন সাড়াশব্দহীন অনড় নিস্তব্ধতা। তারপর অতি অকস্মাৎ পাশের কামরা থেকে ভেসে এল বেতার-গর্জন। সহসা বুঝি উন্মত্ত ঢেউ-এর সারি গর্জে এসে লুটিয়ে পড়ল আমাদের ঘরে! নিশ্বাস বন্ধ ক'রে ব'সে রইলুম আমরা। সমস্ত ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঘ'টে গেল যে, আমরা ভয়ই পেলুম। যা অসম্ভব, যা অবিশ্বাস্য তেমন সংঘটনের সম্মুখীন হওয়া ভয়ের ব্যাপারই বটে। তা নয় তো কি? একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি হঠাৎ এসে জেণ্টোভিকের মতো একজন দিগ্বিজয়ী খেলোয়াড়ের সঙ্গে টক্কর লড়বে এবং আমাদের প্রায়-হেরে-যাওয়া বাজিটার মোড় ঘুরিয়ে দেবে,

তেমন অসম্ভব কথা আমরা কল্পনাও করিনি। ম্যাকআইভার পেছন দিকে স'রে এসে গা এলিয়ে বসলেন। চাপা নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল আনন্দের ধ্বনি, 'আঃ—'। জেণ্টোভিকের দিকে আমি আর একবার ফিরে চাইলুম। আগেই আমি লক্ষ্য করেছিলুম, মুখের রং ওর বিবর্ণ হ'য়ে এসেছে। কিন্তু সে জানে কি ক'রে নিজেকে সুস্থির রাখতে হয়। ভেতরের দুর্বলতা প্রকাশ করার পাত্র সে নয়। সে যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়নি সেই ভাবটা বজায় রেখে ছকের ঘুঁটিগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে পরম ঔদাসীন্যের মতো জিজ্ঞাসা করল জেণ্টোভিক, "মশাইরা, তৃতীয় বাজি খেলবার ইচ্ছে আছে নাকি আপনাদের ?"

প্রশ্নটা যেন অত্যন্ত মামুলি ধরনের কাজের কথা। কিন্তু তার মধ্যেও বিশেষত্ব লক্ষ্য করলুম আমরা। ম্যাকআইভারকে উপেক্ষা করল সে। গভীর দৃষ্টি ফেলে চেয়ে রইল আমাদের নবাগত বন্ধুটির দিকে। ঘোড়া যেমন তার সওয়ারের বসবার ভঙ্গী থেকে বুঝে নেয় কোন্ মেজাজের মানুষ তিনি, জেণ্টোভিকও তেমনি বুঝে নিয়েছে আমাদের মধ্যে কে তার সত্যিকারের এবং একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। এর পর কি যে ঘটবে সেই কথা ভেবে আমরা সবাই আগ্রহআকুল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম জেণ্টোভিকের দিকে। যাই হোক, বন্ধুটি জবাব দেওয়ার আগেই ম্যাকআইভার উত্তেজিত স্বরে ব'লে উঠলেন, "নিশ্চয়ই, খেলা হবে।" বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তিনিই আবার বললেন, "এবার কিন্তু জেণ্টোভিকের সঙ্গে শুধু আপনিই খেলবেন।"

এর পর এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘ'টে গেল। এতক্ষণ পর্যন্ত বন্ধুটি আমাদের ছক-কাটা শূন্য ফলকটার দিকে তাকিয়ে ছিল। খেলবার আমন্ত্রণ শুনে এবং যখন বুঝতে পারল এতগুলি দৃষ্টির লক্ষ্যবস্তু সে নিজেই তখন তার ভয় এল মনে। ঘাবড়ে গিয়ে থেমে থেমে সে বলতে লাগল, 'এ কিছুতেই হ'তে পারে না। আমাকে বাদ দিতেই হবে। কবে বিশ বছর আগে—না, বিশ বছর কেন, পঁচিশ বছর হ'ল আমি আর দাবা খেলতে বসিনি। তা ছাড়া··· সত্যিই আমি এখন বুঝতে পারছি, অযাচিতভাবে আপনাদের খেলার মধ্যে এসে ঢুকে পড়া ঠিক হয়নি। আপনাদের অনুমতি না নিয়েই·· আমার এই অসংগত আচরণ মাপ করবেন মশাইরা। আপনাদের খেলায় আমি আর অংশ গ্রহণ করব না।"

বিস্ময় কাটিয়ে ওঠবার আগেই চেয়ে দেখি, লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছে।

বদমেজাজী ম্যাকআইভার গর্জন ক'রে উঠলেন, "না না—এ অসম্ভব—" টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে তিনিই আবার বলতে লাগলেন, "ভদ্রলোকটি যে পঁচিশ বছর দাবা খেলেননি সে কথা মেনে নিতে আমরা রাজী নই। আপনারা দেখলেন না, প্রতিটি চাল আর পাল্টা-চাল কত আগে থেকে তিনি হিসেব ক'রে ব'লে দিচ্ছিলেন? এমন একটা স্বচক্ষে দেখা প্রত্যক্ষ ব্যাপার আমরা বেমালুম অস্বীকার করতে পারি না। কি বলেন আপনারা? সত্যি কিনা বলুন?" শেষের প্রশ্নটা তিনি করলেন জেন্টোভিকের দিকে মুখ ঘুরিয়ে। ইচ্ছাকৃত নয়, অজ্ঞাতসারেই মুখটা ঘুরে গেল তার। স্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় রেখেই জেন্টোভিক বলল "এ সম্বন্ধে কোনো মতামত প্রকাশ করা আমার কাজ নয়। তবুও বলব, ভদ্রলোকটির খেলার মধ্যে কি যেন একটা অদ্ভুত ধরনের ব্যাপার আমি দেখতে পেয়েছি। সেইজন্যে ইচ্ছে ক'রেই তাঁকে আমি আরও এক বাজি খেলবার সুযোগ দিতে চেয়েছিলুম।" এই ব'লে জেন্টোভিক ধীরে ধীরে উঠে পড়ল এবং তার সেই পেশাদারী ভঙ্গীতে ঘোষণা ক'রে গেল, 'তিনি অথবা আপনারাও যদি আগামী কাল আবার খেলতে ইচ্ছা করেন তাহ'লে বেলা তিনটে থেকে আমায় আপনারা পেতে পারেন।"

আমরা আর হাসি চেপে রাখতে পারলুম না। সবাই আমরা জানি, জেন্টোভিক স্বইচ্ছায় এবং সহৃদয়তার বশবর্তী হ'য়ে তার ঐ অপরিচিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে খেলবার সুযোগ দেয়নি। সুতরাং উপরোক্ত মন্তব্যটা তার হতাশা গোপন করবার বালকোচিত কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। এর ফলে ওস্তাদের উদ্ধত দম্ভকে একেবারে গুঁড়ো ক'রে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার আগ্রহ আমাদের আরও বেশি প্রবল হ'য়ে উঠল। আমরা শান্তিপ্রিয় অলস প্রকৃতির যাত্রী। আমরাও সহসা যুদ্ধের জন্য যেন উন্মাদ হ'য়ে উঠলুম। জাহাজে ব'সে এই মাঝ-সমুদ্রে একবার যদি দিগ্বিজয়ী খেলোয়াড়ের গলা থেকে জয়মাল্য ছিনিয়ে নিতে পারি তাহ'লে সে সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে সারা পৃথিবীময়। এমন একটা সম্ভাব্য সংঘটনের কথা ভেবে আমরা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছি। তা ছাড়া ঠিক চরম সংকট-মুহূর্তে আমাদের ত্রাণকর্তা

ঘটনাস্থলে হাজির হওয়ার ফলে যে দুর্জ্ঞেয় এক রহস্যজাল রচিত হয়েছে তার আকর্ষণও বড় কম ছিল না। এক দিকে ঐ নবাগত ব্যক্তির বিনয়নম্র ব্যবহার, অন্য দিকে পেশাদারী খেলোয়াড়ের অনমনীয় আত্মম্ভরিতা—এই দুই পরস্পরবিরোধী চরিত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়লুম আমরা। প্রশ্ন জাগল মনে: অপরিচয়ের অবগুণ্ঠনে ঢাকা কে এই আগন্তুক? নিয়তি কি দাবা-জগতের অন্য একটি প্রতিভাকে আবিষ্কার করবার সুযোগ পেলেন? কিংবা এমন হওয়া কি অসম্ভব যে, এই ব্যক্তিটি সত্যিই একজন সুদক্ষ খেলোয়াড়, শুধু এক অজ্ঞাত কারণে আত্মপরিচয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করছেন? আমরা খুব আগ্রহের সঙ্গে সব রকমের সম্ভাব্য কারণগুলি ভেবে দেখতে লাগলাম। সবচেয়ে যা সম্ভাব্য ব'লে ভাবলুম আমরা তাও যেন শেষ পর্যন্ত আমাদের পুরোপুরি বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারল না। কারণ, ঈষৎ পূর্বের সর্বজনস্বীকৃত খেলার কৃতিত্বের সঙ্গে তার চরিত্রের সলজ্জ-সংকোচ ভাবের সামঞ্জস্য খুঁজে পেলুম না আমরা। কিন্তু একটা বিষয়ে আমরা একমত হলুম সবাই. আর একটা প্রতিযোগিতামূলক খেলার সুযোগ আমরা কিছুতেই নষ্ট করতে পারি না।

ঠিক করলুম আমরা যেমন ক'রে পারি ভগবান-প্রেরিত এই মানুষটিকে জেন্টোভিকের সঙ্গে আর এক বাজি খেলবার জন্য রাজী করাতেই হবে। খরচ যা লাগে সবই দেবেন ম্যাকআইভার। ইতিমধ্যে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে, লোকটি আমারই স্বদেশবাসী, অস্ট্রিয়ান। অতএব তাকে রাজী করাবার দায়িত্ব দেওয়া হ'ল আমার ওপর।

অনতিবিলম্বে আমি গিয়ে হাজির হলুম তার কাছে। দেখলুম, ডেক-চেয়ারে শুয়ে সে একখানা বই পড়ছে। এক মুহূর্তের মধ্যেই ভালো ক'রে দেখে নিলাম লোকটিকে। অতি সুন্দর তার মাথার গঠন। মাথাটি চেয়ারের গায়ে এমনভাবে হেলিয়ে দিয়েছে যে, দেখে মনে হ'ল লোকটি যেন একটু পরিশ্রান্ত। এবারও আমি দেখে আশ্চর্য হলুম যে, মুখে তার তারুণ্যসুলভ কমনীয়তা থাকা সত্ত্বেও রংটা একেবারে রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে। সামনের দিকের পাকা চুল আলোর স্পর্শে চিকচিক করছে। কেন জানি না, আমার ধারণা জন্মাল, লোকটি নিশ্চয়ই হঠাৎ বুড়িয়ে গেছে। সামনে গিয়ে উপস্থিত হ'তেই সৌজন্যসূচক ভঙ্গী ক'রে উঠে পড়ল সে। যে নামে সে তার নিজের পরিচয়

দিল সেই নামটা আমার কাছে অপরিজ্ঞাত নয়। পুরনো আমলের অষ্ট্রিয়ার এক অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের নামের সঙ্গে মিল রয়েছে দেখলুম। মনে পড়ল, ঐ নামেরই এক ব্যক্তি শুবার্টের পরম বন্ধু ছিলেন। তা ছাড়া ঐ পরিবারের একজন যে সম্রাটের নিজস্ব চিকিৎসক ছিলেন তাও আমি স্মরণ করতে পারলুম।

ডাক্তার বি ব'লেই একে আমরা ডাকতে লাগলুম। আমি যখন তাকে বললুম যে, জেণ্টোভিক-কে সমুচিত শিক্ষা দিতে হবে, তখন সে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেল! এই থেকে বুঝতে পারলুম, সে যে একজন বিশ্ববিখ্যাত খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে খেলে এসেছে তেমন ধারণাই তার ছিল না। যে কারণেই হোক এই খবরটা তার মনে ধরল খুব। সে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল, জেণ্টোভিক যে সত্যি সত্যি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দাবাড়ে সে সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতরূপে ওয়াকিবহাল কিনা। তার কথা শুনে মনে হ'ল কাজটা এবার আমার পক্ষে সহজ হ'য়ে গেল। লোকটি যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন মানুষ আমি তা আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। অতএব তার পরাজয় ঘটলে যে ম্যাকআইভারের আর্থিক ক্ষতি হবে তেমন কথাটা কিছুতেই আমি তাকে খুলে বলতে পারলাম না। না বলাটাই সুবিবেচনার কাজ ব'লে ভাবলুম আমি। বহুবিধ দ্বিধা-সংকোচের পর ডাক্তার বি শেষ পর্যন্ত খেলতে রাজী হ'য়ে গেল। কিন্তু শর্ত রইল যে, আমি যেন সবাইকে আগে থেকে সতর্ক ক'রে দিই, তারা যেন ডাক্তার বি-র দক্ষতার ওপর খুব বেশি আস্থা স্থাপন না করেন। "কারণ—" একটু ম্লান হাসি হেসে ডাক্তার বি বলতে লাগল, "নিয়মকানুন মেনে খেলবার যোগ্যতা আমার আছে কিনা সে সম্বন্ধে আমার নিজেরই কোনো পরিষ্কার ধারণা নেই। কলেজ-জীবনে সেই যে দাবা খেলেছি তারপর বিশ বছরের বেশিই হ'য়ে গেছে ওতে আর হাত দিইনি। বিশ্বাস করুন, অযথা বিনয় প্রকাশের জন্য এ কথা আমি বলছি না। কলেজ-জীবনেও খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিভার কিছু পরিচয় দিইনি আমি।"

এমন সহজ এবং সরলভাবে কথাগুলো ব'লে গেল লোকটি যে, আমি তা বিশ্বাস না ক'রে পারলুম না। তার সততার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা অসম্ভব হ'ল। তবুও তার অতি অদ্ভুত স্মরণশক্তির কথা ভেবে বিস্ময়ে অভিভূত

হ'য়ে পড়লুম। বিভিন্ন ওস্তাদ খেলোয়াড়দের খেলার নানাবিধ কৌশল এবং চালের খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্যগুলিও তার পরিষ্কার মনে রয়েছে! তাহ'লে সে নিশ্চয়ই দাবা খেলার তত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করেছে এবং চর্চাও করেছে। হয়তো এ কথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, শুধু চিন্তা-চর্চা নয়, দাবা-তত্ত্বে মগ্ন হ'য়ে ছিল সে। স্বপ্নাবিষ্টের মতো মৃদু মৃদু হাসতে লাগল ডাক্তার বি। তারপর বলল, "কি বললেন, মগ্ন হ'য়ে ছিলুম, না? ভগবান জানেন, সত্যিই আপাদমস্তক ডুবে ছিলুম ওতে! কিন্তু সে এক বিশেষ এবং বিচিত্র অবস্থার মধ্যে প'ড়ে গিয়ে ডুবে থাকতে বাধ্য হয়েছিলুম আমি। কাহিনীটা জটিল—হয়তো আমাদের এই বিশেষ ঘটনা দ্বারা সূচিত যুগারম্ভের সুন্দর ইতিহাসের একটা ছোট্ট অধ্যায় হিসেবে গণ্য হ'তে পারে তা। আপনি কি আধ ঘণ্টা ধৈর্য ধ'রে বসতে পারবেন? কাহিনীটা তাহ'লে—"

তার পাশের চেয়ারটার দিকে ইশারা ক'রে ডাক্তার বি আমায় বসতে বলল। সানন্দে তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলুম আমি। আমাদের ধারে-কাছে আর কেউ ছিল না। পড়বার চশমাটা চোখ থেকে খুলে ফেলল ডাক্তার বি। তারপর গল্প বলতে আরম্ভ করল সে

"আপনি আমাদের ভিয়েনার লোক। আমাদের পরিবারের নামটা যে আজও আপনি মনে রেখেছেন সেইজন্য অনুগৃহীত বোধ করছি। যাই হোক, আপনি নিশ্চয়ই জানতেন না যে, ভিয়েনায় মামলা-মকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের একটা অফিস ছিল। আমি আর বাবা দু'জনে মিলে সেই অফিসটা চালাতুম। পরে অবিশ্যি আমি একাই ছিলুম তার মালিক। কারণ, মামলা-মকদ্দমার কাজ বিশেষ কিছু ছিলও না আমাদের হাতে। দৈনিক কাগজে সেইজন্য তার বিবরণও প্রকাশিত হ'ত না। আমরা ইচ্ছে ক'রেই নতুন মক্কেলের কাজ নিতুম না। সত্যি কথা বলতে কি, আইন ব্যবসা না ক'রে আমরা মক্কেলদের সলা-পরামর্শ দেওয়ার কাজই করতুম। বড় বড় গির্জাগুলোর ধন-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করাই ছিল আমাদের প্রধান কাজ। ধর্মযাজকমণ্ডলীর সঙ্গে বাবার যোগাযোগ ছিল খুব নিবিড়। যাজক সংঘের পক্ষ থেকে তিনিই ছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি। তা ছাড়া, অস্ট্রিয়ার রাজ-পরিবারের কেউ কেউ আমাদের কাছে টাকাপয়সা রাখতেন। তাঁদের বহুবিধ লগ্নির তত্ত্বাবধানও করতুম আমরা।

দেখুন, একটা কথা এই সম্পর্কে উল্লেখ করা আবশ্যক। আপনি হয়তো ভাবছেন সম্রাট কিংবা তাঁর পরিবারের টাকাপয়সা সম্বন্ধে আমার আলোচনা করা উচিত নয়। কিন্তু এখন তো রাজতন্ত্র লোপ পেয়েছে—অতএব, এই যুগে তাঁদের সম্পর্কে কোনো কথাই গোপন রাখতে আমি আর বাধ্য নই। গির্জা এবং রাজবংশের সঙ্গে যোগাযোগ আমাদের দুই পুরুষের। আমার এক কাকা ছিলেন সম্রাটের পারিবারিক চিকিৎসক। অন্য এক কাকা ছিলেন সিটেন্স্টেটেন নামে একটা জায়গার মঠাধ্যক্ষ। আমাদের কাজ ছিল এইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং পুরুষানুক্রমে যে আস্থা আমরা উত্তরাধিকার-সূত্রে সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছি তাকে নিভৃতে ও নিঃশব্দে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল আমাদের দায় ও দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালন করবার জন্য দরকার হ'ত দুটি মাত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, কঠোর বিচক্ষণতা আর পরিপূর্ণ নির্ভরযোগ্যতা। আমার স্বর্গীয় পিতার চরিত্রে এই দুটি গুণেরই সমাবেশ ঘটেছিল পূর্ণমাত্রায়। মুদ্রাস্ফীতির সময় এবং নিদারুণ অর্থনৈতিক সংকট যখন উপস্থিত হয় বাবা তখন তাঁর মক্কেলদের লগ্নিগুলিকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন—ছেঁড়া কাগজের মতো সেগুলো একেবারে মূল্যহীন হ'য়ে পড়েনি। এটা তাঁর দূরদর্শিতারই প্রমাণ। তারপর হিটলার জার্মেনির কর্ণধার হ'য়ে বসলেন। মহা দুর্দিন উপস্থিত হ'ল। চার্চ এবং ধর্মযাজকদের মঠের ধনদৌলত এবং বিষয়সম্পত্তি সব জবরদখল করতে লাগলেন তিনি। সেই সময় কিছু কিছু অস্থাবর সম্পত্তি দেশের বাইরে সরিয়ে দেওয়ার দরকার হ'য়ে পড়ে। সর্বস্ব বাজেয়াপ্ত হওয়ার ভয় ছিল ব'লেই সতর্ক হ'তে হয়েছিল। এইসব আদান-প্রদানের কাজ আমাদের হাত দিয়েই সম্পাদিত হয়। তা ছাড়া রাজ-পরিবার এবং পোপের দফতরের মধ্যে গোপনে আরও কিছু কিছু আদান-প্রদানের কাজ চলে। এইসব গোপন কারবারের কথা আমরা যত দূর জানতাম, জনসাধারণ তার বিন্দুবিসর্গও জানত না। আমাদের অফিসের দরজায় একটা সাইনবোর্ড পর্যন্ত ছিল না। রাজ-পরিবারের ধারে-কাছে যেন না যেতে হয় তার জন্য আমরা সতর্ক ছিলুম খুব। আমাদের অফিসটা যাতে কারো দৃষ্টিগোচর না হয় তার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল আমাদের। সরকারী তদন্তের হাত এড়াবার এটাই ছিল উৎকৃষ্ট পন্থা। গত কয়েক বছর ধ'রে আমাদের এই পাঁচতলার অনাড়ম্বর অফিস ঘরটির মধ্য দিয়ে রাজ-পরিবারের পত্রবাহকরা যে গোপনে

জরুরী চিঠিপত্র নেওয়া-দেওয়া করেছে সেই সম্পর্কে অষ্ট্রিয়ার কোনো সরকারী কর্মচারীর মনে মুহূর্তের জন্যেও সন্দেহের উদ্রেক হয়নি।

"হিটলারের দলটি তখনো রাষ্ট্র পরিচালনার কর্তৃত্ব পায়নি। পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য সেনাবাহিনীও তৈরি করতে পারেনি। কিন্তু তার বহু আগে থেকেই আশপাশের দেশগুলিতে এরা এক সাংঘাতিক রকমের দল গ'ড়ে তোলে। সেনাবাহিনীর চেয়ে সেটা কম বিপজ্জনক ছিল না। যারা বিত্তহীন, উপেক্ষিত এবং সামাজিক অবিচার দ্বারা উৎপীড়িত তারাই ছিল এই দলগুলির প্রধান প্রধান ব্যক্তি। দেশের সর্বত্রই এদের গুপ্তচররা ঘোরাফেরা করত। প্রতিটি অফিসে এবং ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে এক-একটা ক'রে এদের 'সেল' গ'ড়ে ওঠে। লুকিয়ে আড়ি পেতে অপরের কথাবার্তা শোনবার ব্যবস্থাও ছিল এদের। এমন কি ডলফাস এবং শুসনিগের গুপ্ত কামরায় পর্যন্ত এদের গোয়েন্দারা ব'সে থাকত তাঁদের আলাপ-আলোচনা শোনবার জন্য। দুঃখের বিষয় আমাদের মতো ছোট্ট একটা অফিসেও তারা একজন গুপ্তচর রেখেছিল। এই ব্যাপারটা টের পেলুম অত্যন্ত দেরীতে—তখন আর সাবধান হওয়ার সময় ছিল না। ক্ষতি যা হওয়ার হ'য়ে গিয়েছে। একজন ধর্মযাজকের সুপারিশ অনুসারে আমিই তাকে কেরানীর কাজে নিয়োগ করেছিলুম। কাজকর্ম জানতও না তেমন, তার ওপরে দুঃস্থ ছিল খুব। তাকে বাহাল করবার একটা উদ্দেশ্যও ছিল। বাইরের লোককে আমরা দেখাতে চেয়েছিলুম যে, এখানে সত্যি সত্যি কাজ-কারবার হয়। তাকে দিয়ে আমরা কখনো দরকারী কাজ করাইনি। চিঠিপত্রও খুলতে দিতুম না। আজেবাজে কাজের ছুতোয় এখানে-ওখানে পাঠিয়ে দিতুম। টেলিফোন ধরত—অদরকারী কাগজপত্র ফাইলে সাজিয়ে রাখত সে। জরুরী চিঠিপত্র আমি নিজেই টাইপ করতুম—নকল রাখতুম না। সমস্ত দলিলপত্র বাড়ি নিয়ে রাখতুম আমি। কারো সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের দরকার হ'লে হয় তাকে গির্জায় নিয়ে যেতুম, নয়তো ডেকে আনতুম আমার কাকার ডাক্তারখানায় তার রোগী দেখবার কামরায়। এইসব সতর্কতা আমাকে অবলম্বন করতে হয়েছিল শুধু তাদের লুকিয়ে শোনবার এবং দেখবার পথটি বন্ধ করবার জন্য। এমন একটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটেছিল যার ফলে ঐ অকেজো লোকটা বুঝতে পারল যে, তাকে আমি আর বিশ্বাস করছি না। এবং তার ধারণা

জন্মাল, তার অজ্ঞাতসারে অনেক রকমের কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা সব ঘ'টে যাচ্ছে। 'হিজ ম্যাজেস্টি' শব্দটা ব্যবহার না ক'রে আমরা তাঁর ছদ্মনাম হিসেবে 'ব্যাবন ফার্ন' কথাটা ব্যবহার করতুম। হয়তো আমার অনুপস্থিতিতে কোনো একজন গুপ্ত পত্রবাহক অসতর্কভাবে তার সামনে সাংকেতিক শব্দ ব্যবহার না ক'রে 'হিজ ম্যাজেস্টি' কথাটাই উচ্চারণ ক'রে থাকবে। কিংবা লোকটা হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে কয়েকটা চিঠি খুলে ফেলে প'ড়ে দেখেছে। কারণ যাই হোক না কেন, তাকে সন্দেহ করবার আগেই সে নিশ্চয়ই বার্লিন কিংবা মিউনিক থেকে নির্দেশ পেয়েছিল আমাদের ওপর নজর রাখবার। বহু দেরিতে, আমার বন্দীজীবন শুরু হওয়ারও অনেক পরে সহসা আমার মনে পড়েছিল তার শেষ কয় মাসের কর্মতৎপরতার কথা। গায়ে প'ড়ে লোকটা প্রায় প্রত্যেক দিনই নিজে গিয়ে চিঠিপত্র ডাকে দিতে চাইত। অথচ প্রথম দিকে তার কর্মবিমুখতার সীমা ছিল না। আমার এই অবিবেচনার অপরাধ থেকে নিজেকে আমি কখনো ক্ষমা করতে পারিনি। কিন্তু পৃথিবীর সেরা সেরা কূটনীতিবিদ আর রণবিশারদরা কি হিটলারের চতুরতার কাছে হার মানেননি? ওদের গোয়েন্দারা যে কত সুন্দরভাবে দীর্ঘদিন থেকে আমার ওপর নজর রেখেছিল তার প্রমাণ পেলুম যেদিন, অর্থাৎ শুস্‌নিগ যেদিন পদত্যাগ করলেন সেইদিন সন্ধেবেলায় যখন ওরা আমায় গ্রেপ্তার করল। তার ঠিক পরের দিনই হিটলার ভিয়েনায় প্রবেশ করলেন। সৌভাগ্যবশত দরকারী দলিলপত্র সব পুড়িয়ে ফেলবার সময় পেয়েছিলুম আমি। যেইমাত্র রেডিয়োতে শুস্‌নিগের পদত্যাগের খবর আর তাঁর বিদায়-ভাষণ শুনতে পেলুম তখনই আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দেরি করিনি। এ ছাড়া অন্যান্য মূল্যবান কাগজপত্রও আমার কাছে ছিল। গির্জা কর্তৃপক্ষের এবং দু'জন আর্কডিউকের বৈদেশিক ব্যবসায়াদিতে লগ্নিকৃত টাকাকড়ির রসিদও ছিল আমার কাছে। সেগুলো আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম ধোপাবাড়ির কাপড়ের একটা ঝুড়ির মধ্যে। আমার একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য সেগুলো সব আমার কাকার কাছে পৌঁছে দেয়। এসব ঘটনা ঘটে ঠিক শেষ মুহূর্তে, হিটলারের পুলিশ যখন আমার দরজায় এসে করাঘাত করছে।"

এই পর্যন্ত ব'লে ডাক্তার বি অনেকক্ষণ ধ'রে চুপ ক'রে রইল। একটা সিগার ধরাতে সময় নিচ্ছিল সে। দেশলাই-এর আলোতে লক্ষ্য করলাম,

তার মুখের ডান দিকটা কেমন যেন একটু কুঁচকে উঠল। এটা তার স্নায়বিক উত্তেজনার ফল। আগেও আমি লক্ষ্য করেছি, কয়েক মিনিট পর পর ডান দিকটা তার অমনিভাবে কুঁচকে কুঁচকে উঠছে। সেটা একটা মুহূর্তের স্পন্দন, হয়তো বা নিশ্বাসের চেয়েও লঘু, তবুও তার ফলে ডাক্তার বি-র মুখে স্পষ্টতই একটা অস্থিরতার ভাব ফুটে উঠতে আমি দেখেছি।

ডাক্তার বি আবার বলতে আরম্ভ করল, "পুরনো অস্ট্রিয়ার প্রতি যাঁরা আস্থাবান ছিলেন তাঁরা সবাই গিয়ে আশ্রয় পেয়েছিলেন হিটলারের বন্দী-শিবিরে। আপনি হয়তো ভাবছেন এবার আমি আপনাকে সেই বন্দীশিবিরের কাহিনী শোনাব—সেখানে গিয়ে আমি যে তাদের বর্বরোচিত লাঞ্ছনার দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছি সেসব কাহিনীও শুনবেন ব'লে আশা করছেন আপনি। কিন্তু আমার বরাতে সেসব কিছুই ঘটেনি। আমি ছিলুম এক ভিন্ন শ্রেণীর কয়েদী। যাঁরা এদের বহুদিনকার সঞ্চিত আক্রোশের ফলে সবচেয়ে বেশি দৈহিক এবং আত্মিক নির্যাতন সহ্য করেছেন আমি সেইসব হতভাগ্যদের দলভুক্ত ছিলুম না। অল্প কয়েকজন বিশেষ ধরনের বন্দীর মধ্যে আমিও ছিলুম একজন। এরা ভেবেছিল, চাপ দিয়ে আমাদের কাছ থেকে হয় টাকা আদায় করবে, নয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর বার ক'রে নেবে। গেস্টাপো গুপ্ত-পুলিশের কাছে অবিশ্যি আমার মতো একজন অখ্যাত অজ্ঞাত লোকের আপাতদৃষ্টিতে কোনো মূল্যই ছিল না। আমরা যদিও নিজেদের সাক্ষীগোপালের মতো দাঁড় করিয়ে রেখেছিলুম তবু ওরা অনুমান করতে পেরেছিল যে, আমরাই হচ্ছি তাদের প্রধান প্রতিপক্ষের সত্যিকারের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি এবং কার্যনির্বাহক। চার্চের তরফ থেকে রাজ-পরিবারের জন্য যারা নিঃস্বার্থ-ভাবে এযাবৎকাল আত্মনিয়োগ ক'রে এসেছেন তাঁদের নামধাম উল্লেখ ক'রে আমি সাক্ষ্য-প্রমাণ দেব তেমন আশাই করেছিল পুলিশরা। তাহ'লে আইন-ভঙ্গের অপরাধে চার্চকে অতি সহজেই অভিযুক্ত করতে পারত ওরা। যথার্থ কারণেই পুলিশরা সন্দেহ করেছিল যে, আমাদের হাতে তখন পর্যন্তও বেশ কিছু টাকা লুকনো রয়েছে। চেষ্টা করলে হয়তো ওদের লুণ্ঠন-লালসা চরিতার্থ হবে। অতএব প্রথম দিনেই আমার ওপর চোখ পড়েছিল ওদের। ভেবেছিল, নির্ভরযোগ্য পুলিশী প্রথায় আমার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সংবাদ সব আদায় ক'রে নেবে। সেই কারণেই আমার মতো লোকদের ওরা বন্দীশিবিরে

পাঠায়নি—টাকা এবং প্রত্যাশিত সংবাদ সংগ্রহের লোভে আমাদের জন্ত বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল তারা। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমাদের চ্যান্সেলার ও কোটিপতি রথস্‌চাইল্ডের পরিবারবর্গকে বন্দীশিবিরে আবদ্ধ ক'রে রাখেনি ওরা। কোটি কোটি টাকা পাবার আশা করেছিল ব'লেই সেই সুবিখ্যাত মেট্রোপোল হোটেলে আলাদা আলাদা কামরায় থাকতে দিয়েছিল তাঁদের। গেস্টাপো গুপ্ত পুলিশের প্রধান কর্মকেন্দ্রও ছিল ঐ হোটেলে। আমার মতো একজন নগণ্য ব্যক্তিও আলাদা থাকবার সম্মান লাভে বঞ্চিত হ'ল না।

"হোটেলে নিজের জন্য একটা পৃথক ঘর পেলুম—কথাটা ভারি সুন্দর শোনাচ্ছে, না? আমাদের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ওরা হিমশীতল ব্যারাকের মধ্যে গাদাগাদি ক'রে ঢুকিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তা না ক'রে আমাদের থাকতে দিল হোটেলের পৃথক পৃথক ঘরে। তাও ঠাণ্ডা ঘর নয়, চুল্লির আগুনে প্রতিটি ঘর গরম ক'রে রাখা। বিশ্বাস করুন, এই ব্যবস্থার মধ্যে সহৃদয়তার চেয়ে ওদের শঠতার নির্মমতাই ছিল বেশি। প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ আদায় করবার জন্ত দৈহিক নির্যাতন কিংবা মারধোর করার চেয়ে একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় আটকে রাখার কৌশলটাই ছিল অধিকতর চাতুর্যপূর্ণ। আমাদের গায়ে উৎপীড়নের স্পর্শ পর্যন্ত লাগল না। আমাদের শুধু আবদ্ধ ক'রে রাখল এক মহাশূন্যতার মধ্যে। এরা ভালো ক'রেই জানত যে, নিঃসঙ্গতার উৎপীড়ন-কৌশলই মানব-মনকে বিকৃত করবার পক্ষে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। বিশ্ব-সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আমরা পৃথক পৃথক ঘরে বাস করতে লাগলুম—প্রতিটি ঘর শূন্যতার যেন এক একটি পীঠস্থান। ওরা ভেবে রেখেছিল, বন্দী-শিবিরের দৈহিক অত্যাচার হয়তো আমরা সহ্য করতে পারব, কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা আমরা বইতে পারব না—গোপন তথ্য ফাঁস ক'রে দিতে বাধ্য হব আমরা।

"প্রথম দৃষ্টিতে হোটেল-কামরাটা আমার বিরক্তি উদ্রেক করেনি। ঘরে যে শুধু একটা দরজা ছিল তা নয়। দরজাটা অবিশ্যি দিনরাত বন্ধ করা থাকত। আমাকে ওরা একটা টেবিল, চেয়ার, বিছানা ও হাতমুখ ধোওয়ার জন্ত একটা জলের গামলাও দিয়েছিল। তা ছাড়া ঘরটাতে একটা জানলা ছিল। খোলা নয়, লোহার শিক দিয়ে আটকানো। ইচ্ছে ক'রেই টেবিলে

কোনো জিনিস রাখেনি। বই, কাগজ, সংবাদপত্র কিংবা একটা পেন্সিলও না। শূন্যতার প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা কক্ষে আমার দেহমন আবদ্ধ হ'য়ে রইল। আমার নিজের কাছে যেসব জিনিস ছিল তাও তারা নিয়ে নিল। সময়ের যেন কোনো হিসেব না রাখতে পারি সেইজন্য ঘড়িটা নিল সবচেয়ে আগে। পেন্সিলটা নিয়েছে, উপস্থিতমতো দু'একটা কথা টুকে রাখবার দরকার হ'লে পারব না। পেন্সিল-কাটা ছুরিটাই বা রাখবে কেন, রগ কেটে যদি আত্মহত্যা করি? এমন কি ধূমপানের সুবিধাটুকু থেকেও বঞ্চিত হলুম আমি। মানুষের মুখ দেখতে পাইনি। তাদের কণ্ঠস্বরও আমার কানে এসে পৌছত না। শুধুমাত্র কারাকক্ষের প্রহরীটিকে দেখতে পেতুম আমি। কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলত না সে। চোখ, কান এবং অনুভূতিকে বাঁচিয়ে রাখবার সহজ উপায়টুকুও কেড়ে নিল ওরা। টেবিল, চেয়ার এবং বিছানার মতো কয়েকটি নিষ্প্রাণ জিনিসের মধ্যে আমার একাকিত্ব দুঃসহ হ'য়ে উঠল। আমার নিজেরই দেহটা যেন হ'য়ে পড়ল সঙ্গলাভের একমাত্র সজীব অস্তিত্ব। এ যেন নৈঃশব্দ্যের মসীকৃষ্ণ মহাসমুদ্রের অতল গর্ভে ডুবুরীর মতো ডুবে থাকা—সে বুঝতে পারছে, কোমরে বাঁধা দড়িটা ছিঁড়ে গিয়েছে। শব্দহীন সমুদ্রগহ্বর থেকে তাকে আর কেউ টেনে তুলতে পারবে না। আবদ্ধ হোটেল-কামরায় দেখবার, শোনবার কিংবা করবার মতো কোনো কিছুই ছিল না আমার। আমাকে কেন্দ্র ক'রে সৃষ্টি হ'ল এক শূন্যতার জগৎ। আমার চতুর্দিক জুড়ে ব'য়ে চলেছে শূন্যগর্ভ সময়ের স্রোত। স্থানকালের বিভেদ পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেল। হোটেল-কক্ষের স্বল্প পরিসরের মধ্যে দিনরাত শুধু ইতস্তত হেঁটেই চলেছি—একবার এদিকে, একবার ওদিকে। সঙ্গে সঙ্গে আমার চিন্তা-রাজ্যটিও সংকুচিত হ'য়ে এল। চিন্তার প্রকৃতি যতই অকিঞ্চিৎকর হোক না কেন, তারও একটা সমুপযুক্ত প্রসারযোগ্য আশ্রয় চাই। নইলে সে একই জায়গায় নিজেরই চতুর্দিকে ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে—শূন্যতার সমাধিতলে যেন ম'রে যেতে চায়। কি ভয়ানক নির্জনতা! সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কিছু একটা ঘটবে ব'লে প্রতীক্ষা ক'রে থাকা—অথচ কোনো কিছুই ঘটে না। প্রতিদিনই সেই একই রকমের প্রতীক্ষা, একই প্রত্যাশা—ভাবতে ভাবতে কপালের রগ ছিঁড়ে পড়তে চায়, তবুও নতুন কিছু ঘটে না, একঘেয়েমির সুরে যতির কোনো অবকাশ নেই।

একাকিত্বের বাঁধন মুহূর্তের জন্য শিথিল হয় না—মানুষের নিঃসঙ্গতা চরমে ওঠে।

"এই অবস্থায় আমার পনরোটা দিন কেটে গেল। স্থানকালের অতীত অন্য একটা জগতে যেন বাস ক'রে এলুম আমি। হঠাৎ যদি যুদ্ধ শুরু হ'য়ে যেত আমি তার খবরই পেতুম না। কারণ, আমার জগৎটা তো শুধু টেবিল, চেয়ার, বিছানা আর দেয়াল দিয়ে তৈরি। অর্ধবৃত্তাকার দ্বিপুটক প্রাণির খোলার আকারে কাটা প্রত্যেকটা জিনিসই যেন আমার মগজের মধ্যে খোদাই করা ছিল। যখনই এবং যেদিকেই চোখ ফেরাই না কেন উপরোক্ত জিনিস কয়টি ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাই না। তারপর শেষ পর্যন্ত আমার শুনানির দিন এসে উপস্থিত হ'ল। কর্তৃপক্ষের সামনে হাজির হওয়ার আদেশ পেলুম আমি। প্রথমে তো বুঝতেই পারিনি সময়টা দিন, না রাত্রি। দু'দিকে আবদ্ধ একাধিক সরু পথ দিয়ে আমায় ওরা নিয়ে যেতে লাগল। কোন্‌দিকে যে নিয়ে চলেছে তাও আমি ঠিক করতে পারিনি। তারপর কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে হ'ল। কোথায় দাঁড়িয়ে যে অপেক্ষা করলুম তার সঠিক অবস্থানটাও ঠাহর করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ল না। শেষ পর্যন্ত একটা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লুম আমি। উল্টো দিকে ব'সে ছিল কয়েকজন সরকারী পোশাক পরা পুলিশ কর্মচারী। টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত কাগজের গাদা প'ড়ে রয়েছে। কাগজগুলো যে প্রয়োজনীয় তথ্য সম্পর্কিত তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিল না। তারপর আমায় ওরা জেরা করতে লাগল, প্রশ্নের পর প্রশ্ন—কোনোটা সত্যি, কোনোটা মিথ্যে। মাঝে মাঝে দু'একটা সরল প্রশ্নের পর এমন প্রশ্নও করতে লাগল যার মূলগত অর্থ অত্যন্ত জটিল এবং শঠতাপূর্ণ। এও আবার লক্ষ্য করলুম, ওদের প্রশ্নের মধ্যে কতকগুলি আসল, আর কতকগুলি নকল। আমি যখন প্রশ্নোত্তর করছিলুম, তখন দেখলুম খেলাচ্ছলে কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া করছে ওরা, আবার আমার বক্তব্য সব লিখেও নিচ্ছে। ঐ অদ্ভুত ও অসৎবুদ্ধিসম্পন্ন পুলিশ কর্মচারীরা সত্যি সত্যি কি যে লিখল তাও আমি জানতে পারলুম না। কিন্তু ঐসব জেরার দিনগুলিতে সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার ঘটত, যখন আমি অনুমান করতে পারতুম না যে, আমাদের অফিসের আসল কাজ সম্পর্কে

গেস্টাপো গুপ্ত পুলিশরা সত্যি সত্যি কতটুকু খবর রাখে। এবং আমার কাছ থেকে যে ঠিক কি ধরনের খবর বার করতে চায় ওরা সেই সম্বন্ধেও আমি আন্দাজ করতে পারতুম না। আপনাকে তো আগেই বলেছি, গ্রেপ্তার হওয়ার আগের মুহূর্তে দরকারী দলিলপত্র সব আমার এক বিশ্বস্ত ভৃত্যের মারফৎ কাকার কাছে পাঠিযে দিয়েছিলুম। তিনি কি সেইসব কাগজপত্রগুলো পেযেছেন? নাকি পাননি? অফিসের কেরানীটি কি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল? কোন্ কোন্ চিঠি মাঝপথে ওরা ধ'রে ফেলেছে? কিংবা এমন হওয়া কি অসম্ভব, যেসব গির্জা সংঘের সঙ্গে আমাদের আদান-প্রদান ছিল তাদেরই কোনো জোবড়া-জাবড়া পুরোহিতের কাছ থেকে এরই মধ্যে প্রয়োজনীয় খবর দু'একটা এরা বার ক'রে নিয়েছে? এই ধরনের নানারকমের কথা আমার মনের মধ্যে উঁকি দিতে লাগল।

"বিশ্বাস করুন, জেরার দিনগুলিতে ওরা যেন শত শত প্রশ্নের বাণ ছুঁড়তে লাগল আমাকে লক্ষ্য ক'রে। অমুক গির্জা সংঘের হ'য়ে কত টাকা লগ্নি করেছি আমরা? কোন্ কোন্ ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমাদের চিঠিপত্র লেখালেখি হ'ত? আমি কি অমুক মানুষকে চিনি? সুইটজারল্যাণ্ডের কোনো ব্যাঙ্কের সঙ্গে কি আমার যোগাযোগ ছিল? ওরা যে কতটা কি জানতে পেরেছে তার হদিস পাইনি ব'লে প্রত্যেকবারই জবাব দিতে হ'ত অত্যন্ত সতর্কভাবে। ভেতরে ভেতরে ভয়ে অস্থির হ'য়ে উঠতুম আমি। জবাবের মধ্যে হয়তো এমন কথা কিছু থাকতে পারত যা ওরা আগে কখনো টের পায়নি। তার ফলে হয়তো অন্য কোনো ব্যক্তি ওদের হাতে ধরা পড়তে পারে। আবার সবই যদি অস্বীকার করি তাহ'লে নিজের ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশি।

"এই পরীক্ষাই আমার সবচেয়ে শোচনীয় দুর্ভাগ্য নয়। সবচেয়ে মারাত্মক মনে হ'ত যখন আমি প্রশ্নোত্তর ক'রে ফিরে আসতুম শূন্যতার পক্ষপুটে ঘেরা নিজের সেই কামরাটিতে—সেই টেবিল, চেয়ার, বিছানা আর চার দেয়ালের কাছে। ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাৎ-সংঘটনগুলো নিজের মনে নতুন ক'রে উল্টেপাল্টে দেখতুম। পুনরায় ভেবে দেখবার চেষ্টা করতুম, ওদের প্রশ্নের উত্তরে আমি যা বলেছি তা না ব'লে অন্য কিছু বলা উচিত ছিল কিনা। এবং আমার অসতর্ক জবাবের ফলে ওদের মনে যদি সন্দেহের উদ্রেক হয়ে থাকে তাহ'লে পরের দিন কিভাবে জবাব দিলে সেই সন্দেহ দূর করতে পারি

তেমন কথাও ব'সে ব'সে ভাবতুম আমি। যে প্রামাণিক বিবৃতি আমি ওদের কাছে পেশ ক'রে এলুম, তার প্রতিটি কথা নিজের মনে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা বার বার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ওজন ক'রে দেখতুম। পুলিশ কর্মচারীদের প্রশ্নগুলি একটা একটা ক'রে পুনরায় বিবৃত করতুম এবং তার জবাবগুলোও একটা একটা ক'রে সাজিয়ে রাখতুম মনে। বিবৃতির মধ্য থেকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতুম কোন্ কোন্ জবাবগুলো ওরা ওদের কাগজপত্রে লিখে রাখল। আমি অবিশ্যি জানতুম, ঐসব কথা থেকে ওরা বিশেষ কোনো গুপ্ত খবরের সন্ধান পাবে না। কিন্তু এই ধরনের চিন্তাগুলো একটা যেন অভ্যাসের চক্রের মতো আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল অহর্নিশ। সর্বগ্রাসী শূন্যতার মাঝখানে ভাবনার বন্যা আলগা হ'লেই বার বার ক'রে আমি এসে উপস্থিত হতুম সেই একই বিষয়বস্তুর মধ্যে। কোন্ প্রশ্নের উত্তরে কি বলেছি আমি এবং তারই নানাবিধ সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর নিয়ে মত্ত হ'য়ে থাকাই ছিল আমার কাজ। এমন কি ঘুমের মধ্যেও এই অভ্যাসের দোষ থেকে মুক্তি পাইনি আমি।

"পুলিশের জেরা শেষ হওয়ার পর শুরু হ'ত আত্মবিশ্লেষণকারী নিজের জেরা। নিজের প্রশ্নগুলো ওদের চেয়ে কম মর্মান্তিক কিংবা কম যন্ত্রণাদায়ক ছিল না। বরং তাতে পীড়িত বোধ করতাম বেশি। কারণ, ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পুলিশের জেরা যেত শেষ হ'য়ে। কিন্তু বিদ্বেষভাবাপন্ন নিষ্ঠুর নির্জনতার কবলে প'ড়ে আত্মানুসন্ধানের পুনরাবৃত্তির শেষ কখনো হ'ত না। এবং চতুর্দিকের সেই টেবিল, চেয়ার, বিছানা আর চার দেয়ালের পরিচিত পরিবেশ পাগল ক'রে তুলত আমায়। বৈচিত্র্যের অবকাশ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ছিল। একখানা বই, সাময়িক পত্রিকা কিংবা মানুষের মুখ চোখে পড়েনি আমার। কোনো কিছু টুকে রাখবার জন্য না ছিল একটা পেন্সিল, অথবা না ছিল একটা সামান্য দেশলাই-এর বাক্স যেটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বৈচিত্র্যের একটু স্বাদ পেতে পারতুম আমি। কিছুই ওরা রাখেনি—সত্যিই একেবারে কিছুই না। ঠিক এই সময়েই আমি টের পেলুম যে, হোটেল-ঘরে আবদ্ধ ক'রে রাখবার ব্যবস্থার পেছনে কি সাংঘাতিক শয়তানী বুদ্ধিই না ওদের রয়েছে। শুধু কি তাই? এর মধ্যে আছে খুনীসুলভ মনস্তত্ত্ববিদের কলাকৌশলও। বন্দীশিবিরে হয়তো পাথর ভাঙতে ভাঙতে হাত যেত ক্ষত-

বিক্ষত হ'য়ে, তাঁগায় পায়ের রক্ত যেত জমাট বেঁধে। হয়তো বাস করতে হ'ত অতিশয় অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে ভেড়ার পালের মতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের সাহচর্য পেতুম, হেঁটে বেড়াবার পরিসর থাকত—একটি গাছ, আকাশের একটি তারা কিংবা যা হোক কিছু একটা নিশ্চয়ই পাওয়া যেত যার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকবার আনন্দলাভে বঞ্চিত হতুম না। অথচ হোটেল-কক্ষে কি হচ্ছে? বিন্দুমাত্র বৈচিত্র্য নেই—সবই অনড়, অচঞ্চল। সেই একই জিনিস, একই পরিবেশ; পাগল ক'রে দেওয়ার মতো অবিচ্ছিন্ন একঘেয়েমি। এখানে এমন কিছুই ছিল না যার দ্বারা আমার একমুখী চিন্তা, অথবা আত্ম-প্রবঞ্চনামূলক কল্পনা কিংবা একই বিষয়ের পীড়াদায়ক পুনরাবৃত্তির অভ্যাসের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র পরিবর্তন ঘটতে পারত। সত্যি কথা বলতে কি, ওদের উদ্দেশ্যই ছিল এইরকম একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করা। ওরা চেয়েছিল দিনের পর দিন চব্বিশ ঘণ্টাই আমি চিন্তা ক'রে যাব। তারপর চিন্তার ভারে আমার কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসবে। তখন আর কোনো কথাই লুকিয়ে রাখতে পারব না। ওরা যা জানতে চেয়েছিল তাই আমি স্বীকার করব। শেষ পর্যন্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ সহ লোকজনদের নামধাম ফাঁস ক'রে দিয়ে আত্মসমর্পণ করব আমি।

"ক্রমে ক্রমে অনুভব করতে লাগলুম, নিঃসঙ্গ জীবনের শূন্যতার চাপ আমি আর সহ্য করতে পারছি না, স্নায়ুতন্ত্র দুর্বল হ'য়ে আসছে। অবস্থার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হ'তে গিয়ে উত্তেজনা চরমে উঠল। মনে হ'ল ভেঙে পড়ব বুঝি। তবু চিন্তার গতি ভিন্নপথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করেছি অনেক। মনটাকে ডুবিয়ে রাখবার জন্য শিশু-ভুলানো ছড়া, লোকসংগীতের কলি এবং মহাকবি হোমারের কবিতা—এমন কি দেওয়ানী আইনের সংকলন-গ্রন্থের ধারাগুলি পর্যন্ত স্মরণশক্তি থেকে আবৃত্তি করতে লাগলাম। তারপর মনে মনে জটিলতাপূর্ণ অঙ্ক কষবারও চেষ্টা করেছি। একবার যোগ করছি, আবার তাকে ভাগও করছি। কিন্তু চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার মতো উপাদান কিছু খুঁজে পাচ্ছি না ব'লে স্মরণশক্তিও অকেজো হ'য়ে পড়ল। কোনো কিছুর মধ্যেই একাগ্রচিত্তে মনোযোগ দিতে পারছি না। শুধু একটা মাত্র চিন্তা ভেসে ওঠে, বিক্ষিপ্ত শরের মতো চতুর্দিকে ছুটে বেড়ায়। চিন্তাটা কি? সেটা হচ্ছে: ওরা কতটা কি জানে? কিংবা কি ওরা জানে না? গত কাল জেরার সময় কি বলেছি ওদের? পরের দিনই বা কি বলব?

"এই অবিশ্বাস্য ধরনের অবর্ণনীয় অবস্থার মধ্যে চারটি মাস কেটে গেল আমার। সত্যিই চার মাস! কত সহজেই না কথা দুটো লিখে ফেলা যায় —গোটা চার অক্ষর বই তো নয়! শুধু দুটো কথা, উচ্চারণ করতেই বা সময় লাগে কত? এক সেকেণ্ডও নয়, তার চার ভাগের এক ভাগ। কিন্তু স্থান-কালের অতীত অবস্থার মধ্যে এই চার মাসের স্থায়িত্বকাল যে কত দীর্ঘ তা কেউ না পারে নিজে বুঝতে, না পারে অপরকে বোঝাতে। সেই শাশ্বত এবং সনাতন টেবিল, চেয়ার, বেসিন, বিছানা—সেই অনাহত নৈঃশব্দ্য, সেই একই ওয়ার্ডার মুখের দিকে না তাকিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে প্রতিদিন খাবার থালা ঠেলে দিয়ে যায়, সেই একই চিন্তা মগজের ভেতর অহরহ চক্কর মেরে ঘুরতে থাকে—সেই আদি-অন্তহীন মহাশূন্যতা ছাড়া আর কোথাও কিছু নেই—বিশ্বাস করুন, এমন পরিবেশের মধ্যে বাস করলে মানুষ পাগল না হ'য়ে পারে না।

"ছোটখাট দু'চারটে লক্ষণ দেখে বেশ বুঝতে পারছিলুম যে, মাথা আমার ঠিকভাবে আর কাজ করছে না। গোড়ার দিকে মাথা আমার পরিষ্কার ছিল। জেরার সময় জবাব দিয়েছি ভেবে-চিন্তে এবং সুস্থ মেজাজে। তখন পর্যন্তও দুটি মাত্র চিন্তায় মন আমার আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকত · আমার কি বলা উচিত এবং কি কি বলা উচিত নয়। কিন্তু এখন দেখলুম সহজ কথাগুলোও থেমে থেমে বলছি। যতক্ষণ কথা বলি ততক্ষণ পর্যন্ত দৃষ্টি আমার সম্মোহিতের মতো পুলিশ কর্মচারীর কলমটার মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে থাকে। হড়হড় ক'রে লিখে যাচ্ছে সে, আমি ভাবছি তার সঙ্গে আমার কথাগুলোও যদি প্রাণপণ পাল্লা দিয়ে ছুটে যেতে পারত! অনুভব করলুম, মনটাকে আর নিজের শাসনাধীনে রাখতে পারছি না। আত্মনিয়ন্ত্রণের বাঁধন শ্বলিত হয়ে পড়ছে—আমি এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যখন নিজের জীবনরক্ষার জন্য সব কথাই প্রকাশ ক'রে দিতে পারি। হয়তো, যা বলার দরকার নেই, তাও বলব। মহাশূন্যতার শ্বাসরোধকারী আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য বিশ্বাস-ঘাতকতা করতেই বা দ্বিধা করব কেন? গুপ্ত তথ্য ফাঁস ক'রে দিলে বারোজন লোক অন্তত বিপদে পড়বেই। এতে আমার ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধে কিছু হ'ত না। তা না হোক—তবুও তার বিনিময়ে প্রাণ ভ'রে একটি নিশ্বাস ফেলবার অবকাশ আমি পেতুম।

"একদিন সন্ধেবেলা সেই চরমতম সংকট-মুহূর্তটা এসে উপস্থিত হ'ল। ওয়ার্ডার সবেমাত্র আমার সামনে খাবার থালাটা ঠেলে দিয়ে গেছে এমন সময় মরিয়া হ'য়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, 'আমাকে পুলিশের কাছে নিয়ে চলো। সব কথা আমি স্বীকার করতে চাই। তাদের আমি ব'লে দেব কোথায় কাগজপত্র এবং টাকাপয়সা সব লুকনো আছে। একটা কথাও গোপন করব না—সব ফাঁস ক'রে দেব।' সৌভাগ্যবশত কোনো কথাই শুনতে পায়নি সে। অনেকটা দূরে চ'লে গিয়েছিল লোকটি। কিংবা হয়তো আমি যা বলছি তা সে শুনতে চায়নি।

"এই চরমতম মুহূর্তে এমন একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘ'টে গেল যার ফলে সাময়িকভাবে হ'লেও, দম-আটকানো আবহাওয়া থেকে নিষ্কৃতি পেলুম আমি। জুলাই মাস প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। বর্ষণমুখর এক দুর্যোগের রাত্রি—এইসব খুঁটিনাটি ঘটনাগুলো যে মনে রেখেছি তার কারণ, আমাকে যখন জেরা করবার উদ্দেশ্যে পুলিশের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল ওরা তখন সরু বারান্দার জানালাগুলোর গায়ে বৃষ্টির ধারা ঘর্ঘর শব্দে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। পাশের ঘরে আমায় অপেক্ষা করতে হ'ল। জেরার পূর্বে সবাইকে এমনিভাবে অপেক্ষা করিয়ে রাখত। এটাও ওদের পূর্ব-পরিকল্পিত কৌশল একটা। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ মধ্যরাত্রে ডেকে পাঠানোর অর্থ হচ্ছে বন্দীর অবসাদগ্রস্ত স্নায়ুতন্ত্রের ওপর আচমকা আঘাত হানা। তারপর সেই আঘাতটা সামলে নিয়ে যখন সে আসন্ন অগ্নিপরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে তখন আবার তাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়ে রাখে। তার ফলে দেহ এবং মন দুটোই মুহ্যমান হ'য়ে আসে ক্লান্তি ও অবসাদের ভারে। জেরার সময় প্রতিরোধের আর ক্ষমতা থাকে না। সেদিনের সেই সাতাশে জুলাই তারিখের রাত্রে বৃহস্পতিবার আমাকেও অপেক্ষা করিয়ে রাখল বহুক্ষণ পর্যন্ত। পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সময়সূচক ঘণ্টা বাজতে শুনলুম দু'বার। তারিখটা মনে রাখবারও বিশেষ একটা কারণ আছে।

"আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, বসবার হুকুম আমায় দেয়নি ওরা। দু' ঘণ্টা ধ'রে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পা দুটো আমার ব্যথায় টনটন করতে লাগল। ঘরের দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার টাঙানো ছিল। আপনাকে আমি কেমন ক'রে বোঝাই যে, কোনো-একটা যেমন-তেমন ধরনের মুদ্রিত

কাগজ চোখ দিয়ে গেলবার জন্ত দৃষ্টির ক্ষুধা আমার কি প্রবল হ'য়ে উঠেছিল ! দেয়ালের ওপর ক্যালেণ্ডারে লেখা 'আগস্টে জুলাই' কথা দুটির দিকে আমি তাই অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম চির-বুভুক্ষুর মতো। সারা অস্তিত্ব দিয়ে কথা দুটি আমি যেন চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছি। অপেক্ষা করছি, আর মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছি, দরজা কখন্ খোলে। আবার তারই মাঝখানে ভেবে চলেছি, আমার জেরাকারীরা এবার কি ধরনের প্রশ্ন করবে আমায়। এবারকার প্রশ্নগুলো হবে ভিন্ন ধরনের। যেসব জবাব দেওয়ার জন্য নিজেকে আমি তালিম দিয়ে রেখেছিলুম, আমার বিশ্বাস, সেদিকের পথ ওরা মাড়াবেই না। তবুও এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা এবং খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকার কষ্টভোগ আমার কাছে আনন্দপ্রদ আশীর্বাদের মতো মনে হ'ল। কারণ, এই ঘরটা ছিল আমার ঘর থেকে আলাদা। আয়তনে একটু বড়, জানালাও দুটো। আর সবচেয়ে আনন্দ হ'ল এই দেখে যে, ঘরটিতে বিছানা, বেসিন, কিংবা সেইসব নাখোবার দেখা জিনিসগুলির অস্তিত্ব কিছু নেই। দরজার রং অন্য ধরনের। দেয়ালের দিকে একটা চেয়ার ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু তাও এক রকমের নয়। বাঁ দিকে রয়েছে কাগজপত্র রাখবার একটা দেরাজ। দেরাজের পাশে আলনা। দেখলুম, আমারই স্বীকারোক্তি আদায়কারীদের তিন-চারটে জলে-ভেজা মিলিটারি কোট তাতে টাঙানো রয়েছে। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত কয়েকটা নতুন জিনিস চোখে পড়ল আমার। পিপাসিত দৃষ্টির সামনে এসবই এমন অসামান্য ঠেকল যে, লোভীর মতো অতি তুচ্ছ জিনিসগুলিও আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম।

"কোটগুলোর ভাঁজে ভাঁজে দৃষ্টি বুলিয়ে চললুম আমি। হঠাৎ দেখি, একটা কোটের গায়ে এক ফোঁটা জল টলমল করছে। আপনার কাছে হয়তো হাস্যকর মনে হবে, তবু বলছি, সেই দোদুল্যমান জলবিন্দুটি শেষ পর্যন্ত গড়িয়ে মাটিতে পড়বে, না মাধ্যাকর্ষণশক্তিকে অগ্রাহ্য ক'রে যথাস্থানে টিকে থাকবে তাই দেখবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলুম। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ জলবিন্দুটির সামনে কয়েক মিনিট পর্যন্ত নিশ্বাস বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলুম আমি। যেন ওইটির ওপরেই আমার জীবনমরণ সব নির্ভর করছে। তারপর অবিশ্যি জলের ফোঁটা গড়িয়ে প'ড়ে গেল মাটিতে। অতঃপর কি করি ? কোটের বোতামগুলো গুনতে লেগে গেলাম। হ্যাঁ, দুটো কোটে

আটটা বোতামই আছে। তৃতীয়টায় দেখলুম দশটা। কাজ এখানেই শেষ হ'ল না। পুলিশ কর্মচারীরা কে কোন্ পদে অধিষ্ঠিত তাও আমি কোটের গায়ে আঁকা চিহ্ন দেখে দেখে বোঝবার চেষ্টা করলাম। এইসব অপ্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিস নিয়ে খেলা করতে ভালো লাগছিল আমার। এবং আমার পিপাসিত দৃষ্টিকে এরা যে কি ভীষণভাবে লোভাতুর করে তুলল সে কথা সবিস্তারে বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। হঠাৎ এমন একটা জিনিস আমার চোখে পড়ল যার ফলে অন্য দিকে আর আমি দৃষ্টি ফেরাতে পারলুম না। একই জায়গায় নিবদ্ধ হ'য়ে রইল। আমি দেখলুম, একটা কোটের পাশের পকেটটা একটুখানি উঁচু হ'য়ে উঠেছে। আমি আরও খানিকটা এগিয়ে গেলাম সেই দিকে। পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, ঠেলে-বেরিয়ে-আসা চতুষ্কোণ বস্তুটি বই ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যিই ওটা একটা বই। আবেগে ও অধীরতায় হাটু দুটো আমার কেঁপে উঠল।

"গত চার মাসের মধ্যে একখানা বইও আমি হাত দিয়ে ছুঁতে পারিনি। অতএব বই-এর কথাটা মনে আসতেই সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো মুদ্রিত অক্ষরগুলি ও সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি পাতা এবং ছত্রগুলিও চোখের ওপর ভেসে উঠল আমার। তা ছাড়া নূতন চিন্তার বৈচিত্র্য আস্বাদের কথা ভেবেও আমি মাতালের মতো নেশাগ্রস্ত হ'য়ে উঠলুম। সেই সঙ্গে হতবুদ্ধি না হ'য়েও পারলুম না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি চেয়ে রইলুম পকেটের ঐ স্ফীতিটুকুর দিকে। চোখ দুটো আমার জ্বলজ্বল ক'রে জ্বলছে, তারই হল্কা-স্পর্শে পকেটের স্থানটুকুতে হয়তো বা একটা গতির সৃষ্টি হবে। শেষ পর্যন্ত লোভ সংবরণ করা অসম্ভব হ'ল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও এগিয়ে গেলুম আরও কাছে। এবার কাপড়ের ওপর দিয়েই বইটা আমার হাতে ঠেকবে এ কথা ভাবতে গিয়েই হাতের আঙুলে সুড়সুড়ি দিয়ে উঠল। আমি যে কি করছি সঠিকভাবে বুঝে উঠবার আগেই দেখি পকেটের নিকটতম সান্নিধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি।

"সৌভাগ্যের কথা, আমার এই বিচিত্র আচরণের প্রতি নজর দিল না পাহারাওয়ালা। বোধহয় ভাবল যে, প্রায় ঘণ্টা দুই খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকবার পর দেয়ালের গায়ে হেলান দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা হওয়া যে-কোনো লোকের পক্ষেই স্বাভাবিক। হাত দুটো এবার পেছন দিকে দিয়ে দাঁড়ালুম, যেন পাহারাওয়ালার অলক্ষ্যে কোটটা আমি ধরতে পারি। ধরলুমও। সঙ্গে

সঙ্গে অনুভব করলুম, চতুষ্কোণ বস্তুটি একটা বই-ই! হাতে ঠেকা মাত্রই মৃদু এবং মচমচে আওয়াজ উঠল। বিদ্যুৎ-স্পন্দনের মতো মনের আকাশে শুধু একটা কথাই ভেসে উঠল: বইটি চুরি করো। হাতসাফাইটা যদি পাহারাওয়ালার নজরে না পড়ে তা'হলে বইটাকে লুকিয়ে রাখা অসম্ভব হবে না। তারপর বন্দীকক্ষে ব'সে প'ড়ে যাও বই—শুধু পড়া আর পড়া। বৈচিত্র্যের স্পর্শ লেগে ক্লান্তিকর দিনগুলির একঘেয়েমি কাটুক। বিষাক্ত বৃত্তের মতো চকিতের চিন্তাটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল। কান ভোঁ ভোঁ করছে, বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে, হাত দুটো বরফের মতো জ'মে গিয়ে অসাড় হ'য়ে এল—মন বলছে চুরি করো, কিন্তু হাত আর উঠতে চায় না, বাধা দেয়। প্রথম মুহূর্তের অসাড় ভাবটা কেটে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে এবং অপরাধীর মতো কোটের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়ালুম আমি। দাঁড়িয়ে আছি আর এক দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি পাহারাওয়ালার দিকে। এবার বইটা হাতের মুঠোতে ধ'রে ফেললুম। লুকনো হাতের চাপ দিয়ে অত্যন্ত কৌশলে বইটা পকেট থেকে ঠেলে ঠেলে ওপরে তুলছি। একটু একটু ক'রে বেশ খানিকটা টেনে তুলে ফেললুম ওপর দিকে। তারপর সবলে একটা টান—সঙ্গে সঙ্গে ধীরস্থির এবং সতর্কভাবে বাইরের দিকে সরিয়ে আনা। অতঃপর মুহূর্তের মধ্যেই বইখানা সটান চ'লে এল আমার হাতের মুঠোয়। যা করলুম তার জন্য এবার আমার ভয় করতে লাগল। কিন্তু এখন আর পিছু হঠবার পথ নেই। বইটা নিয়ে করি কি? ট্রাউজারের পেছন দিকে কোমরবন্ধের তলায় ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর আস্তে আস্তে তাকে ঠেলে নিয়ে গেলাম কোমরের নিচের দিকে। হাঁটবার সময় যেন মিলিটারি কায়দায় কোমরের দু'দিকে হাত রেখে বইটাকে ধ'রে রাখতে পারি। পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য আলনার কাছ থেকে প্রথমে স'রে এলুম এক পা—তারপর দু' পা। তিন পা-ও হাঁটলুম। হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে। ফন্দীটা নেহাত মন্দ হয়নি। কোমরবন্ধের ওপর হাত দুটো যদি সজোরে চেপে রাখতে পারি তাহ'লে বইখানা যথাস্থানেই সেঁটে ব'সে থাকবে।

"একটু পরেই শুরু হ'ল শুনানির পালা। প্রশ্নোত্তরের সময় আমায় সতর্ক থাকতে হ'ল আগের চেয়েও বেশি। সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রতি যত না মনোযোগ দিচ্ছি তার চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দিতে হচ্ছে বইটাকে লোক-

চক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখবার জন্য। আমার ভাগ্য এবার সুপ্রসন্ন ছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই জেরা গেল শেষ হ'য়ে। বইটা ঘর পর্যন্ত নিয়েও এলুম। কিন্তু আসবার পথে এক বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে প'ড়ে গিয়েছিলুম। বইটা হঠাৎ ফসকে গিয়ে ট্রাউজারের তলার দিকে পিছলে পড়ল—কি সাংঘাতিক ব্যাপার ভেবে দেখুন! নতুন ফন্দীর আশ্রয় নিতে হ'ল। সহসা আমি প্রচণ্ডভাবে কাশতে আরম্ভ করলুম। কাশি আর থামে না। কাশি চাপবার জন্য আমায় যেন কোমর ভেঙে নীচু হ'তে হচ্ছে। নীচু হ'য়ে দাঁড়াবার অবসরে বইটাকে আবার ঠেলেঠুলে টেনে নিয়ে এলাম কোমরবন্ধের তলায়। কিন্তু সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথাটা ভাবতে গেলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে! শেষ পর্যন্ত বইটাকে নিয়ে আমার ঐ হোটেল-কক্ষের নরকে এসে পৌঁছলুম. এবারও সেই নির্জন নরকের একক অধিবাসী আমি—তবুও যেন মনে হ'ল, আমি আর সত্যি সত্যি সম্পূর্ণরূপে সঙ্গহীন নই।

"আপনি হয়তো ভাবছেন, ঘরে পৌঁছেই আমি বইটা নিয়ে পড়তে ব'সে গেলুম, চোখ দিয়ে গিলতে লাগলুম প্রতিটি কথা। মোটেই তা নয়! একটা বই নিজের দখলে পাওয়ার আনন্দটুকু শুধু র'য়ে-ব'সে উপভোগ করতে চাইলুম প্রথম। চুরি ক'রে পাওয়া বইখানা যে ঠিক কি ধরনের হওয়া উচিত সেই চিন্তার দিবা-স্বপ্ন দেখতে লাগলুম যেন। খুলে দেখার মুহূর্তটাকে কৃত্রিম উপায়ে এমনভাবে বিলম্বিত করতে লাগলুম যে আগ্রহে ও উৎকণ্ঠায় মনে হচ্ছিল, আমার স্নায়ু-শিরায় আগুন লাগল বুঝি। সবচেয়ে ভালো লাগছিল বইটার কথা ভাবতে—ছোট হরফে মুদ্রিত নিশ্চয়ই, ঘন ঘন লাইন, হাজার হাজার অক্ষর, পাতলা পাতলা পাতার সংখ্যা এত বেশি হবে যে, অনেকক্ষণ লাগবে বইটা শেষ করতে। তারপর আমি কল্পনা করতে লাগলুম যে, বইটার বিষয়বস্তু হাল্কা তো হবেই না, বরং মনোযোগ দিয়ে পড়বার মতো গুরুগম্ভীর হবে। প্রকৃতপক্ষে এটা নিশ্চয়ই এমন বই হবে যা প'ড়ে আমি শিক্ষা লাভ করব এবং দরকারী অংশগুলো মুখস্থও করব। যদি গ্যেটে কিংবা হোমারের লেখা বই হয়? হায় রে দুরাশা! শেষ পর্যন্ত আগ্রহ আর কৌতূহল দমন ক'রে রাখতে পারলুম না। পাহারাওয়ালা যদি হঠাৎ আচমকা এসে দরজা খুলে ফেলে সেইজন্য সটান বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লুম। তারপর দুরুদুরু বুকে কোমরবন্ধের তলা থেকে বইটা টেনে বার করলুম।

"প্রথম দৃষ্টিতেই মন যে আমার শুধু হতাশার ভারে মুষড়ে পড়ল তা নয়, তিক্ত বিরক্তিতে মন আমার কানায় কানায় ভ'রেও উঠল। তার কারণ, যে বস্তুটি উদ্ধার ক'রে আনবার জন্য এত বড় একটা সাংঘাতিক ঝুঁকি নিলাম এবং যার মধ্যে গ'ড়ে তুলেছিলাম আশা ও আনন্দের একটা আকাশচুম্বী সৌধ, আসলে সেটা পৃথিবীবিখ্যাত দেড়শো দাবা খেলোয়াড়ের খেলার কৌশল সংবলিত একটা সংকলন-গ্রন্থ মাত্র। আমি যদি এখানে কয়েদী হ'য়ে না থাকতুম তাহ'লে প্রথমেই বইটাকে খোলা জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতুম বাইরে। এখন আমি কি করব? এমন একটা অপ্রয়োজনীয় বাজে বই আমার কি কাজে লাগবে? ইস্কুলে থাকতে প্রায় সব ছেলেরাই যেমন সময় কাটাবার জন্য দাবা নিয়ে নাড়াচাড়া করে আমি তেমনি মাঝে মাঝে দাবা খেলবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু দাবা খেলার এই পুঁথিগত বিদ্যা আমি কি কাজে লাগাই এখন? একা একা দাবা খেলা যায় না। একজন দাবাড়ে এবং একটা ছক চাই তো। অসীম বিরক্তির সঙ্গে বইটার পাতা ওল্টাতে লাগলুম আমি। ভাবলাম, পড়বার মতো যা হোক একটা ভূমিকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। সারগ্রন্থ পাঠেও তো সময় কাটানো চলে। সব কল্পনাই ভেস্তে গেল আমার। ওস্তাদ খেলোয়াড়দের কতকগুলি চিহ্ন সংবলিত চতুষ্কোণ ছাড়া ওতে আর কিছুই ছিল না। তাও সেইসব সাংকেতিক চিহ্নগুলি আমার কাছে তখন একেবারে দুর্বোধ্য ছিল। বীজগণিতের অঙ্কের মতো দেখতে, অথচ তার সমাধানের উপায় আমার জানা নেই। অঙ্কের ধাঁধাগুলি ক্রমে ক্রমে আমার কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগল। এ, বি, সি ইংরেজী হরফ থেকে ঘুঁটির অবস্থিতি বুঝতে হবে ওপর থেকে নিচে, অর্থাৎ সারিগুলি খাড়া। এবং এক থেকে আট পর্যন্ত সংখ্যাগুলি নির্দেশ করে ঘুঁটির আড়াআড়ি অবস্থান। হরফগুলি নির্ভুলভাবে পড়লে ছকের বর্তমান অবস্থা পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত এইসব নির্বাক সাংকেতিক চিত্রাঙ্কনগুলি আমার কাছে অর্থসূচক প্রত্যক্ষ বাস্তব ব'লে মনে হ'তে লাগল। কণ্ঠে যেন ভাষা পেল এরা।

"ভাবলুম, কারাকক্ষে ব'সে যদি একটা দাবার ছক উদ্ভাবন করতে পারি কে জানে, তাহ'লে হয়তো এইসব সাংকেতিক চিহ্নগুলির অর্থ বোঝা কঠিন হবে না। হঠাৎ আমার দৃষ্টি পড়ল চৌখুপী নক্শা-কাটা বিছানার চাদরটার

ওপর। এ যেন ভগবান নিজেই আমার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। যদি নিপুণভাবে নক্শাগুলোকে কাজে লাগাতে পারি তাহ'লে এ থেকে চৌষট্টিটা চৌকো ঘর তৈরি করা অসম্ভব হবে না। প্রথম পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে বইটা লুকিয়ে রাখলাম গদির তলায়। তারপর রুটির টুকরো বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে তাই দিয়ে তৈরি ক'রে নিলাম রাজা, মন্ত্রী ইত্যাদি সব ঘুঁটি। অবিশ্যি ব্যাপারটা যে হাস্যকর তাতে আর সন্দেহ নেই। অবশেষে অনেক চেষ্টার পর প্রথম-পাতায় যে মুদ্রিত ছকটি ছিল তারই অবিকল প্রতিচ্ছবি গ'ড়ে তুললুম বিছানার চাদরের ওপর। যে ঘুঁটি যেখানে ছিল ঠিক সেইভাবেই সাজিয়ে নিলুম রুটির টুকরোগুলি। ঘুঁটি চালতে গিয়ে দেখা দিল এক নতুন বিপদ। সাদা কালোর পার্থক্য বজায় রাখবার জন্য অর্ধেক ঘুঁটির গায়ে ধুলো মাখিয়ে নিয়েছিলুম। কিন্তু বই-এর ছক অনুযায়ী খেলতে গিয়ে দেখি ঠিক-মতো খেলা যাচ্ছে না। প্রথম ক'দিন তাই সব এলোমেলো হ'য়ে যেতে লাগল। পাঁচবার, দশবার, এমনকি বিশবার পর্যন্তও সাজানো ছক ভেঙে ফেলে আবার গোড়া থেকে নতুন ক'রে খেলা শুরু করছি আমি। পৃথিবীতে এমন লোক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব যার হাতে নষ্ট করবার মতো অপর্যাপ্ত সময়ের অভাব ঘটে না। আমার কথা আলাদা। তারা তো আমার মতো মহাশূন্যতার কারাগারে বন্দী হ'য়ে নেই। আমার তাই লোভও বেশি, ধৈর্য ধরার ক্ষমতাও ততোধিক।

"নির্ভুলভাবে একটি খেলা শেষ করতে ছ'দিন লেগেছিল আমার। তার এক সপ্তাহের মধ্যেই অন্য দাবাড়েদের সাহায্য ছাড়াই উভয় পক্ষের ঘুঁটির পারস্পরিক অবস্থান বুঝে নিতে পারলুম আমি। আর এক সপ্তাহ লাগল নক্শা-কাটা বিছানার চাদরটি বাদ দিয়েই খেলা চালিয়ে যেতে। যেসব সাংকেতিক চিহ্নগুলি এতদিন দুর্বোধ্য ব'লে মনে হয়েছিল এখন সেগুলো যেন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই এক-একটি অর্থসূচক আকার ধারণ ক'রে উপস্থিত হ'ল আমার মনশ্চক্ষুর সামনে। ঘুঁটিগুলোর পরস্পর স্থানবিনিময় পর্যন্ত নিখুঁতভাবে চালিয়ে গেলুম আমি। মনের মধ্যেই দাবার ছকটি পেতে ফেলেছিলাম। তার ওপরে সাজিয়ে নিলাম সবগুলো ঘুঁটি। অভিজ্ঞ সংগীত পরিচালক যেমন স্বরলিপির দিকে দৃষ্টি দিয়েই প্রতিটি বাদ্যযন্ত্রের পৃথক পৃথক এবং সম্মিলিত আওয়াজ শুনতে পায় আমিও তেমনি সাজানো ছকের দিকে

চেয়ে বাজির তাৎপর্য বুঝে নিতে পারতুম—চাল এবং পাল্টা চাল দিতে অসুবিধে হ'ত না।

"পনরো দিন পরেই দেখলাম বইতে যেসব বাজির কথা লেখা ছিল তার প্রতিটি বাজিই আমি অনায়াসে মনে মনে খেলে যেতে পারছি। এই মনে মনে খেলাকে দাবার পরিভাষায় 'গাইবী' খেলা বলে। এতদিনে আমি সত্যি সত্যি বুঝতে পারলাম, এই চুরি-করা বইটি আমার কি উপকারেই না লেগেছে। নিজেকে ব্যাপৃত রাখবার মতো কাজ পেয়েছি একটা—আপনি হয়তো বলতে পারেন, এ তো উদ্দেশ্যহীন অ-কাজ ছাড়া আর কিছু নয়। তা হোক, আমার চতুর্দিকে যে নিঃসঙ্গতা জমাট বেঁধে উঠেছিল তার অবসান ঘটল। বিশ্ববিখ্যাত ওস্তাদ দাবাড়েদের একশো পঞ্চাশটা খেলার ছক এবং কৌশল মুখস্থ করবার পর মনে হ'ল, বৈচিত্র্যহীন স্থান ও কালের একঘেয়েমি আর আমায় গলা টিপে মেরে ফেলতে পারবে না—প্রতিরোধ করবার অস্ত্র পেয়েছি হাতে।

"এর পর থেকে এই নতুন অনুরাগের বৈচিত্র্যটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য সারা দিনের একটা কর্মসূচী ঠিক ক'রে ফেললুম। সকালে বিকেলে যথাক্রমে দু' বাজি ক'রে খেলব, আর সন্ধেবেলা ওগুলোরই পুনরাবৃত্তিমূলক আলোচনায় ডুবে থাকব আমি। আগে আমার কাছে মনে হ'ত দিনগুলো সব আকার-হীন থলথলে জেলি-পদার্থের মতো। এখন আর তা রইল না—প্রত্যেকটা দিনই কর্মব্যস্ততায় ভরপুর হ'য়ে উঠল। এমন একটা কাজ পেলুম হাতে যার মধ্যে ক্লান্তি কিংবা অবসাদ নেই। কারণ, দাবা খেলার একটা বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ল আমার যে, সীমাবদ্ধ ছকের মধ্যে মনটা যতই কেন কেন্দ্রীভূত হ'য়ে থাকুক না, তাতেও মানুষের চিন্তাশক্তি মুহূর্তের জন্যও নিস্তেজ কিংবা দুর্বল হ'য়ে পড়ে না। বরং এর উল্টোটাই হয়। মনের সক্রিয়তা অধিকতর তীক্ষ্ণ হ'য়ে ওঠে। ওস্তাদ খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি-মূলক আলোচনা প্রথম প্রথম যন্ত্রের মতো একঘেয়ে লাগত বটে, কিন্তু কালক্রমে আমার মধ্যে জন্ম নিল এক শিল্পসুলভ আনন্দ উপলব্ধির ক্ষমতা। খেলার সূক্ষ্ম নিয়মকানুন এবং ছলাকলার সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম আক্রমণ আর আত্মরক্ষার উপায়গুলিও শিখে ফেললুম আমি। আগাম চাল দেওয়ার প্রয়োগকৌশল এবং নানা উপায়ে ঘুঁটি সাজাবার ও চালবার পদ্ধতিও আয়ত্তে এসে গেল

আমার। বিশেষ কোনো কবির লেখা দু'চারটে লাইন পড়লেই যেমন তাঁকে নির্ভুলভাবে চিনে ফেলা যায়, আমিও তেমনি প্রত্যেকটি ওস্তাদ খেলোয়াড়ের নিজস্ব খেলার পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখতে পেতাম। প্রথমে যা নিছক সময় কাটাবার উদ্দেশ্যে শুরু করেছিলাম, এখন দেখলুম, সেটাই হ'য়ে উঠেছে আনন্দের উৎস। অ্যালেখিন, ল্যাসকার, টার্টাকোভার প্রভৃতি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিশ্ববিখ্যাত দাবা খেলোয়াড়রা আমার কাছে আর দূরের মানুষ রইলেন না, অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতন তাঁরা এসে ঢুকে পড়লেন আমার এই নির্জন জগৎটুকুতে।

"বহু বিচিত্র লোকের সমাগমে হোটেলের এই কারাকক্ষটি যেন জনবহুল হ'য়ে উঠল। নিয়মিত খেলার অনুশীলনের দ্বারা আমার নিস্তেজ মননশক্তিকে অচিরেই পুনরুজ্জীবিত ক'রে তুললুম। চিন্তাশক্তি আগের চেয়ে বরং তীক্ষ্ণতর হ'ল। তার পরিচয় পেলুম শুনানির দিনগুলিতে। ধমকানি শুনে আমি সহজে আর কাবু হ'য়ে পড়ছি না। কল্পিত দাবার ছকের সামনে খেলা করতে করতে আত্মরক্ষার কলাকৌশল সব আয়ত্তে এসে গিয়েছে। এখন থেকে গেস্টাপো পুলিশরা আমায় যেন শ্রদ্ধাই করতে লাগল। অন্যান্য কয়েদীরা এদের জেরার সামনে ভেঙে পড়েছে, অথচ আমার কাছ থেকে কোনো কথাই বার করতে পারছে না ব'লে বিস্মিত বোধ করছে এরা। ভেবে পাচ্ছে না আমার এই প্রতিরোধ-ক্ষমতার মূল প্রেরণা কোথা থেকে এল।

"প্রায় তিনটে মাস বেশ আনন্দেই কেটে গেল আমার। এই সময়টা আমি প্রতিদিন বইতে মুদ্রিত ঐ একশো পঞ্চাশটা খেলা নিয়মিতভাবে খেলে গিয়েছি। তারপর হঠাৎ একদিন অনুভব করলুম, আমার চতুর্দিকে আবার সেই শূন্যতার গহ্বর একটা সৃষ্টি হয়েছে। অস্বাভাবিক ব্যাপার কিছু নয়। কারণ, একই খেলা অসংখ্যবার খেলবার পরে এর মধ্যে নতুনত্ব কিংবা বিস্ময়ের মাদকতা আর রইল না। উৎসাহ আর উত্তেজনাও গেল ক'মে। এমন খেলা খেলে আর কি লাভ যার প্রতিটি সম্ভাব্য চাল অনেক আগে থেকেই আমার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল? খেলতে ব'সে প্রথম চালটা দিতে না দিতেই পুরো খেলাটাই ভেসে উঠত আমার চোখের সামনে। জটিলতার পাকগুলো নিজে থেকেই খুলে খুলে যেত। তার ফলে খেলার মধ্যে আমি আর সমস্যার সন্ধান পেতুম না। সবই সহজ সরল হ'য়ে গেল। এই সময় যদি নতুন নতুন খেলা

সম্বন্ধে দ্বিতীয় একখানা বই হাতে আসত তাহ'লে মনের অবসাদ যেত দূর হ'য়ে। মনটাকে চিন্তার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা আমার কাছে অপরিহার্য হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বই হাতে আসা তো অসম্ভব। অতএব কি করা যায়? ডুবে থাকবার মতো আমার সামনে শুধু একটা পথই খোলা ছিল— পুরনো খেলার পুনরাবৃত্তির অভ্যাসের বদলে নিজেই আমি নতুন খেলার উদ্ভাবন করতে লাগলুম। আমিই হইলুম আমার প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়।

"খেলার রাজা দাবা—এই খেলায় যে কতখানি বুদ্ধির দরকার হয় সে সম্বন্ধে আপনি কি ধারণা পোষণ করেন জানি না। কিন্তু যে খেলার ফলাফল সূক্ষ্ম হিসেবনিকেশসাপেক্ষ, তার ফলাফল যদি দৈবের ওপর নির্ভরশীল হয় তাহ'লে এ কথা বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হয় না যে, নিজের বিরুদ্ধে নিজে খেলার ব্যাপারটা একটা অর্থহীন অসংগতি হ'য়ে দাঁড়ায়। যাই বলুন না কেন, এ কথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, দাবা খেলায় দুই খেলোয়াড় দুই রকমের কৌশলপ্রক্রিয়া প্রয়োগ করেন। এবং এটাই হচ্ছে দাবা খেলার সর্বপ্রধান আকর্ষণ। উভয় পক্ষের মানসিক যুদ্ধের ফলে যখন দুটো পৃথক কৌশল গড়ে ওঠে তখন কালো ঘুঁটি বুঝতে পারে না সাদা ঘুঁটির পরবর্তী চালটা কি ধরনের হবে। সাদার অবস্থাও ঠিক তাই। সে ক্রমাগত চেষ্টা করছে কালোর গুপ্ত অভিসন্ধির আক্রমণ ভেদ করবার জন্য এবং সেই সঙ্গে আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখবার উপায়ও বার করছে সে। কিন্তু সাদা-কালোর দু' পক্ষ নিয়েই যদি একজনকে খেলতে হয় তাহ'লে তার অবস্থাটা এমন অস্বাভাবিক হ'য়ে দাঁড়ায় যে, সাদার হ'য়ে চাল দিতে গেলে কালোর উদ্দেশ্য আগে থেকে বুঝতে পারা যায় না। মগজের এই দ্বৈত অবস্থার অর্থ হ'ল, চেতনসত্তাকেও দ্বিধাবিভক্ত করা। এ যেন বৈদ্যুতিক বোতাম টিপে চিন্তা-রাজ্যটিকে একবার আলোকিত ক'রে তুলছি, আবার তাকে অন্ধকারে ঢেকেও দিচ্ছি আমি। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে, নিজের বিরুদ্ধে নিজেরই দাবা খেলতে বসা এমন একটা স্ববিরোধী ব্যাপার যে, নিজের ছায়াকে নিজে ডিঙিয়ে যাওয়ার চেষ্টার মতো অর্থহীন।

"নিতান্ত নিরুপায় হ'য়ে এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টাই আমি ক'রে চললাম মাসের পর মাস। আমার আর অন্য পথ ছিল না। নইলে আমি পাগল হ'য়ে যেতুম। অথবা মননশক্তি ধীরে ধীরে নিঃশেষ হ'য়ে যেত। এই

ভয়ংকর অবস্থার সম্মুখীন হ'য়ে সাদা এবং কালো ঘুঁটির মধ্যে নিজের সত্তাকে ভাগ ক'রে দিতে বাধ্য হলুম আমি। বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই, সেই ভয়াবহ মহাশূন্যতার দুঃসহ চাপে যেন ভেঙে-চুরে টুকরো টুকরো হ'য়ে না যাই তার জন্যই আমার এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা।"

ডাক্তার বি এবার ডেক-চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে মুহূর্ত খানিকের জন্য চোখ বুঁজে রইল। মনে হ'ল, একটা পীড়াদায়ক অতীত স্মৃতি চেপে রাখবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করছে সে। তার মুখের বাঁ দিকটা আগের মতো আবারও একটু অদ্ভুতভাবে কুঁচকে উঠল। বলাই বাহুল্য, চেষ্টা সত্ত্বেও এটা সে দমন ক'রে রাখতে পারে না। একটু পরেই ডাক্তার বি আবার বলতে আরম্ভ করল, "আশা করি, আপনি আমার কথাগুলো সব বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু পরের কাহিনীটুকু এতটা স্পষ্ট ক'রে বলতে পারব কিনা জানি না। এই ধরনের একটা অস্বাভাবিক কাজের মধ্যে নিজেকে পুরোপুরিভাবে ব্যাপৃত রাখতে গিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আমি হারিয়ে ফেললুম। দুটো কাজ একসঙ্গে বজায় রাখা অসম্ভব। নিজের সঙ্গে দাবা খেলার প্রতিযোগিতা যে নিরর্থক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয় সে কথা আপনাকে আমি আগেই বলেছি। এমন অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হ'তে পারত তাদের কাছে যদি সত্যিকারের একটা ছক পাওয়া যেত। সত্যিকারের ছক এবং ঘুঁটি নিয়ে খেলতে বসলে ভাববার অবকাশ পাওয়া যায়। কেননা টেবিলের এদিক ওদিক দু' দিকে ব'সে কালো এবং সাদা ঘুঁটির পৃথক পৃথক অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করবার সুযোগ ঘটে। যেহেতু একটা কাল্পনিক ছকের সামনে আমি নিজেই নিজের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা ক'রে যাচ্ছি সেইজন্য চৌসট্টি চৌকো ঘরের ছবি চোখে চোখে ধ'রে রাখতে আমি বাধ্য হতুম। তা ছাড়া উভয় পক্ষের খেলোয়াড়ের হ'য়ে খেলতে হচ্ছে ব'লে পরবর্তী চালগুলির আগাম হিসেব আমায় ক'রে যেতে হ'ত। আপনার কাছে হয়তো সমস্ত ব্যাপারটা মনোবিকারের লক্ষণ ব'লে প্রতীয়মান হচ্ছে—কিন্তু সত্যিই বলছি, নিজের অস্তিত্বকে আমি বহু বিভিন্ন সত্তায় বিভক্ত ক'রে ফেলতুম এবং তাদের প্রত্যেকের হ'য়ে চাল দিতে গিয়ে অগ্রিম চার-পাঁচ দানের চিন্তাটা শেষ পর্যন্ত আমার একটা অভ্যাসে পরিণত হ'ল।

"বিশ্বাস করুন এমন আশা আমি অবশ্যই করছি না যে, আপনি

আমার এই পাগলামির জটিলতা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারবেন। নিছক একটা কাল্পনিক ছক নিয়ে আমি যখন খেলতে বসতাম তখন কার্যত সাদা কালো দু' পক্ষের হ'য়ে দুটো আলাদা মানুষ হ'য়ে যেতুম আমি—এবং সেইজন্যই আগে থেকে পরবর্তী চার-পাঁচটা চাল আমায় ভেবে রাখতে হ'ত। কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্বের এই স্বয়ংসাধিত বহুবিভক্তির মধ্যেই যে সবচেয়ে বিপজ্জনক সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তা নয়। এই দুর্বোধ্য নিরীক্ষা-পরীক্ষার বাইরেই আমার আসল বিপদ এসে উপস্থিত হ'ল। একা একা খেলবার অভ্যাস করতে গিয়ে আমি যেন পা পিছলে প'ড়ে গেলুম মানসিক জগতের এক অন্তহীন গহ্বরে। প্রকৃতপক্ষে এই অভ্যাস দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়নি। গত কয়েক সপ্তাহ ধ'রে আমি যে একই খেলার পৌনঃপুনিক মহড়া দিয়ে যাচ্ছিলুম তার মধ্যে শুধু পুনরাবৃত্তির নীরসত্ব ছাড়া আর কিছুই ছিল না। বইতে ছাপানো কতকগুলি ছক নিয়ে নাড়াচাড়া করা মাত্র—উদ্ভাবনশক্তির প্রয়োজন তাতে হ'ত না। কবিতা কিংবা আইনকানুনের বই থেকে কয়েকটা ধারা মুখস্থ করার মেহনতের চেয়ে এতে বেশি পরিশ্রমের দরকার ছিল না। এই অভ্যাসের ক্ষেত্রটাও ছিল সীমাবদ্ধ এবং নিয়মনিয়ন্ত্রিত। অতএব নিদেনপক্ষে এটাকে একটা প্রীতিপ্রদ মানসিক ব্যায়ামচর্চা ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। সকাল-সন্ধ্যে দু' বাজি ক'রে খেলা ছিল আমার নিত্যকর্ম। তাতেও যদি ভুলভ্রান্তি কিছু ঘ'টে যেত সঙ্গে সঙ্গে বই থেকে দেখে নিতুম আমি। আমার খেলা ছিল অন্যের হ'য়ে—খেলার আসরে তাই আমি অনুপস্থিত থাকতুম। এই নৈর্ব্যক্তিকতা আর কিছু করুক বা না করুক, আমার নিস্তেজ স্নায়ুশিরাকে উজ্জীবিত করতে পেরেছিল। সাদা জিতল, না কালো জিতল তাতে আমার কি? আমার কাছে একই কথা। বস্তুত হার-জিতের পাল্লা চলেছে তো অ্যালেখিন কিংবা অন্যান্য ওস্তাদদের মধ্যে। আমি উপস্থিত আছি শুধু দর্শক হিসেবে। দেখছি আর তাঁদের মার-প্যাঁচের কায়দা থেকে আনন্দলাভও করছি। কিন্তু যেই মুহূর্তে নিজের বিরুদ্ধে খেলতে নামলুম ঠিক সেই মুহূর্ত থেকেই অজ্ঞাতসারে নিজেকে আমি নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ব'লে ভাবতে লাগলুম। সাদা-কালোয় আমার দ্বিধাবিভক্ত সত্তা পরস্পরের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ—প্রত্যেকেই নিজেকে কেন্দ্র ক'রে উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠছে, খেলায় জয়ী হওয়ার জন্য উভয়েই

আগ্রহে অধীর। আমার কালো সত্তা যখন কোনো চাল দিচ্ছে, আমি নিজে তখন অদম্য কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করছি আমার শ্বেত সত্তা কি করে তা দেখবার জন্য। দ্বৈত সত্তার যে-কোনো একটা যদি ভুল চাল দেয় তবে অপর সত্তাটি আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। আবার নিজেব ভুলের জন্য অপরের কাছে তিরস্কৃতও হয়।

"এসব কথা আপনাব কাছে হয়তো প্রলাপের মতো শোনাচ্ছে। অবিশ্যি এ কথা সত্যি যে, আমার এই ইচ্ছাকৃত ব্যক্তিসত্তার দ্বিধাবিভক্তি এবং তজ্জনিত গভীর উত্তেজনার সঞ্চার প্রভৃতি একজন সুস্থমস্তিষ্কের স্বাভাবিক লোকেব পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। এ কথাটা যেন ভুলে যাবেন না যে, আমাকে ওবা জবরদস্তি টেনে নিয়ে এসেছে স্বাভাবিক জীবনের পরিবেশ থেকে, বিনা অপরাধে কাবারুদ্ধ ক'রে রেখেছে—মাসেব পর মাস নির্জনতার শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদানে দুঃসহ লাঞ্ছনা দিয়েছে। অতএব দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত মনের আক্রোশ উজাড় ক'রে ঢেলে দেবার জন্য যে একটা পাত্র আমার দরকার তা তো জানা কথা। যেহেতু দ্বিতীয় কোনো কাজেব মধ্যে ডুবে থাকার সুযোগ আমি পাইনি, সেই কারণে আমার সমস্ত ক্রোধ এবং প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি অন্ধ বেগে পথ কেটে ঢুকে পড়ল এই দাবা খেলার মধ্যে। খেলতে ব'সেই উন্মাদের মতো উত্তেজিত হ'য়ে উঠতুম। গোড়াব দিকে অবিশ্যি খানিকটা সুস্থ এবং শান্ত মেজাজেই খেলা শুরু করতুম। এমন কি দু' বাজির মাঝখানে বিরতিব অবকাশও থাকত। সদ্যোসমাপ্ত খেলাটির প্রতিক্রিয়া পরিপাক করবার জন্য সময় নিতুম আমি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে উত্তেজনার মাত্রা এত বেড়ে গেল যে, বিশ্রামের কথা মনেই রইল না আর। সাদা সত্তা একটা চাল দিতে না দিতেই কালো সত্তাটি ক্ষিপ্র হস্তে তার নিজের ঘুঁটি চেলে দিয়ে ব'সে থাকে। একটা বাজি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পবের বাজির দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিজেই নিজেকে আহ্বান জানাই। এ কথা বলাই বাহুল্য যে, প্রতিবারেই আমার এক সত্তা অন্য সত্তাকে হারিয়ে দিয়ে জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে। খেলা তবু শেষ হয় না তৃপ্তিও আসে না।

"এই বিকারগ্রস্ত অতৃপ্তির ফলে আমার সেই হোটেল-কক্ষে ব'সে কত-গুলো বাজি যে আমি নিজের সঙ্গে নিজে খেলেছি তার একটা আনুমানিক হিসেবও আপনাকে দিতে পারব না। হয়তো হাজার বাজি, হয়তো বা

তার চেয়েও অনেক বেশি। এ একটা এমন ধরনের মনোবিকার যার প্রতিষেধক হিসেবে কোনো উপায়ই আমি খুঁজে পাইনি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দাবার ঘুঁটি—রাজা, মন্ত্রী, হাতী, ঘোড়ে ইত্যাদির কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাই ভাবতে পারতুম না। দাবার ছকটিকে কেন্দ্র ক'রে আমার গোটা অস্তিত্বটাই নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকত। খেলার আনন্দ ক্রমান্বয়ে পরিণত হ'ল উলঙ্গ লালসায়। এই লালসার তাড়না এত বেশি ছিল যে, খেলা বন্ধ ক'রে ব'সে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'ত। শেষ পর্যন্ত খেলাটা আমার কাছে হ'য়ে দাঁড়াল একটা বাতিক। দিনে-রাত্রে এমন কি ঘুমের মধ্যেও এই বাতিক থেকে মুক্তি পেলুম না আমি। সমস্তটা সময় সে গ্রাস ক'রে বসল। দাবার সমস্যাই আমার জাগরণের চিন্তা এবং নিদ্রার স্বপ্ন হ'য়ে উঠল। ধ্যানধারণাতেও দাবার চিন্তার অনুপ্রবেশ উপলব্ধি করতুম আমি।

"পুলিশের সামনে আমায় যখন জেরা করবার উদ্দেশ্যে এনে হাজির করত তখন নিজের দায়িত্ব সম্পাদনের কর্তব্য পর্যন্ত আমি ঠিকমতো ক'রে উঠতে পারতুম না। দাবার চিন্তায় মন থাকত মশগুল হ'য়ে। সেইজন্যই মনে হয় শেষ শুনানির দিন আমি নিশ্চয়ই জবাব দিতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি। কারণ, প্রশ্নকারী পুলিশ কর্মচারীরা অদ্ভুতভাবে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করছিল। ওরা যখন আমায় জেরা করত এবং আমার অবান্তর জবাব শুনে সবিস্ময়ে চিন্তা করত তখন আমি নিজের কামরায় ফিরে গিয়ে দাবার বাজিতে ডুবে থাকতে চাইতুম। বাজির পর বাজি খেলে যেতে ইচ্ছা করত। খেলার মধ্যে বাধার সৃষ্টি হ'লে বিরক্তির আর সীমা থাকত না আমার। ঘর পরিষ্কার করতে ওয়ার্ডারের লাগত মাত্র মিনিট পনরো সময়, আর খাবার পৌঁছতে লাগত মিনিট দুই—তাতেও আমি অধৈর্য হ'য়ে পড়তুম। কখনো কখনো দুপুরের খাবার সব প'ড়ে থাকত সন্ধে পর্যন্ত। খেলার নেশায় এমনভাবে মত্ত হ'য়ে থাকতুম যে, খাওয়ার কথা ভুলে যেতুম আমি। প্রবল তৃষ্ণাবোধ ছাড়া আমার আর কোনো দৈহিক চেতনা ছিল না। দু' ঢোকেই বোতলের সবটুকু জল খেয়ে ফেলে পাহারাওয়ালার কাছ থেকে আবার আমি জল চেয়ে নিতুম। তা সত্ত্বেও পরের মুহূর্তেই জিব যেত শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে। চব্বিশ ঘণ্টাই চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকতুম ব'লেই এমনটা ঘটত।

"শেষ পর্যন্ত উত্তেজনা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল যে, এক মুহূর্তও আর চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারিনে। দাবার চালগুলো ভাবছি আর ক্রমাগত পায়চারি ক'রে যাচ্ছি—কিস্তি মাতের মুহূর্তটা যতই এগিয়ে আসে পদক্ষেপের গতিও তত দ্রুততর হয়। জিতব, জিততেই হবে—জেতবার লালসায় তাড়িত হ'য়ে এমন অবস্থায় এসে উপনীত হই যখন দুর্বার আবেগে আমি কাঁপতে থাকি। মুহূর্তের অধৈর্য অসহ্য হয়ে ওঠে। সাদা সত্তা চেঁচিয়ে উঠে কালো সত্তাকে গর্জন ক'রে বলতে থাকে, 'তাড়াতাড়ি চাল দাও—দেরি ক'রো না, দেরি ক'রো না।' আপনার কাছে এসব ব্যাপার অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হচ্ছে জানি। কিন্তু কি করব, একটা সত্তা চাল দিতে বিলম্ব করলে অপর সত্তা ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। বলাই বাহুল্য যে, আজ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, আমার সেই বিকারগ্রস্ত মানসিক অবস্থার মূলে ছিল উত্তেজিত মননক্রিয়া—এবং এও আমি জানি, সেই বিশেষ অবস্থাটাকে শুধু একটিমাত্র সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়, যার পরিচয় চিকিৎসাশাস্ত্রেও নেই, তা হচ্ছে দাবা খেলার অন্তর্নিহিত বিষক্রিয়া। এ বিষ মানুষকে ভয়ংকরভাবে নেশাগ্রস্ত করে।

"এমন সময় এল যখন মন এবং মস্তিষ্ক দুটোই এই বিষক্রিয়ার আক্রমণে জর্জরিত হয়ে উঠল। ওজন ক'মে গেল আমার—ঘুমের মধ্যে দুর্বার অস্থিরতা। হাঁটবার সময় চোখের পাতা এত ভারি হ'য়ে থাকে যে খুলতে গেলে রীতিমতো কষ্ট হয়। জলের গেলাস মুখ পর্যন্ত তুলে আনতে হাত কাঁপে। কিন্তু যেই না খেলা শুরু করি সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর চেপে বসে এক দুরন্ত পাগলামি। দুই হাত মুঠো ক'রে উন্মাদের মতো ইতস্তত ছুটে বেড়াতে থাকি—ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে স্বগতকণ্ঠে বলতে থাকি, 'কিস্তি! কিস্তি মাত!'

"এই ভয়াবহ দুঃসহ অবস্থা কেমন ক'রে যে চরমে পৌঁছল তার বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই অনুভব করলুম, আজকের এই জাগরণটা যেন একটু অস্বাভাবিক, অন্যান্য দিনের মতো নয়। দেহটাকে বোঝার মতো ভারি মনে হচ্ছে না। আয়েসের সঙ্গে আরামের কোলে গা ঢেলে দিয়ে শুয়ে রইলাম আমি। এমন একটা মনোরম ক্লান্তি আমার দু' চোখের পাতায় জড়িয়ে আছে যার সঙ্গে আমার আগে কখনো পরিচয় ঘটেনি। সেই অনুভূতির আবেশটুকু এমন প্রগাঢ় ও প্রীতিপ্রদ

ছিল যে, স্বইচ্ছায় চোখ খুলতে চাইতুম না। শুয়ে শুয়ে সেই মনোরম মুহ্যমানতার স্বাদ গ্রহণ করতুম আমি। হঠাৎ একদিন মনে হ'ল, জীবন্ত মানুষ যেন আমারই আশেপাশে অস্বচ্ছ কণ্ঠে কথা বলছে! সে যে আমার কি আনন্দ আপনি হয়তো তা অনুমান করতে পারবেন না—রূঢ়ভাষী পুলিশের কথা ছাড়া গত এক বছরের মধ্যে অন্য কোনো লোকের কথা আমার কানে এসে পৌঁছয়নি। অতএব উল্লাসের প্রাচুর্যে অভিভূত হ'য়ে আমি নিজেই নিজেকে সম্বোধন ক'রে বলতে লাগলুম, 'স্বপ্ন দেখছ বন্ধু, নিছক স্বপ্ন! যাই ঘটুক না কেন, চোখ দুটি যেন খুলতে যেও না। চোখ খুললেই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় কষ্ট পাবে। দেখতে পাবে আবার সেই চেয়ার-টেবিল-বেসিন আর দেয়াল প্রভৃতি সনাতন ও অভিশপ্ত বস্তুগুলো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার চেয়ে স্বপ্ন দেখা ভালো—স্বপ্ন দেখে চলো, বন্ধু!'

"কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৌতূহল দমন ক'রে রাখা অসম্ভব হ'ল। ধীরে ধীরে অতি সাবধানে চোখ খুললুম আমি। অবাক কাণ্ড! দৈব ঘটনা! এ যে দেখছি অন্য একটা ঘরে আমি শুয়ে আছি—আমাব সেই হোটেলের পুরনো কারাকক্ষটার চেয়ে অনেক বড়। এখানকার ঘরে খোলা জানলা, তাই দিয়ে প্রচুর আলোবাতাস যাওয়া-আসা করছে। শুধু তাই নয়, জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে একাধিক গাছের সারি। তাদেরই সবুজ শাখাগুলি হাওয়া লেগে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। হোটেল-কক্ষেব সেইসব রুক্ষ কঠিন দেয়ালগুলো কোথায় গেল? এখানে দেখছি সবে-চুনকাম-করা দেয়ালের বুক মসৃণ। মাথার ওপরেও সাদা ধবধবে সুউচ্চ সিলিং। তারই তলায় আমি শুয়ে আছি এক নতুন বিছানায়। অতি সন্নিকট থেকে ভেসে আসছে মানুষের কণ্ঠস্বর। না, এ তো স্বপ্ন নয়!

"বিস্ময়ের ঘোরে আমি নিশ্চয়ই নিজের অজ্ঞাতসারে একটু নড়াচড়া ক'রে উঠেছিলুম। কাবণ, তক্ষুনি আমি শুনতে পেলাম পায়ের শব্দ—কে যেন এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ধীরে ধীরে হেঁটে এলেন একজন মহিলা, তাঁর মাথায় সাদা রঙের আচ্ছাদন—হয়তো নার্স, কিংবা সিস্টার হবেন তিনি। আমার সারা দেহে আনন্দের শিহরণ ব'য়ে গেল। গত এক বছরের মধ্যে কোনো নারীর চেহারা আমার চোখে পড়েনি। বিস্ময়বিমূঢ় দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে রইলাম সেই মনোলোভা মূর্তিটির দিকে। মনে হ'ল,

এ তো আগমন নয়, আবির্ভাব! তিনি নিশ্চয়ই আমার মধ্যে উত্তেজনার লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি মৃদু ভৎর্সনার সুরে ব'লে উঠলেন, 'চুপ ক'রে শুয়ে থাকুন, নড়াচড়া করবেন না।' তার সুরের রেশটুকু যেন প্রাণপণে কানের পর্দায় ধ'রে রাখতে চাইলুম আমি! দীর্ঘদিন পরে মানুষের কথা শুনলুম—তাহ'লে কি পৃথিবীতে এমন মানুষও আছে যে আমায় জেরা করে না? নির্যাতন করে না? সর্বোপরি আমার কাছে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ব'লে মনে হ'ল যে, বিছানায় শুয়ে আমি নারীকণ্ঠের মাধুর্যমণ্ডিত এবং আন্তরিকতাপূর্ণ স্বর শুনতে পাচ্ছি। বুভুক্ষুর মতো আমি চেয়ে রইলাম তাঁর মুখের দিকে। বৎসরকাল নরকবাসের পরে বিশ্বাস করতে পারছিলুম না যে, মানুষেব সঙ্গে মানুষ সত্যিই আন্তরিকভাবে কথা কইতে পারে। মহিলাটি আমার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন—হ্যাঁ, হাসলেনই তো। তাহ'লে মানুষের মুখ থেকে দেখছি সদয় হাসির বিলুপ্তি ঘটেনি! অতঃপর তিনি তাঁর ঠোঁটের ওপর আঙুল তুলে আমাকে শান্তভাবে শুয়ে থাকবার সংকেত ক'রে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। বুঝলুম, সংকেতটা তাঁর হুকুমেরই শামিল। আমি কিন্তু তাঁর হুকুম তামিল করতে পারলুম না। কারণ তখন পর্যন্ত এমন একটা অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে আমার কৌতূহল অপরিতৃপ্ত র'য়ে গেল। উঠে বসবার জন্য নিজের সঙ্গে আমি যেন যুদ্ধ করতে লাগলুম। উঠে বসতে না পারলে আমার দৃষ্টি ঐ অপস্রিয়মাণ পরমাশ্চর্য নারীমূর্তিটিকে অনুসরণ করতে পারত না। বিছানার কিনারার ওপর ভর দিয়ে আমি যখন বসতে গেলাম তখন দেখি আমি আর জোর পাচ্ছি না। আমার ডান হাতের কব্জি আর আঙুলের জায়গায় কি যেন একটা নতুন জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব করলুম। দেখলুম, বেশ বড় রকমের একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা রয়েছে। এর অর্থ কিছু বুঝতে না পেরে প্রথমটা হাঁদার মতো হাঁ ক'রে চেয়ে রইলুম সাদা কাপড় দিয়ে বাঁধা ঐ মস্ত বড় বস্তুটির দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বুঝতে পারলুম কোথায় আমি এসে পড়েছি এবং কি যে আমার হয়েছিল তাও আমি চিন্তা করতে লাগলুম। ওরা নিশ্চয়ই আমায় ভীষণভাবে আঘাত করেছিল, কিংবা আমি নিজেই হয়তো আমার নিজের হাতটিকে জখম ক'রে ফেলেছি। এটা যে একটা হাসপাতাল তাতে আর সন্দেহ নেই।

"দুপুরের দিকে ডাক্তার এলেন আমায় দেখতে। লোকটি বৃদ্ধ এবং

স্বভাবটি তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ। দেখলুম, আমাদের পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। সম্রাটের গৃহচিকিৎসক আমার সেই কাকার কথা এমন আন্তরিকতার সঙ্গে উল্লেখ করলেন যে, মনে হ'ল তিনি আমার প্রতিও সদয় ভাবাপন্ন। কথা প্রসঙ্গে নানারকমের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। তার মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের প্রশ্ন শুনে আমি আশ্চর্য না হ'য়ে পারলুম না। তিনি জানতে চাইলেন যে, আমি গণিতবেত্তা, না রসায়ন-বিজ্ঞানী। বললুম, কোনোটাই না।

"আমার উত্তর শুনে তিনি ব'লে উঠলেন, 'আশ্চর্য! জ্বরের ঘোরে তুমি সব অদ্ভুত ধরনের ফর্মুলা আওড়ে যাচ্ছিলে—গণিতের সূত্রের মতো শোনাচ্ছিল। আমরা তার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারতুম না।'

"আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম, আমার হয়েছে কি? তিনি বিচিত্র ভঙ্গীতে মৃদুভাবে হেসে উঠলেন।

"'মারাত্মক কিছু নয় উগ্র স্নায়বিক দুর্বলতা মাত্র।' তারপর চারদিকটা ভালো ক'রে দেখে নিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'তোমার উত্তেজনার কারণ অবিশ্যি সহজেই বুঝতে পারছি। দাঁড়াও ভেবে দেখি—সেদিনটা মার্চ মাসের তেরো তারিখ ছিল, তাই না?'

"মাথা নেড়ে স্বীকৃতি জানালুম আমি।

"'আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। ঐ ধরনের ব্যবস্থার ফলে শুধু তোমারই ক্ষতি হয়নি—যাক, যাক, ঘাবড়াবার কিছু নেই।' তার সহানুভূতি মাখানো হাসি দেখে আর সান্ত্বনার কথা শুনে নিঃসন্দেহ হলুম যে, আমি নিরাপদ আশ্রয়ে এসে স্থান পেয়েছি।

"দু'দিন পরে ডাক্তারসাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে ঘটনাটা বললেন আমায়। ওয়ার্ডারটা নাকি হঠাৎ আমার ঘর থেকে তীক্ষ্ণ চীৎকারের আওয়াজ শুনতে পায়। প্রথমে সে ভেবেছিল যে, আমার ঘরের মধ্যে হয়তো অন্য কেউ ঢুকে পড়েছে এবং সেইজন্য আমি তাকে বকাবকি করছি। কিন্তু যখন সে আমার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল তখন নাকি আমি তার দিকে ছুটে গিয়ে ব'লে উঠলুম, 'শয়তান, কাপুরুষ, তোমরা কি কোনো ব্যবস্থাই করবে না?' এবার তার টুঁটি চেপে ধরলুম আমি এবং শেষ পর্যন্ত এমন সাংঘাতিকভাবে আক্রমণ ক'রে বসলুম যে, পাহারাওয়ালাটা চেঁচামেচি

ক'রে লোক ডাকতে লাগল। তারপর ওরা আমায় টানতে টানতে যখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাচ্ছিল তখন আমি রাগে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওদের হাত থেকে ছুটে গিয়ে করিডোরের জানলাটাকে ধ'রে রাখবার জন্য এমনভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম যে, হাত কেটে রক্ত পড়তে লাগল আমার। এই দেখুন না, এখনো সেই ক্ষতের চিহ্নটা রয়েছে। হাসপাতালে প্রথম ক'দিন বিকারগ্রস্ত হ'য়ে রইলুম। তারপর ডাক্তারসাহেব বুঝতে পারলেন যে, আমার বোধশক্তির কোনো ক্ষতি হয়নি, সব ঠিকই আছে। তিনি বললেন, 'ওপর-ওয়ালার কাছে তোমার সেরে ওঠার খবর আমি জানাব না। বুঝতে পারছ তো, খবর পেলে ওরা আবার তোমায় সেই বন্দীকক্ষে নিয়ে আটকে রাখবে। কোনো ভয় নেই, তোমার যাতে ভালো হয় তার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আমার ওপর নির্ভর করতে পারো তুমি।'

"এই দয়ালু ডাক্তারটি আমার লাঞ্ছনাকারীদের কাছে গিয়ে আমার সম্বন্ধে কি যে বলেছিলেন তা আমি জানি না। জানবার দরকার বোধও করিনি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল আমাকে মুক্ত করবার। সেই উদ্দেশ্য তাঁর সফল হ'ল। আমি মুক্তি পেলুম। হয়তো আমায় তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে নির্দোষী এবং নেহাত বাজে ধরনের মানুষ ব'লে প্রতিপন্ন করেছিলেন—কিংবা এমনও হ'তে পারে যে, হিটলারের বোহিমিয়া দখলের ফলে অষ্ট্রিয়ার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর কোনো সমস্যা রইল না এবং তদ্দরুন, গেস্টাপো পুলিশের কাছে আমার গুরুত্ব গেল লোপ পেয়ে। আমাকে শুধু এই মর্মে একটা মুচলেকা দিতে হ'ল যে, এক পক্ষ কালের মধ্যে দেশ ছেড়ে চ'লে যেতে হবে আমায়। এই পনেরোটা দিন কাটল আমার নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে। মিলিটারি সার্টিফিকেট, পুলিশ সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, ভিসা, স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট প্রভৃতি যোগাড় করতে গিয়ে এত সব ঝামেলার মধ্যে ডুবে গেলুম যে, অতীতের কথা ভাববার মতো অবকাশ আমার রইল না। প্রত্যক্ষত এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, মস্তিষ্কের কোনো একটা গোপন নিয়ন্ত্রণ-যন্ত্রের দ্বারা মানুষের মননশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। যখনই কোনো মনের অশান্তিমূলক ও বিপজ্জনক অবস্থা এসে উপস্থিত হয় তখনই সেই যন্ত্রটি নিজে থেকে সক্রিয় হ'য়ে ওঠে এবং মনটাকে সরিয়ে নিয়ে যায় অন্যত্র। কারণ, আমি দেখতুম, যতবারই আমি আমার কারাজীবনের কথা ভাববার চেষ্টা করছি ততবারই মনটা

স'রে যাচ্ছে সেই অশান্তিমূলক অতীত স্মৃতির এলাকা থেকে। বহু সপ্তাহ পরে—সত্যি কথা বলতে কি, এই জাহাজে উঠে কারাজীবনের অভিজ্ঞতার কথা ভাববার মতো সামর্থ্য ও সাহস আমি ফিরে পেলুম।

"আপনার বন্ধুদের প্রতি যে অশিষ্ট এবং অদ্ভুত ব্যবহার আমি করেছি, আশা করি এইবারে তার কারণ আপনি বুঝতে পেরেছেন। নেহাত দৈব-ক্রমেই ধূমপানের ঘরটির ভেতর দিয়ে আমি হাঁটতে বেরিয়েছিলুম এবং আপনার বন্ধুরা যে দাবা খেলতে বসেছেন তাও দেখলুম দৈবক্রমেই। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলুম পা দুটো আমার মেঝের ওপর আটকে গেল— নড়বার আর ক্ষমতা নেই। বিস্ময়াবিষ্ট হ'য়ে গেলুম, আবার আতঙ্কের হাত থেকেও রক্ষা পেলুম না। কারণটা অনুমান করা কঠিন নয়। সত্যিকারের ছকের সামনে ব'সে দু'জন রক্তমাংসের মানুষ আসল ঘুঁটি নিয়ে যে দাবা খেলতে পারেন তেমন বাস্তব-প্রত্যয় মন থেকে মুছে গিয়েছিল আমার। ব্যাপারটা বুঝে উঠতে কয়েক মিনিট সময় লাগল। তারপর মনে পড়ল বন্দী অবস্থায় যে খেলা আমি নিজের বিরুদ্ধে নিজে খেলে এসেছি এতকাল এঁরা দু'জনে ব'সে সেই খেলাই খেলছেন। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি তাকিয়ে ছিলুম আপনাদের ঐ সত্যিকারের ছকটির দিকে। অবাক কাণ্ড! আমার মনোবাজ্যের সেই ঘুঁটিগুলি—রাজা, মন্ত্রী, হাতী, ঘোড়া, নৌকো, বড়ে! দেখলুম, তারা আর কাল্পনিক নয়, কাঠের তৈরি সত্যিকারের ঘুঁটি। খেলার বাস্তবতার মধ্যে প্রবেশ করতে হ'লে তো ঘুঁটিগুলোকে সচল করা চাই। যেসব ঘুঁটি এতকাল সংখ্যা ও সংকেতের রাজ্যে শুধু বিদেহীর মতো বিচরণ করেছে তাদের এবার চলমান বাস্তবে পরিণত করতে হবে। দু'জন জীবন্ত খেলোয়াড়ের মধ্যে সত্যিকারের প্রতিযোগিতা দেখবার কৌতূহল ক্রমশই অদম্য হ'য়ে উঠতে লাগল আমার। তারপর অবিশ্যি আপনারা তো দেখলেনই যে, আপনাদের খেলার মধ্যে অত্যন্ত অভদ্রের মতো হস্তক্ষেপ ক'রে বসলুম। কিন্তু আপনার বন্ধুটি যখন একটা ভুল চাল দিলেন সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলুম, কে যেন আমায় ছুরিকাঘাত করল। বিশ্বাস করুন, সহজাত প্রবৃত্তির বশেই তাঁকে নিরস্ত করলুম, চালটা রুখে দিলুম আমি। ছোট্ট ছেলেকে সিঁড়ির রেলিং-এর ধারে ঝুঁকে দাঁড়াতে দেখলে যেমন অজ্ঞাতসারেই হাতটা এগিয়ে যায় তাকে ধ'রে ফেলবার জন্য, এও ঠিক তেমনি—ভুল চালটা বন্ধ করবার

জন্ম এক মুহূর্তও দ্বিধা করলুম না। পরে অবিশ্যি বুঝতে পেরেছিলুম যে, আমার এই অনধিকার হস্তক্ষেপ অশোভন হয়েছে।"

আমি তাড়াতাড়ি ডাক্তার বি-কে বললুম যে, তার এই অযাচিত হস্তক্ষেপের জন্ম আমরা খুবই খুশি হয়েছি। কারণ, সেই সূত্রেই তো তার সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের সুযোগ ঘটল। তা ছাড়া তার গোপন কাহিনী শোনবার পর আগামী কল্যের প্রতিযোগিতায় তাকে খেলতে দেখবার কৌতূহল যে আমার দ্বিগুণ পরিমাণে বর্ধিত হয়েছে তেমন কথাও বললুম তাকে।

ডাক্তার বি আবার বলতে লাগল, "কিন্তু আমার কাছ থেকে খুব বেশি কিছু আশা করবেন না আপনারা। স্বাভাবিকভাবে সত্যিকারের ছক সামনে নিয়ে জীবন্ত একজন প্রতিপক্ষের সঙ্গে খেলতে পারব কিনা এটা হবে তারই পরীক্ষা। আমি হয়তো কয়েক শো, কিংবা কয়েক হাজার বাজি খেলেছি, কিন্তু সেগুলো যে নিয়মমাফিক খেলা, অথবা বিকারগ্রস্ত মনের দুঃস্বপ্ন ছিল না সে সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আজ বড় কম নয়। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, এই ধরনের মনে মনে খেলার মধ্যে আইনকানুন মেনে চলা যায় না—অনেক সময় অন্তর্বর্তী দু একটা ধাপ ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে চাল দিয়ে ফেলতে হয়। দিগ্বিজয়ী একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে সমানে সমানে আমি পাল্লা দেব, কিংবা তাঁর বিরুদ্ধে পাল্টা চাল দিয়ে তাকে জব্দ করে দেব এমন আশা আপনারা অবশ্যই করবেন না। খেলতে আমার আগ্রহ হচ্ছে শুধু এইজন্য যে, আমি দেখতে চাই কারাকক্ষে ব'সে এতদিন যা করে এসেছি সত্যি সত্যি তা দাবা খেলা, না পাগলামি। এ ছাড়া আমার আর অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।"

ঠিক এই সময় নৈশ-ভোজের ঘণ্টা পড়ল শুনতে পেলুম আমরা। তাহ'লে ডাক্তার বি-র সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলছে প্রায় দু' ঘণ্টা ধরে। তাকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে চ'লে এলুম ওখান থেকে। ডেকের পথটা পার হয়ে যাওয়ার আগেই দেখি ডাক্তার বি এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই। তোতলাতে তোতলাতে সে বলতে লাগল, "আর একটা কথা আছে। দয়া ক'রে আপনি আপনার বন্ধুদের জানিয়ে দেবেন যে, আমি এক বাজির বেশি খেলব না। কথাটা আগেই

ব'লে রাখলুম, নইলে পরে হয়তো ভাবতে পারেন যে, আমার ব্যবহারটা অশোভন হ'ল। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, পুরনো হিসেবের জের টানতে চাই না আমি—হিসেব শেষ করতে চাই। নতুন কোনো হিসেবের পত্তন করা আমার অভিপ্রায় নয়। যে খেলার কথা ভাবতে গেলে ভয়ে আমার গা শিউরে ওঠে তার নেশার মধ্যে আমি আর দ্বিতীয়বার ডুবে যেতে চাইনে। তা ছাড়া এ সম্বন্ধে ডাক্তার আমায় বার বার সাবধান ক'রে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি একবার দাবা-বাতিকে আক্রান্ত হয়েছে তার বিপদ কখনো কাটে না। দাবার বিষ বড় সাংঘাতিক জিনিস! একবার সংক্রামিত হ'য়ে পড়লে আরোগ্যলাভ করা কঠিন। আরোগ্যলাভ করলেও তার উচিত দাবার ছক থেকে দূরে দূরে থাকা। তাহ'লে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন আমি শুধু একটা বাজি খেলতে চাইছি—এ খেলাটা কেবল নিজের জন্য—পরীক্ষা ক'রে দেখা যে, সত্যিকারের ছকের সামনে ব'সে খেলতে পারি কিনা। এ ছাড়া দ্বিতীয় উদ্দেশ্য কিছু নেই।"

পরের দিন ঠিক তিনটের সময় আমরা এসে উপস্থিত হলুম ধূমপানের ঘরটিতে। আরও দু'জন দাবা-প্রেমিক এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। দলটি আমাদের আরও একটু ভারি হ'ল। তাঁরা দু'জনেই জাহাজের অফিসার। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এসেছেন প্রতিযোগিতা দেখবার জন্য। জেন্টোভিকও সেদিন যথাসময়ে এসে হাজির হ'ল। রং বেছে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খেলা শুরু হ'য়ে গেল। দিগ্বিজয়ী খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে খেলতে বসল এমন একজন লোক যার পরিচয় কিছু জানা ছিল না—একেবারে নামগোত্রহীন, অজ্ঞাত বললেও অত্যুক্তি করা হবে না।

খেলা চলল এমন একটা উঁচু পর্যায়ে যে, আমাদের মতো আনাড়িদের কাছে তার কায়দা-কানুনের অর্থ কিছু বোধগম্য হ'ল না। পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া বিঠোফেন যখন সংগীত রচনা করতেন তখন যেমন অপটু সংগীতজ্ঞরা তার অর্থ বুঝতে পারত না, আমরাও তেমনি এদের দাবা খেলার অতি উচ্চ মার্গের কৌশলগুলি অনুসরণ করতে অপারগ হ'য়ে উঠলুম। পরের দিন অবিশ্যি আমরা সবাই মিলে কৌশলের টুকরোগুলো জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু তাতে ফল কিছু পাওয়া গেল না। হয়তো উৎসাহ ও উত্তেজনার বশে

আমরা খেলার দিকে যত না নজর দিয়েছি তার চেয়ে বেশি নজর দিয়েছি খেলোয়াড়দের দিকে। দু'জনের মধ্যে বিদ্যে ও বুদ্ধিগত যে পার্থক্য আছে ক্রমেই তা পরিস্ফুট হ'য়ে উঠতে লাগল উভয়ের খেলার ধারা ও ধরনের বিভিন্নতায়। বাঁধা-ধরা রুটিন মেনে চলাই জেন্টোভিকের চিরকালের অভ্যাস। তাই সে সারাক্ষণ ব'সে রইল অনড়-অচল পাথরের মূর্তির মতো—দৃষ্টি তার একান্তভাবে নিবদ্ধ হ'য়ে রইল ছকের ওপর। কোনো বিষয়ে সামান্য মাত্র চিন্তা করার চেষ্টা তার পক্ষে কায়িক শ্রম স্বীকার করার শামিল হ'য়ে উঠল। বিশেষ কোনো চিন্তার মধ্যে মনঃসংযোগ করতে হ'লে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে তার সজাগ ও সক্রিয় ক'রে তুলতে হয়। পক্ষান্তরে ডাক্তার বি-র দেহে অথবা মনে আড়ষ্টতার চিহ্নমাত্র নেই। খেয়ালী খেলোয়াড় বলতে যা বোঝায় সে বর্ণে বর্ণে ঠিক তাই। আনন্দ পায় ব'লেই খেলাটা তার কাছে আকর্ষণের সামগ্রী। খেলা যখন চলছে, তখনো সে অপরাজিত অবস্থায়, কখনো বা ব'সে সে আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রে চলেছে, চাল বুঝিয়ে দিচ্ছে—অন্যমনস্কভাবে সিগারেটও ধরাচ্ছে, এবং যখন তার নিজের চাল দেবার পালা আসছে তখনই শুধু মুহূর্তের জন্য ছকের ওপর দৃষ্টিপাত করছে সে। প্রতিবারই তাকে দেখে মনে হ'তে লাগল যে, প্রতিপক্ষের কাছ থেকে যে চাল সে আশা করেছিল, জেন্টোভিক ঠিক সেই চালই দিয়ে যাচ্ছে।

গোড়ার দিকের চালগুলো খুব তাড়াতাড়ির মুখে শেষ হ'ল। সপ্তম কি অষ্টম চালের সময় দেখলুম যে, খেলার মধ্যে একটা সুপরিকল্পিত আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের পদ্ধতি পরিস্ফুট হ'য়ে উঠছে। জেন্টোভিকের ভাবনার সময়কাল বাড়তে লাগল। আমরা ধারণা ক'রে নিলাম যে, জয়লাভের জন্য এবার সত্যিকারের যুদ্ধ শুরু হ'ল। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, খেলা যত জমে উঠতে লাগল, তার গতিপ্রকৃতির জটিলতাও বাড়তে লাগল তত বেশি—আমাদের মতো আনাড়ি দর্শকরা তাতে হতাশ হ'য়ে পড়লেন। আমরা বুঝতে পারলুম না, দু'জন প্রতিযোগীর মধ্যে কে যে কি উদ্দেশ্যে চাল দিচ্ছে . অথবা কার অবস্থা যে অন্যের চেয়ে সুবিধাজনক তারও হদিস পেলুম না আমরা। শুধুমাত্র লক্ষ্য করছি যে, শত্রুপক্ষের সৈন্যরেখা ভেদ করবার জন্য কিছু সংখ্যক ঘুঁটি এগিয়ে চলেছে। ওস্তাদ খেলোয়াড় দু'জন কয়েকটা চালের কথা আগাম ভেবে নিয়ে চাল দিতে লাগল এবং প্রত্যেকটা চালের পেছনে

নির্দিষ্ট পরিকল্পনার জটিলতা থাকায় ঘুঁটিগুলির এগনো-পিছনোর রণকৌশল-নীতি আমাদের বোধগম্য হ'ল না।

আমরা হাঁপিয়ে উঠলুম। কারণ, জেণ্টোভিক প্রতিটি চাল দেওয়ার আগে সময় নিচ্ছিল অত্যন্ত বেশি। শেষ পর্যন্ত আমাদের বন্ধুটির হাবভাবের মধ্যেও বিরক্তির লক্ষণ ফুটে উঠল। আমি লক্ষ্য করলুম, জেণ্টোভিক চাল দিতে যত বেশি দেরি করতে লাগল ডাক্তার বি-র অস্থিরতা বাড়তে লাগল তত বেশি। কখনো সে চেয়ারে ন'ড়ে-চ'ড়ে বসে, কখনো বা বিরতিহীন ধূমপান ক'রে চলে, আবার মাঝে মাঝে পেন্সিল দিয়ে কি যেন টুকেও রাখে কাগজে। ঢক্‌ঢক্‌ ক'রে গেলাসের পর গেলাস জল খেয়ে চলেছে ডাক্তার বি। এই বাহ্যিক লক্ষণগুলি থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হ'ল যে, তার মন জেণ্টোভিকের চেয়ে একশোগুণ দ্রুত গতিতে কাজ ক'রে যাচ্ছে। অনেক ভেবে-চিন্তে জেণ্টোভিক যখন চাল দেয় তখন আমাদের বন্ধুটি এমনভাবে হেসে ওঠে যেন ঐ চালটির কথা অনেক আগে থেকেই সে ভেবে রেখেছিল এবং তজ্জন্য নিজের পাল্টা চাল দিতে সে এক মিনিটও দেরি করে না।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে পরিস্থিতি গুরুতর হ'য়ে উঠল। চাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে জেণ্টোভিক এত বেশি সময় নিতে লাগল যে, ডাক্তার বি আর ক্রোধ সংবরণ করতে পারল না। ধৈর্য হারিয়ে ফেলল সে। কুঞ্চিত ঠোঁটের প্রান্তে অসহিষ্ণুতার লক্ষণ ফুটে উঠতে বিলম্ব হ'ল না। তা সত্ত্বেও জেণ্টোভিক পূর্ববৎ ধীর এবং স্থির ভাবেই চাল দিয়ে চলল। সময় সংক্ষেপের প্রচেষ্টা তার নেই। বরং ঘুঁটিগুলো যত বেশি ছক থেকে উধাও হ'তে লাগল তার চিন্তার মেয়াদ বেড়ে যেতে লাগল আগের চেয়েও বেশি। বিয়াল্লিশটা চাল দিতে প্রায় দেড় ঘণ্টা সময় লেগেছে। আমাদের মানসিক অবস্থা তখন এমন সংকট-সম্মুখীন যে, আমরা সবাই অন্যমনস্ক হ'য়ে চুপচাপ ব'সে রইলুম—খেলার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। জাহাজের একজন কর্মচারী ইতিমধ্যে বিরক্ত হ'য়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছেন, অন্য একজন নিজের মনে বই প'ড়ে চলেছেন। খেলার দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করছেন যখন কেউ একজন চাল দেওয়া শেষ করল। তারপর সহসা জেণ্টোভিকের একটা চাল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা ঘ'টে গেল: যেই মুহূর্তে ডাক্তার বি বুঝতে পারল জেণ্টোভিক এবার তার 'গজ' চালতে উদ্যত হয়েছে তক্ষুনি সে বেড়ালের মতো

লাফ দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। আমরা দেখলুম, উত্তেজনায় সারা দেহটা তার কাঁপছে। জেণ্টোভিক যেই না তার চালটা শেষ করল, ডাক্তার বি অমনি তার 'নৌকো'টা দিল এগিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে বিজয়োল্লাসে চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল, "ব্যস, কেল্লা ফতে। সাবাড় হয়ে গেলেন উনি।" চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল ডাক্তার বি। বুকের ওপর হাত রেখে বিজয়ী বীরের মতো দৃপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল জেণ্টোভিকের দিকে।

যে চালের বিজয়-বার্তা এমন সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হ'ল তার তাৎপর্য উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্যে সাগ্রহে আমরা সবাই ছকের উপর ঝুঁকে পড়লাম। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হ'ল, ভয়ের কোনো কারণ ঘটেনি। তাহ'লে বোধহয় ভবিষ্যতের কোনো চালের কথা ভেবে আমাদের বন্ধুটি অমনিভাবে গর্জন ক'রে উঠেছিল। আমাদের মতো শৌখিন খেলোয়াড়দের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ-চালের তাৎপর্য ধরা পড়ছে না। শুধুমাত্র জেণ্টোভিক দেখলুম উল্লিখিত সদম্ভ উক্তিটি শোনবার পরেও বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। তার অচঞ্চল ভাবভঙ্গী দেখে বরং এমন কথাই আমাদের মনে হ'ল যে, ঐ অপমান-জনক ঘোষণাটি সে শুনতেই পায়নি। ফলে, আমরা সবাই যেন নিশ্বাস বন্ধ ক'রে পরবর্তী সংঘটনের জন্য আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম। সব নীরব নিস্তব্ধ। শুধু টেবিলের ওপরে যে ঘড়িটা রয়েছে তার টিকটিক আওয়াজ আমরা শুনতে পাচ্ছি। তিন মিনিট, সাত মিনিট, আট মিনিটও পার হ'য়ে গেল—জেণ্টোভিক তবু হাত নাড়ছে না। অনড় হ'য়ে ব'সে আছে। দারুণ উত্তেজনায় তার নাসারন্ধ্র দুটো সংকুচিত ও বিস্ফারিত হচ্ছে।

এই নীরব প্রতীক্ষা শুধু আমাদের কাছেই দুঃসহ ব'লে মনে হ'ল না। আমাদের বন্ধুটির কাছেও তা অসহনীয় হ'য়ে উঠল। চেয়ারটাকে ঠেলা মেরে পেছন দিকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। ঘরের মধ্যেই পায়চারি করতে লাগল। প্রথমে ধীরে ধীরে, তারপর চলার গতি দ্রুত হ'য়ে উঠল। সবাই তার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু আমার মতো উপদ্রুত আর কেউ নয়। আমি দেখছিলুম যে, সাংঘাতিক উত্তেজনা সত্ত্বেও তার পায়চারির দুই অংশের মধ্যবর্তী স্থানটুকু প্রতিবারই সমান—কখনই কম-বেশি হচ্ছে না। এই স্বল্প আয়তনটুকুর মধ্যে যেন প্রতিবারই সে কোনো একটা অদৃশ্য কাবার্ডের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে দুই অংশের মধ্যে পায়চারি ক'রে

যাচ্ছে। শিউরে উঠলুম আমি। এটা হয়তো তার কারাজীবনের একটা অভ্যাস। সেই অভ্যাসের অনিচ্ছাকৃত পুনরাবৃত্তি নয় তো? সেখানে হয়তো পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মতো ঠিক এমনিভাবেই ইতস্তত হেঁটে বেড়াতে হয়েছে। এত নির্যাতন ও লাঞ্ছনার পরেও তার মানসিক সংযম অক্ষুণ্ণ আছে ব'লে ধারণা হ'ল আমার। কারণ, মাঝে মাঝে ডাক্তার বি অধীরভাবে টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে দেখছিল যে, জেণ্টোভিকের চাল দেওয়া শেষ হয়েছে কিনা।

অতঃপর যা ঘটল তা সত্যিই সবারই ধারণাতীত। এতক্ষণ জেণ্টোভিকের হাতটা টেবিলের ওপর প'ড়ে ছিল অনড় অবস্থায়। এবার সেই ভারি হাতখানা ওপর দিকে ধীরে ধীরে তুলে ফেলল সে। এর পর কি ঘটবে তাই দেখবার জন্য আমরা প্রতীক্ষায় অধীর হ'য়ে উঠেছি। এমন সময় দেখলুম, চাল দিল না জেণ্টোভিক্, তার পরিবর্তে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠেলা মেরে ঘুঁটিগুলোকে ছক থেকে সরিয়ে দিল। জেণ্টোভিক যে আর খেলবে না সেই কথাটা বোধগম্য হ'তে আমাদের মিনিটখানিক সময় লাগল। মাত্ হওয়ার বিপর্যয়টা আমরা দেখতে পাওয়ার আগেই সে আত্মসমর্পণ করল। যা অসম্ভব তাই ঘটেছে. দিগ্বিজয়ী খেলোয়াড় একজন অজ্ঞাত লোকের কাছে পরাজয় বরণ করল—তাও এমন লোকের কাছে যে বিশ-পঁচিশ বছরের মধ্যে দাবার ছক হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখেনি। নামগোত্রহীন অপরিচিত বন্ধুটি আমাদের বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়টিকে সম্মুখযুদ্ধে সত্যিই হার মানিয়ে দিল।

উত্তেজনার বশে দর্শকরা সবাই এক এক ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। প্রত্যেকেই অনুভব করছেন যে, আভাসে ইঙ্গিতে কিংবা কোনো রকম কাজের মধ্য দিয়ে তাদের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করা উচিত। কেবলমাত্র জেণ্টোভিকই নিঃশব্দে চুপ ক'রে ব'সে রইল। খানিকক্ষণ পরে মুখ তুলল সে। বন্ধুটির দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আর এক বাজি খেলবেন কি?"

"আপত্তি কি—" জবাব দিল ডাক্তার বি। তার উৎসাহের আতিশয্যে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। মাত্র এক বাজি খেলবার শর্তে যে সে খেলতে রাজি হয়েছিল সেই কথাটা তাকে স্মরণ করিয়ে দেবার সময় পর্যন্ত পেলুম না। তার আগেই দেখি ডাক্তার বি চেয়ারে ব'সে প'ড়ে ক্ষিপ্র

হস্তে ছকের ওপর ঘুঁটিগুলি সাজাতে আরম্ভ করেছে। উত্তেজনার মাত্রাধিক্যে হাত কাঁপছিল তার। বড়েটা তাই হাত ফসকে মেঝের ওপর প'ড়ে গেল ছু' ত্ব'বার। তার এই অস্বাভাবিক অবস্থা দেখে অস্বস্তির বদলে আমার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হ'ল। পূর্বেকার শান্ত শিষ্ট লোকটি এখন স্পষ্টতই আন্দোলিত হ যে উঠেছে, উদ্দীপনায় অস্থির। ঠোঁট দুটো কুঁচকে উঠছে ঘন ঘন। জ্বরের তাপে দেহটাও যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ধীরে ধীরে চাপা গলায় বললুম আমি, "আর নয়, আজকের মতো যথেষ্ট হয়েছে। অত্যধিক পরিশ্রম হয়েছে আজ।"

উচ্চ হাস্যে সারা ঘরখানাকে উদ্বেলিত করে দিয়ে বিদ্বেষের সুরে জবাব দিল ডাক্তার বি, "পরিশ্রম! কি যে বলেন—ওঁর ঐ ঢিমে-তেতালা খেলার অবসরটুকুর মধ্যে আমি আরো সতেরো বাজি খেলতে পারতুম। আমার পক্ষে সত্যিকারের কষ্ট হচ্ছে থেমে থাকা--বলি হ্যাঁ মশাই, খেলা কি শুরু করবেন না?"

শেষের কথাগুলো জেণ্টোভিক-কে লক্ষ্য করে এমন দ্রুত বেগে ব'লে ফেলল ডাক্তার বি তাতে আমাদের মনে হ'ল, কণ্ঠস্বর তার আর স্বাভাবিক নেই, প্রায় রূঢ় হ'যে উঠেছে। জেণ্টোভিক কিন্তু বিচলিত বোধ করল না, বরং ধীর স্থির এবং শান্ত ভাবে তার দিকে একবার ফিরে চাইল। অবিশ্যি রোষ-কষায়িত কটাক্ষে তার কঠোরতার অভাব ছিল না। মুহূর্তের মধ্যে এক নতুন উপসর্গের উদ্ভব হ'ল। বিপজ্জনক উত্তেজনায় আর নিদারুণ বিদ্বেষপূর্ণ আবহাওয়ায় উভয়ের মন উঠল বিষিয়ে। এরা আর খেলোয়াড়ী মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি নয়—খেলার আমোদ উপভোগ করবার মতো মনের অবস্থাও গেল নষ্ট হ'যে। এখন শুধু দু'জন দু'জনের পরম শত্রু। যেন মরণ-খেলায় মেতে উঠল এরা। প্রথম চাল দেওয়ার আগে জেণ্টোভিক অনেকক্ষণ পর্যন্ত দ্বিধা করতে লাগল। আমার সন্দেহ হ'ল, এই দ্বিধার মূলে তার একটা গোপন উদ্দেশ্য আছে। এই পেশাদার ঝানু খেলোয়াড়টি ঠিক বুঝতে পেরেছে যে, প্রতিপক্ষকে উত্ত্যক্ত ও উত্তেজিত করবার প্রকৃষ্টতম পন্থাই হচ্ছে দীর্ঘসূত্রতা—দেরী ক'রে চাল দেওয়া। অত্যন্ত সাদাসিধে প্রথম চালটা চালতে তার চার মিনিট লাগল। তক্ষুনি পাল্টা চাল দিয়ে ফেলল আমাদের বন্ধুটি। তারপর আবার শুরু হ'ল জেণ্টোভিকের অন্তহীন দীর্ঘসূত্রতা, সেই

দুঃসহ বিলম্ব। এ যেন নিদারুণ বিদ্যুৎ চমকানোর পরে রুদ্ধ নিশ্বাসে বজ্রপাতের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকা—প্রতীক্ষার মেয়াদ বাড়ছে, অথচ মেঘ আর ডাকে না। জেণ্টোভিক পাথরের মতো অনড, অচল। নডন-চডনের চেষ্টা নেই—বিরতি শুধু বিলম্বিত হচ্ছে। এই বিলম্ব ইচ্ছাকৃত এবং বিদ্বেষ-প্রসূতও বটে। ডাক্তার বি-কে পর্যবেক্ষণ করবার মতো অবকাশের অভাব হ'ল না। আমি দেখলুম, এরই মধ্যে তিন গেলাস জল খাওয়া তার শেষ হ'ল। আমার মনে পডল, সে বলেছিল যে, কারাবাসের সময় তার পিপাসা হ'ত প্রচণ্ড। অস্বাভাবিক উত্তেজনার প্রতিটি লক্ষণই পরিস্ফুট হ'য়ে উঠতে লাগল। কপালটা ঘেমে উঠেছে, হাতের সেই ক্ষতচিহ্নটা শুধু স্পষ্টতর হয়নি, দগদগও করছে। তবুও এখন পর্যন্ত আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেনি সে। কিন্তু চতুর্থ চাল দেওয়ার পরে জেণ্টোভিক যখন আবার ভাবতে বসল তখন সে ধৈর্য হারিয়ে ক্রোধান্ধের মতো বলে উঠল, 'বলি মশাই, চাল কি আপনি দেবেন না?"

গুরুগম্ভীর ভঙ্গীতে মুখ তুলল জেণ্টোভিক। তারপর বলল, "যত দূর মনে পড়ে দশ মিনিটের মেয়াদ আমরা খেলার আগেই মেনে নিয়েছিলুম। সেই মেয়াদ হ্রাসের কোনো কারণ তো দেখছি না। তা ছাড়া, এটা আমার কাছে নীতি-বিরুদ্ধও বটে।"

ডাক্তার বি ঠোঁট কামডাতে লাগল। টেবিলের তলা দিয়ে লক্ষ্য করছিলুম তার জুতোর গোডালি অনবরত উঠছে আর নামছে। অস্থিরতা বাডছে। তার মধ্যে উন্মাদ হওয়ার পূর্ব-লক্ষণ দেখতে পেয়ে আমি এবার আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলুম। আমার পক্ষে আত্মসংবরণ করা কঠিন হয়ে দাঁডাল। অষ্টম চালের সময় ওদের মধ্যে দ্বিতীয় সংঘর্ষ বেধে উঠল। ডাক্তার বি নিজেকে আর সামলাতে পারল না। অতি বিলম্বে উত্ত্যক্ত হ'য়ে আত্মসংযম হারিয়ে ফেলল সে। চেয়ারে ব'সে এত বেশি অস্থির হ'য়ে উঠল যে, নিজের অজ্ঞাতসারেই তবলা বাজাবার মতো টেবিলের ওপর চাঁটি মেরে চলল। জেণ্টোভিক আবার মুখ তুলল এবং গম্ভীর সুরে বলল, "দয়া ক'রে টেবিল বাজাবেন না। আমার অসুবিধে হচ্ছে। ওরকম আওয়াজ করলে আমি খেলতে পারব না।"

ডাক্তার বি সহাস্যে ব'লে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।"

অপমানিত বোধ করল জেণ্টোভিক। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, "কি বলতে চান মশাই?"

"না, কি আর বলব বলুন—আসল কথা কি জানেন, আপনি ভয় পেয়ে গেছেন।" ডাক্তার বি হেসে উঠল—বিদ্বেষপূর্ণ হাসি।

জবাব দিল না জেণ্টোভিক। সাত মিনিট পার হ'য়ে গেল পরের চালটা দিতে। ক্রমশই সে পাথরের মতো কঠিন হ'য়ে যেতে লাগল। এর পর দশ মিনিট পার না হ'লে চালই দেয় না সে। মধ্যবর্তী সময়টাতে বন্ধুটির আচরণ অত্যন্ত বিচিত্র ঠেকতে লাগল আমাদের চোখে। মনে হ'ল খেলার সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই, মন প'ড়ে আছে অন্য জায়গায়। পায়চারি করাও বন্ধ ক'রে দিল। চেয়ারে ব'সে রইল অনড় হ'য়ে। পাগলের মতো অর্থহীন ও অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে শূন্যতার দিকে। বিড়বিড় ক'রে ব'কে চলেছে দুর্বোধ্য প্রলাপ। এত বেশি অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল যে, জেণ্টোভিকের চাল দেওয়ার পর তাকে প্রতিবারই তার নিজের চালের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। আমার সন্দেহ হ'ল, মনে মনে সে হয়তো খেলার কোনো নতুন কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, ক্রীড়া-পদ্ধতির নানারকম হিসেবের মধ্যে ডুবে রয়েছে সে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জেণ্টোভিক এবং আমাদের কথা তার মনে নেই আর। সত্যিই কি উন্মাদ হ'য়ে গেল? বাহ্যিক লক্ষণগুলি হয়তো যে-কোনো মুহূর্তে প্রচণ্ডভাবে প্রকাশ হ'য়ে পড়বে। সত্যি সত্যি সেই চরম সংকট-মুহূর্তটা এসে উপস্থিত হ'ল উনিশ চালের সময়। যেই জেণ্টোভিক একটা চাল দিল, সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বি ছকের দিকে মনোযোগ না দিয়েই তার গজটাকে দিল তিন ঘর এগিয়ে। সকলকে সচকিত ক'রে দিয়ে চীৎকার ক'রে উঠল, "মশাই আপনার রাজা সামলান—কিস্তি দিচ্ছি!"

অদ্ভুত ধরনের চাল দেখবার জন্য আমরা সবাই ঝুঁকে পড়েছিলুম ছকের ওপর। মিনিটখানিক পরে একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘ'টে গেল। অত্যন্ত ধীরে ধীরে ওপর দিকে মুখ তুলে জেণ্টোভিক এক এক ক'রে আমাদের সবাইকে দেখতে লাগল। এর আগে কখনো এমন ব্যাপার আমরা দেখিনি। মনে হ'ল, কি যেন একটা আনন্দের উপকরণ খুঁজে পেয়েছে ওস্তাদ। ক্রমে ক্রমে তার মুখে ফুটে উঠল পরিতুষ্টি এবং উপেক্ষার হাসি। আমরা কিন্তু

কিছুই বুঝতে পারলুম না, তবুও জেণ্টোভিক যেন জয়লাভ করার স্বাদ পেল পরিপূর্ণ মাত্রায় এবং নকল শ্রদ্ধার ভাব দেখিয়ে আমাদের সম্বোধন ক'রে বলল, "আপনাদের মধ্যে কেউ একজন হয়তো দেখছেন যে, আমার রাজা সামলানো দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি নিজে তেমন দরকার কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"

আমরা একবার ছকের দিকে দৃষ্টিপাত করলুম এবং তারপর অস্বস্তিকর মনোভাব নিয়ে ডাক্তার বি-কেও দেখলুম। অর্থ কিছু বোধগম্য হ'ল না। কারণ, জেণ্টোভিকের রাজাকে আগলে দাঁড়িয়ে আছে তার বড়ে। ডাক্তার বি-র গজ তাকে আক্রমণ করবে কি ক'রে? অতএব রাজার যে সমূহ কোনো আশঙ্কা নেই তেমন ব্যাপারটা বাচ্চা ছেলেরাও বুঝতে পারে। আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলুম। আমাদের বন্ধুটি উত্তেজনার ঝোঁকে ঘুঁটিটাকে এক ঘর বেশি এগিয়ে দেয়নি তো? নীরবতা ভঙ্গ হ'ল তার। জড়িত কণ্ঠে বলতে লাগল সে, "রাজার তো এ ঘরে থাকবার কথা নয়! ভুল—সব ভুল। আপনার চালও ভুল। আগাগোড়া সব ভুল, ঘুঁটি সব ওলটপালট হ'য়ে গেছে· বড়েটা তো ঐ ঘরে থাকবে·· এ কোন্ খেলা? এ তো নতুন একটা খেলা দেখছি ··"

হঠাৎ থেমে গেল ডাক্তার বি। আমি তার হাতটা এত জোরে চেপে ধরলুম যে, বিভ্রান্তি সত্ত্বেও সে আমার হাতের চাপ সহজেই অনুভব করল। তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কি মশাই, কি বলছেন আপনি?" তার হাতের ক্ষতচিহ্নটার ওপর হাত বুলিয়ে আমি শুধু বললুম, "মনে রাখবেন!" আমার ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে পেরে ডাক্তার বি যন্ত্রচালিতের মতো দৃষ্টি ফেরাল ঐ গাঢ় লাল রঙের কাটা দাগটার দিকে। সহসা তার সারা দেহটা থরথর ক'রে কাঁপতে লাগল। বিবর্ণ ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল এই ক'টি কথা, "সত্যি ক'রে বলুন তো, আমি কি নির্বোধের মতো হাস্যকর কোনো কথা ব'লে ফেলেছি? এও কি সম্ভব আবার আমাকে পেয়ে বসল সেই ·· ·· ?" নিচু গলায় আমি জবাব দিলুম, "না, তা নয়। কিন্তু খেলা আপনাকে এক্ষুনি বন্ধ ক'রে দিতে হবে, অনেকক্ষণ খেলেছেন। ডাক্তার আপনাকে কি উপদেশ দিয়েছিলেন সেই কথা মনে করুন।"

ডাক্তার বি এক ঝাঁকুনি দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "নিতান্ত নির্বোধের মতো ভুল ক'রে বসেছি। আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন।" তারপর জেণ্টোভিকের দিকে ঝুঁকে দাঁড়াল এবং আগের মতো বিনীত কণ্ঠে বলতে লাগল, "আমি যা এতক্ষণ বলেছি সবই অর্থহীন, বাজে। বলাই বাহুল্য যে, বাজি জিতেছেন আপনি।" অতঃপর আমাদের দিকে ঘুরে বলল সে, "আপনাদের কাছেও মাপ চাইছি, মশাই। আগেই তো আপনাদের আমি সতর্ক করেছিলুম আমার কাছ থেকে বিশেষ কিছু আশা করবেন না। এই বিশ্রী ব্যাপারের জন্য আবার আমি মার্জনা ভিক্ষা করছি। এর পরে জীবনে আর কখনো দাবার প্রলোভনে জড়িয়ে পড়ব না।"

প্রথম দিন যেমন বিনীত ও রহস্যজনক ভাবে এসে উপস্থিত হয়েছিল ডাক্তার বি আজও ঠিক তেমনিভাবেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে। কেন যে জীবনে আর দাবার ছক ছুঁয়ে দেখবে না সে, তার কারণটা শুধু আমিই জানতুম। অন্যান্য সবাই বিহ্বলের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। এঁরা ভাবলেন, কোনো একটা অপ্রীতিকর এবং বিপজ্জনক ঘটনা ঘটতে যাচ্ছিল। হয়তো বা দৈবক্রমে সেই ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন সবাই। হতাশার সুরে ম্যাকআইভার ব'লে উঠলেন, "আচ্ছা আহাম্মক তো লোকটা।"

সবার শেষে জেণ্টোভিক মন্তব্য করল, "ভদ্রলোকের আক্রমণ-পরিকল্পনাটা নেহাত মন্দ ছিল না। শৌখিন খেলোয়াড় হিসেবে তার যে প্রচুর দক্ষতা আছে সে কথা স্বীকার করতেই হবে।"

পলাতক

উনিশশো আঠারো খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে রাত্রিবেলা একজন জেলে জেনিভা হ্রদ দিয়ে নৌকো বেয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক দৃশ্য তার নজরে পড়ল। জায়গাটা ছিল ভিলেভুয়্ নামে ছোট্ট একটা শহরের কাছাকাছি। জেলেটি দেখতে পেল জলের ওপর কি যেন একটা ভাসছে। কাছে এগিয়ে গেল সে। কতকগুলো কাঠের টুকরোকে কোনোরকমে একসঙ্গে বেঁধে একটা ভেলা তৈরি করা হয়েছে। একজন উলঙ্গ লোক একখণ্ড কাঠের সাহায্যে আনাড়ির মতো বৈঠা বেয়ে সেই ভেলাটাকে সামনের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। পরিশ্রমে আর ঠাণ্ডায় লোকটি যে কাতর হয়ে পড়েছে তাতে আর সন্দেহ ছিল না। বিস্ময়াভিভূত জেলের মনে করুণার উদ্রেক হ'ল। লোকটিকে নিজের নৌকোয় তুলে নিল সে। পরবার মতো জামাকাপড় কিছুই ছিল না। একমাত্র জাল ছাড়া নৌকোয় আর কিছু থাকবার কথাও নয়। শীতে লোকটি ঠকঠক ক'রে কাঁপছিল। গায়ে জড়াবার জন্যে জালটাই দিয়ে দিল জেলে। তারপর আগন্তুকের সঙ্গে কথা-বার্তা চালু করবার চেষ্টা করল সে। কিন্তু অপরিচিত লোকটি এমন এক ভাষায় প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল যার একটি কথাও বুঝতে পারল না জেলে। অতঃপর ব্যর্থমনোরথ হয়ে সে ধীরে ধীরে নৌকো বেয়ে চ'লে যেতে লাগল ডাঙার দিকে।

ভোর হয়ে আসছিল। দিগন্তের আলোয় হ্রদের তীর চোখের ওপর ভেসে উঠতেই উলঙ্গ লোকটি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। দাড়িগোঁফ-আচ্ছাদিত মুখের ওপর ফুটে বেরুল হাসির রেখা। উপকূলের দিকে আঙুল তুলে সহর্ষে এবং প্রশ্ন করার ভঙ্গীতে বার বার শুধু একটা কথাই বলতে লাগল সে যার আওয়াজ শুনে মনে হল কথাটা হচ্ছে "রোসিয়া।" ডাঙা যত এগিয়ে আসছে লোকটির আনন্দ বাড়ছে তত বেশি। সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাসও ফিরে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তীরে পৌছে নোঙর ফেলল জেলে। মেয়েরা ছুটে এল জাল থেকে মাছ তুলবার জন্যে। এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর আর্তনাদ করতে করতে পালিয়ে গেল ওখান থেকে। এ

যেন সেই প্রাচীন কালের উলঙ্গ ইউলিসিস্‌কে দেখে নসিকার মেয়েদের পালিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা !

হ্রদের জল থেকে কি এক অদ্ভুত জিনিস ধ'রে এনেছে জেনে তাই দেখবার জন্যে গাঁয়ের লোকেরা ছুটে এল সেখানে। ভিড় জমল। ভিড়ের মধ্যে মেয়রকেও দেখা গেল। জায়গাটা ছোট্ট হ'লে কি হবে মেয়রসাহেবের মধ্যে 'হাম-বড়া' ভাব ছিল প্রবল। মনে মনে তিনি যুদ্ধকালীন নিয়মকানুনের কথা ভাবতে লাগলেন। তারপর তার আর সন্দেহ রইল না যে, লোকটি নিশ্চয়ই জেনিভা হ্রদের ওপার থেকে ফরাসী সেনাবাহিনী পরিত্যাগ ক'রে পালিয়ে এসেছে। অতএব তৎক্ষণাৎ সরকারী তদন্তের ব্যবস্থা করা দরকার। করবার চেষ্টাও করলেন। কিন্তু চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হ'ল। কেউ কারও কথা বুঝতে পারল না। ইতিমধ্যে গ্রামবাসীদের একজন একটা ছেঁড়া কোট আর একটা ছেঁড়া প্যান্ট যোগাড় ক'রে নিয়ে এসে দিয়ে দিল লোকটিকে। মেয়রসাহেব তাকে যতরকমের প্রশ্নই করতে লাগলেন তার উত্তরে সে শুধু বলতে লাগল, "পোসিয়া ? পোসিয়া ?" নিজের ব্যর্থতায় মেয়রসাহেব বিরক্ত বোধ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি আদালতের দিকে হাঁটতে লাগলেন। পথে ছেলেছোকরার দল জুটে গেল। লোকটির পায়ে জুতো নেই—গায়ের জামাকাপড়ও ঢিলেঢালা, তাই দেখে এরা মজা লুটতে লাগল খুব। আদালতে পৌঁছে পলাতককে সরকারী জিম্মায় রেখে দেওয়া হ'ল। বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করল না সে, একটি কথাও আর বলল না। শুধু তার মুখের ওপর পুনরায় বিষাদের ছায়া পড়ল। সন্ত্রস্ত হ'য়ে রইল যেন কেউ বুঝি তাকে ঘুসি মারবে।

জেনিভা হ্রদ থেকে জেলে যে কি এক অদ্ভুত জিনিস ধ'রে এনেছে সেই খবরটা ছড়িয়ে পড়েছিল আশপাশের হোটেলেও। সেখান থেকে বড়লোকেরা সব দল বেঁধে মজা দেখতে এলেন। ঘণ্টাখানিকের অবসর বিনোদনের সুযোগ পেলেন এঁরা। একজন মহিলা তো তাকে কেক-বিস্কুট দিতে চাইলেন। বাঁদরের মতো সন্দেহাকুলভাবে লোকটি হাত সরিয়ে নিল, কেক-বিস্কুট স্পর্শ করল না। ভিড়ের মধ্য থেকে কে একজন তার ছবিও তুলে ফেলল একটা। এমন একটি অদ্ভুত জীবকে ঘিরে জনতার মধ্যে আমোদের হুল্লোড় প'ড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত একটা মস্ত বড় হোটেলের ম্যানেজার সাহেব এসে উপস্থিত হলেন আদালতে। বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন ব'লে তাঁর খুব সুনাম ছিল। তা

ছাড়া তিনি একজন সুবিখ্যাত ভাষাবিদও ছিলেন। অপরিচিত লোকটির সঙ্গে তিনি জার্মান, ইতালিয়ান এবং ইংরেজী ভাষায় আলাপ করবার চেষ্টা করলেন। কাজ হ'ল না। শেষ পর্যন্ত তিনি যখন রুশ ভাষায় কথা বললেন তখন তার সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। তৎক্ষণাৎ সে তার ব্যক্তিগত ইতিহাস বর্ণনায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠল। ইতিহাস দীর্ঘ এবং জটিলও বটে। দো-ভাষীর কাছে অনেক কথাই বোধগম্য হ'ল না। মোটামুটিভাবে গল্পটা হচ্ছে যে, রুশ সেনাবাহিনীর হ'য়ে সে যুদ্ধ করেছিল। একদিন হাজার হাজার সৈনিকদের সঙ্গে তাকেও রেলগাড়িতে উঠিয়ে দেওয়া হয়। গাড়িতে চেপে তারা বহু দূরের পথ অতিক্রম ক'রে আসে। তারপর গাড়ি থেকে নেমে জাহাজে উঠে পড়ে। সমুদ্রের পথও বড কম নয়। আগের চেয়েও দীর্ঘতর। মাঝখানে ভীষণ গরম পড়েছিল। কষ্ট পেয়েছে খুব। গায়ের হাড়-মাংস প্রায় পুড়ে যাওয়ার উপক্রম! শেষ পর্যন্ত জাহাজ থেকে নেমে আবার তাদের রেলগাড়িতে উঠতে হ'ল। গাড়ি থেকে নামবার পরেই শত্রু-অধিকৃত একটা পাহাড়ের প্রতি আক্রমণ চালাবার আদেশ পেল ওরা। পাহাড়টা দখল করতে হবে। কিন্তু এই আক্রমণ সম্বন্ধে লোকটির বিশেষ কিছু বলবার নেই। কারণ, শুরুতেই পায়ে তার গুলির আঘাত লাগায় আহত হ'য়ে পড়ে যায়।

দো-ভাষী হোটেল-ম্যানেজার খবরগুলো গল্পাকারে সাজাতে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে, সাইবেরিয়ার ওপর দিয়ে যেসব রুশ বাহিনীকে ভ্লাডিভোস্টক বন্দর থেকে ফরাসী দেশে পাঠানো হয়েছিল, এই পলাতকটি সেইসব বাহিনীরই একজন সৈনিক। গল্প শুনে সবার মনেই করুণার উদ্রেক হ'ল। কিন্তু কৌতূহলী জনতা জানতে চাইল, কেন সে এমন এক অদ্ভুত পথ ধ'রে হ্রদের জলে এসে ভাসতে লাগল।

রুশ সৈনিকটির মুখে হাসি ফুটে উঠল। হাসির মধ্যে শুধু সরলতা ছিল না, চাতুরীও ছিল। সে বলতে লাগল যে, হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরে আশপাশের লোকেদের কাছ থেকে রাশিয়ার অবস্থান যে কোন্ দিকে তা সে জেনে নেয়। তারপর যেদিন প্রথম সে হাঁটবার মতো একটু শক্তি পেল সেইদিনই সবার অজ্ঞাতসারে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়ল। পথে এসে সূর্য এবং নক্ষত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে দিক নির্ণয় করতে লাগল। রাত্রি-বেলাতেই সে পথ হাঁটত। পাহারাওয়ালাদের কাছে যেন ধরা না পড়ে

সেইজন্তে দিনের বেলা লুকিয়ে থাকত খড়ের গাদার পেছনে। খাবার জন্তে কিছু ফল সে যোগাড় ক'রে রেখেছিল, মাঝে মাঝে এর-ওর কাছে দু'এক টুকরো রুটিও ভিক্ষে চেয়ে নিয়েছে। শেষ পর্যন্ত দশ রাত্রি হাঁটবার পরে এই হ্রদের কাছে এসে পৌছয়। এর পরে গল্পটা এলোমেলো হ'য়ে যেতে লাগল। সাইবেরিয়ার একজন কৃষক ব'লে নিজের পরিচয় দিল লোকটি। বৈকাল হ্রদের কাছে তার বাড়ি। তাই সে জেনিভা হ্রদের কাছে এসে ভাবল, রাশিয়ায় পৌছে গেছে বুঝি। ইতিমধ্যে সে দুটো কড়িকাঠ চুরি ক'রে নিয়ে এল এবং নেমে পড়ল লেকের জলে। উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ল কড়িকাঠের ওপর এবং অন্য এক টুকরো কাঠের সাহায্যে বৈঠা বেয়ে সে যখন অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে তখন ঐ জেলে তাকে উদ্ধার ক'রে ডাঙায় এনে তুলল। গল্পটা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি প্রশ্ন করল, 'আমি কি আগামী কালের মধ্যে বাড়ি পৌছতে পারব ?"

যারা প্রথমে একে একজন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন বোকা লোক ব'লে ভেবেছিল তাদের কাছে যখন প্রশ্নটির মর্মার্থ অনুবাদের মাধ্যমে ব'লে দেওয়া হ'ল তখন তারা হাসতে হাসতে মারা যায় আর কি। অতঃপর তারা এই অসহায় পলাতকটির জন্য কিছু কিছু চাঁদা তুলে ফেলল নিজেদের মধ্য থেকেই।

মনট্রিয়েক্স শহরে টেলিফোন ক'রে একজন উচ্চস্থানীয় পুলিশ কর্মচারীকে খবর দেওয়া হ'য়েছিল। তিনি এসে এখন উপস্থিত হলেন। এবং অনেক চেষ্টার পর একটা সরকারী রিপোর্ট তিনি তৈরি ক'রে ফেললেন। হঠাৎ-পাওয়া দো-ভাষী তো হিমসিম খেয়ে গেল। তার ওপর সাইবেরিয়ার এই লোকটি এত বেশি অশিক্ষিত যে, স্থানীয় লোকেদের কাছে তার মনের কথা বোধগম্য হচ্ছিল না। নাম বলছে বোরিস, অথচ বংশের পদবি তার জানা নেই। সংসারে তার স্ত্রী এবং তিনটি সন্তান আছে। বৈকাল হ্রদের অনতি-দূরেই বাস করত সে। মস্ত ধনী মেট্রচাবস্কির 'দাস' ছিল ওরা। 'দাস' কথাটা ব্যবহার করছে বটে, কিন্তু রাশিয়া থেকে যে ক্রীতদাস প্রথা পঞ্চাশ বছর আগেই লোপ পেয়ে গেছে তেমন খবরটা এ জানে না।

নানারকমের আলোচনা শুরু হ'য়ে গেল। লোকটি মনঃক্ষুণ্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল জনতার মধ্যে। কেউ বলছে বের্নশহরে যে রুশ দেশের দূতাবাস আছে সেখানে একে পাঠিয়ে দেওয়া হোক—আবার অনেকেই আপত্তি করছে এই

ব'লে যে, ওখানে পাঠালে বেচারীকে পুনরায় ফরাসী দেশেই ফিরে যেতে হবে। পুলিশ কর্মচারীটি বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ সাধ্য নয়। কি সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি? সেনাবাহিনী থেকে পলাতক, না শুধু একজন বিদেশী? তাও তো সনাক্তকরণের মতো কোনো সরকারী কাগজপত্রও নেই সঙ্গে। অন্য একজন সরকারী কর্মচারী তক্ষুনি আপত্তি তুললেন এই ব'লে যে, স্থানীয় লোকদের খরচে পথভ্রষ্ট লোকটি খাদ্য এবং বাসস্থান দাবি করতে পারে না। একজন ফরাসী উত্তেজিত হ'য়ে আলোচনায় বাধা দিয়ে বললে যে, পলাতকটি সম্বন্ধে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। অত্যন্ত সাদা-সিধে ব্যাপার। হয় তাকে কোনোরকম কাজে লাগিয়ে দেওয়া হোক, নয়তো সীমান্তের ওধারে ফেরত পাঠানো হোক। দু'জন মহিলা প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন। তাঁরা বললেন যে, এই দুরবস্থার জন্য অসহায় লোকটিকে দায়ী করা যায় না। নিজের জন্মভূমি থেকে মানুষকে উৎপাটিত ক'রে পরের দেশে চালান দেওয়া বর্বরোচিত অপরাধ। অতঃপর রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক শুরু হওয়ার উপক্রম হ'ল। এমন সময় একজন ডেনমার্কের অধিবাসী সহসা প্রস্তাব ক'রে বসল যে, এক সপ্তাহের জন্য এই নবাগতকে আশ্রয় দিতে রাজী আছে সে। এবং ইত্যবসরে সরকারী কর্মচারীরা যেন রুশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগা-যোগ স্থাপন ক'রে সমস্যার সমাধান করেন। এমন একটা অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবের ফলে সরকারী কর্মচারীদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা গেল দূর হ'য়ে। এবং স্থানীয় লোকদের মধ্যে যে তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছিল তারও অবসান ঘটল।

কিন্তু তর্কবিতর্ক যখন চরমে উঠেছিল তখন এই পলাতকটি ভীরু দৃষ্টিতে সর্বক্ষণই চেয়ে ছিল হোটেলের ম্যানেজারটির মুখের দিকে। সে বুঝতে পেরেছিল যে, এই লোকটির দ্বারাই তার সত্যিকার উপকার সাধিত হবে। অন্যান্য যারা সবাই এসেছে তারা শুধু এসেছে ভিড় বাড়াবার জন্য। লেক পার হ'য়ে এখানে এসে উপস্থিত হওয়ার ফলে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তাও সে বুঝতে পারছিল। তর্কালোচনা থেমে যাওয়ার পর পলাতকটি হাত দুটো ম্যানেজারের মুখের দিকে তুলে ধরল। মেয়েরা যেমনভাবে দেবতার সামনে প্রার্থনা জানায় এও যেন ঠিক তেমনিভাবে ম্যানেজারের কাছে সনির্বন্ধ প্রার্থনা জানাতে লাগল। তার অবস্থা দেখে প্রত্যেকেরই মনে করুণার উদ্রেক হ'ল। ম্যানেজার তাকে অভয় দিয়ে বললেন যে, এখানে সে অবশ্যই কয়েকদিনের

জন্ম আশ্রয় পাবে। কেউ তার ক্ষতি করবে না এবং গ্রামের হোটেলে যা পাওয়া যায় তা থেকে তার চাহিদা মেটানো অসম্ভব হবে না। রুশ সৈনিকটি তখন ম্যানেজারের হাত চুম্বন ক'রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাইল। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের রীতিটি এই অঞ্চলে অপরিজ্ঞাত ব'লে ম্যানেজার সাহেব তাঁর হাত গুটিয়ে নিলেন। চুম্বন করতে দিলেন না। তাকে হোটেলে নিয়ে এলেন তিনি। থাকবার ব্যবস্থাও ক'রে দিলেন। বিদায় নেওয়ার আগে ম্যানেজারসাহেব আবার তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

একমাত্র ম্যানেজারসাহেবই তো তার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন। অতএব তিনি চ'লে যেতেই লোকটির মনে পুনরায় উদ্বেগের সঞ্চার হ'ল। আশপাশের লোকেরা তার অদ্ভুত ভাবভঙ্গী দেখে হয়তো আমোদ উপভোগ করছে—তা করুক, তবুও সে চেয়ে রইল ম্যানেজারের অপস্রিয়মাণ মূর্তির দিকে যতক্ষণ না তাঁর মূর্তিটা মিশে গেল হোটেল সংলগ্ন পাহাড়ের পেছন দিকে। দর্শকদের মধ্যে একজন তখন সমবেদনাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে তার গায়ে খোঁচা মেরে ইশারা ক'রে বুঝিয়ে দিলে যে, সামনের ঘরখানাই তার জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মাথা নিচু ক'রে সেই অস্থায়ী আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করল লোকটি। মদের পিপে থেকে এক গেলাস ব্র্যাণ্ডি নিয়ে এল একজন পরিচারিকা। বাকী সময়টা সে এই ঘরে ব'সেই কাটিয়ে দিল। মনে স্ফূর্তি ছিল না একটুও। তার ওপর গাঁয়ের বাচ্চা ছেলেরা সারাক্ষণ জানলা দিয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছিল তাকে। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো হেসে উঠছে ওরা, কখনো বা লোকটিকে লক্ষ্য ক'রে চেঁচিয়ে হয়রান হ'য়ে পড়ছে। হোটেলের অন্যান্য বাসিন্দেরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছিল তাকে। বিরক্ত বোধ করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক হ'ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও রুশ সৈনিকটি কারো দিকেই নজর দিল না, মাথা নিচু ক'রে ব'সে রইল। লজ্জা আর সংকোচে ভেঙে পড়ছিল যেন। খাবার সময় বাসিন্দেরা অনবরত কথা ব'লে চলেছে—ঘরময় লোক আর লোক। রুশটি কিন্তু তাদের একটি কথাও বুঝতে পারছে না। সবাই হাসিখুশিতে ভরপুর— আলাপ-আলোচনায় মত্ত হ'য়ে আছে। সে শুধু একজন বোবা এবং বধিরের মতো ব'সে রইল এদের মধ্যে। পরিচয় কেউ জানে না—সে একজন অপরিজ্ঞাত বিদেশী মানুষ মাত্র। এমনভাবে হাত কাঁপছে যে, খাবারদাবার

স্পর্শ করতে পারছে না। চোখ ভিজে উঠল তার, কান্না পাচ্ছে—এক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল টেবিলের ওপর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তক্ষুনি সে চারদিকটা চেয়ে দেখতে লাগল। নবাগতের বেদনাময় অবস্থাটা চোখে পড়ল অন্যান্য অতিথিদের। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হ'ল নিরেট নিস্তব্ধতা—কারো মুখে আর আওয়াজ নেই। রুশ সৈনিকটি এবার দুঃসহ লজ্জার ভারে মাথাটা নামিয়ে ফেলল প্রায় টেবিল পর্যন্ত।

মদ্যপানের ঘরটিতে সে ব'সে রইল সন্ধে অবধি। কত লোক আসছে, আবার চ'লেও যাচ্ছে। কেউ তাকে আর লক্ষ্য করছে না—সে নিজেও আর গ্রাহ্য করছে না দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি। উনোনের পাশেই যে টেবিলটা ছিল সেখানেই সে ব'সে রইল নিঃশব্দে। তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটি মানুষও আর সচেতন নয়। হঠাৎ একসময়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—কেউ একবার তার দিকে ফিরেও তাকাল না। বোবা জন্তুর মতো দৃঢ়পদে পাহাড়ের ওপর দিকে উঠতে লাগল সে। তারপর হোটেলের প্রধান অংশের প্রবেশপথের সামনে এসে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটি। মাথা থেকে টুপিটা খুলে নিয়ে আগেই সে হাতে রেখে দিয়েছিল। এ কঘণ্টা ঐ একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল, অথচ কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে না। শেষ পর্যন্ত একজন দারোয়ানের দৃষ্টি পড়ল এই অদ্ভুত ধরনের লোকটির ওপর। সে গিয়ে ম্যানেজারসাহেবকে ডেকে নিয়ে এল। তাঁর প্রথম কথা শুনেই রুশ সৈনিকটি পুলকিত হ'য়ে উঠল। ম্যানেজারসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কোনো কিছু চাই কি, বোরিস ?"

থেমে থেমে লোকটি বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সার—আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই।" মৃদু হেসে ম্যানেজার বললেন, "নিশ্চয়ই, তুমি বাড়ি চ'লে যাবে।"

"কবে ? আগামী কাল ?"

কথা শুনে ম্যানেজারের মুখ গম্ভীর হ'য়ে এল। এমন গভীর অনুনয়ের সুরে কথাটা বলেছে বোরিস যে, তাঁর মুখে আর হাসি রইল না। তিনি বললেন, "যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত তুমি বাড়ি যেতে পারবে না।"

"যুদ্ধ থামবে কবে ?"

"ভগবান জানেন। মানুষের পক্ষে ভবিষ্যৎবাণী করা অসম্ভব।"

"এতদিন পর্যন্ত আমায় অপেক্ষা করতে হবে? তার আগে কি আমি বাড়ি ফিরতে পারি না?"

"না, বোরিস।"

"আমার বাড়ি কি এখান থেকে অনেক দূর?"

"হ্যাঁ।"

"পৌঁছতে অনেক দিন লাগবে বুঝি?"

"সত্যিই, অনেক দিন লাগবে।"

"কিন্তু দেখুন, আমি তো হেঁটেই চ'লে যেতে পারি। আমি শক্ত সবল মানুষ। পথ হাঁটতে আমার কষ্ট হবে না।"

"এ অসম্ভব, বোরিস। বাড়ি পৌঁছবার আগে তোমায় অন্য একটা দেশের সীমান্ত পেরুতে হবে।"

"আরও একটা সীমান্ত?" হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইল বোরিস। 'সীমান্ত' কথাটার কোনো অর্থই যেন নেই ওর কাছে। তারপর অত্যন্ত সহজ এবং সরলভাবে সে ব'লে ফেলল, "আমি সাঁতরে পার হ'য়ে যাব।"

ম্যানেজারসাহেব হাসি সংবরণ করতে পারলেন না। কিন্তু বোরিসের অবস্থা দেখে তিনি দুঃখ বোধ করলেন এবং ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, "না, তা তুমি পারবে না। 'সীমান্ত' মানেই বিদেশ। তারা তোমায় তাদের দেশের মধ্য দিয়ে পার হ'তে দেবে না।"

"কিন্তু তাদের তো আমি কোনো ক্ষতি করব না। আমার বন্দুকটা তো আমি ফেলে দিয়েছি। তাদের আমি অনুরোধ করব, তারা কেন আমার স্ত্রীর কাছে আমায় ফিরে যেতে দেবে না?"

ম্যানেজারসাহেবের মুখ এবার আরও বেশি গম্ভীর হ'য়ে উঠল। গভীর বেদনায় মনটা তাঁর ভরপুর হ'য়ে গেল। তিনি বললেন, "না বোরিস, ভগবানের নামে শপথ করলেও তারা তোমায় যেতে দেবে না। আজকাল কেউ ভগবানের কথাও শুনতে চায় না।"

"তাহ'লে আমার কি হবে? এখানে আমি থাকতে পারব না। কেউ আমার কথা বোঝে না। আমিও কারো কথা বুঝতে পারি না।"

"আস্তে আস্তে ওদের কথা তুমি শিখতে পারবে।"

অস্বীকৃতিসূচক ভঙ্গী ক'রে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বোরিস বলল, "না সার,

ওদের কথা আমি কখনই শিখতে পারব না। আমি শুধু মাঠে লাঙল দিতে জানি। ক্ষেত চাষ করা ছাড়া আমার অন্য আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই। এখানে আমি কি কাজ করব? ম্যানেজারসাহেব, আমি বাড়ি যেতে চাই। আমায় পথ দেখিয়ে দিন!"

"বোরিস, পথ ব'লে কোনো কিছু নেই এখানে।"

"কিন্তু আমার স্ত্রী এবং ছেলেপেলেদের কাছে ফিরে যাওয়ার পথ তারা নিশ্চয়ই বন্ধ করতে পারে না! আমি তো আর সৈনিক নই!"

"হ্যাঁ, পথ তারা অবশ্যই বন্ধ করতে পারে।"

"তাহ'লে সম্রাট আমায় নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন?" এই কথাটা তার হঠাৎ মনে হয়েছে। সম্রাটের নামটা উচ্চারণ করবার সময় তাঁর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে উঠল বোরিস। ভবিষ্যতের পথটা বুঝি পরিষ্কার হ'য়ে গেল সেই কথা ভেবে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল সে।

"বোরিস, রাশিয়ায় এখন সম্রাট ব'লে আর কেউ নেই। তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছে।" ঘোষণা করলেন ম্যানেজার।

"সম্রাট নেই?" শূন্য দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল ম্যানেজারসাহেবের দিকে। আশার আলোটা সহসা নিবে গিয়েছে। দেহ এবং মনের ওপর অবসাদের মেঘ পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠল। শ্রান্ত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে সত্যিই আমি বাড়ি ফিরতে পারব না?"

"অন্তত এক্ষুনি তো নয়—তোমায় আরও ক'টা দিন অপেক্ষা করতে হবে।"

"ক'টা দিন মানে কি? অনেক দিন নাকি?"

"তা আমি সঠিকভাবে বলতে পারব না।"

বোরিসের মুখের ওপর নেমে এল নিরাশার ঘনান্ধকার। সে বলতে লাগল, "কত দীর্ঘ সময় আমি অপেক্ষা করেছি! আরও আমি অপেক্ষা করব কি ক'রে? আমাকে পথটা একবার দেখিয়ে দিন, চেষ্টা ক'রে দেখি।"

"আমি তো আগেই বলেছি বোরিস, পথ ব'লে কিছু নেই। সীমান্তে পৌঁছলেই ওরা তোমায় গ্রেপ্তার করবে। তাই বলছিলুম, এখানেই এখন থেকে যাও। কাজকর্ম একটা তোমায় যোগাড় ক'রে দেব।"

"এখানে কেউ আমায় জানে না, আমিও কাউকে জানি না—" স্খলিত

কণ্ঠে বলতে লাগল বোরিস, "আমি এখানে থাকতে পারব না···আমায় সাহায্য করুন···আমায় বাঁচান ম্যানেজারসাহেব।"

"কি ক'রে তোমায় আমি এই ব্যাপারে সাহায্য করি—অসম্ভব। আমি পারব না।"

"ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন, দয়া ক'রে আমায় সাহায্য করুন। নইলে আমার আর উপায় নেই—ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

"সাধ্য নেই আমার। আজকাল মানুষ আর মানুষকে সাহায্য করতে পারে না।"

দু'জন দু'জনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। টুপিটা হাত দিয়ে মোচড়াতে লাগল বোরিস। একটু পরেই সে জিজ্ঞাসা করল, "আমায় কেন ওরা দেশ থেকে বাইরে নিয়ে এল? ওরা তো বলেছিল, রাশিয়া আর সম্রাটের জন্য আমায় লড়তে হবে। কিন্তু এখন তো দেখছি রাশিয়া এখান থেকে কত দূরে! আর সম্রাট······কি যেন বললেন আপনি, সম্রাটকে ওরা কি করেছে?"

"তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেছে।"

"সিংহাসনচ্যুত?" অর্থটা পরিষ্কার বুঝতে পারল না ব'লে কয়েকবার নিজের মনেই কথাটা আওড়ে গেল সে। তাবপর বলতে লাগল আবার, "আমি এখন কি করি? বাড়ি আমায় যেতেই হবে। আমার ছেলেপেলেরা কেঁদেকেটে অস্থির হচ্ছে। আমি ফিরে যাব—আমায় সাহায্য করুন, ম্যানেজারসাহেব।"

"সাহায্য করবার কোনো উপায় নেই, বোরিস।"

"অন্য কেউ কি পারেন না সাহায্য করতে?"

"এই সময়ে কেউ পারবেন না।"

খানিকক্ষণের জন্য রুশ সৈনিকটি নৈরাশ্যে মগ্ন হ'য়ে রইল। তারপর সহসা অত্যন্ত বিষণ্ণ স্বরে ব'লে উঠল সে, "আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।" ব'লেই সে ঘুরে দাঁড়াল। অপেক্ষা আর করল না—সেখান থেকে চ'লে এল বোরিস।

ধীরে ধীরে নামতে লাগল নিচে। ম্যানেজারসাহেব চেয়েছিলেন সেই দিকে। বিস্মিত বোধ করলেন তিনি যখন দেখলেন, বোরিস হোটেল পার

হ'য়ে গিয়ে হেঁটে চ'লে গেল লেকের দিকে। এই সহৃদয় দো-ভাষী ম্যানেজার-সাহেবটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন একবার। তারপর তিনিও চ'লে গেলেন তাঁর নিজের কাজে।

যেই জেলেটি তাকে জীবন্ত অবস্থায় লেকের জল থেকে উদ্ধার ক'রে এনেছিল, দৈবক্রমে পরের দিন সকালবেলা সে-ই আবার জল থেকে তুলে নিয়ে এল রুশ সৈনিকের উলঙ্গ মৃতদেহটা। পলাতকটি অতি যত্ন সহকারে ধার-করা কোট আর প্যান্ট ভাঁজ ক'রে রেখে দিয়েছিল লেকের ধারে। কাপড়চোপড়ের পাশে টুপিটাও খুলে রাখতে ভুল করেনি সে। যেমন অবস্থায় লেক থেকে উঠে এসেছিল, ঠিক তেমনি উলঙ্গভাবেই সে আবার নেমে গিয়েছিল লেকের জলে।

বিদেশীটির নাম কারো জানা ছিল না। অতএব তার কবরের ওপর প'ড়ে রইল শুধু একটা কাঠের ক্রুশ। নামহীন স্মৃতিচিহ্নের পরিচয় কিছু রইল না।

অপরিচিতার পত্র

সেই সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক ভদ্রলোকটি কয়েকদিনের জন্য পাহাড় অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সকালবেলা ভিয়েনা শহরে পৌছেই স্টেশনে একখানা খবরের কাগজ কিনলেন। তারিখটার দিকে নজর দিতেই মনে পড়ল, আজ তাঁর জন্মদিন। একচল্লিশ বছরে পা দিলেন তিনি! কথাটা বিদ্যুতের মতো মনের মধ্যে খেলে গেল। আনন্দিত হওয়ার কারণ কিছু নেই। তাই ব'লে দুঃখ বোধও করলেন না তিনি। ট্যাক্সিতে ব'সে খবরের কাগজখানা তন্ন তন্ন ক'রে পড়তে লাগলেন। বাড়ি পৌছে শুনতে পেলেন, তাঁর অনুপস্থিতিকালে কয়েকজন সাক্ষাৎপ্রার্থী এসেছিলেন দেখা করতে। তা ছাড়া কেউ কেউ টেলিফোনও করেছিলেন। এক তাড়া চিঠিও এসে প'ড়ে আছে। চিঠিগুলি তিনি দেখলেন বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। পত্রপ্রেরকদের নাম জানবার আগ্রহ আছে ব'লেই দু' একটা চিঠি তিনি খুললেনও—তার মধ্যে একটা মোটা ধরনের প্যাকেট তাঁর নজরে পড়ল। যিনি ঠিকানা লিখেছেন তাঁর হাতের লেখাটা অবশ্যই অপরিচিত। যাই হোক, আপাতত প্যাকেটটা একদিকে সরিয়ে রাখলেন তিনি। ডেক-চেয়ারে শুয়ে চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়া শেষ করলেন—গোটা কয়েক ইশতিহারও প'ড়ে ফেললেন। তারপর একটা সিগার ধরিয়ে নিয়ে বাকী চিঠিগুলিও এক এক ক'রে দেখতে লাগলেন।

এবার সেই বিরাট লম্বা চিঠিখানা খুললেন, একটু আগে যেটা তাঁর কাছে একটা প্যাকেটের মতো ব'লে মনে হয়েছিল। এখন দেখলেন এটা একটা সাধারণ চিঠি নয়, পাণ্ডুলিপি। বড় বড় অনেকগুলো কাগজ, মেয়েলী ছাঁদের হাতের লেখা—তাও লিখেছেন খুব দ্রুত গতিতে। খামের ভেতরটা আবার তিনি ভালো ক'রে পরীক্ষা করলেন, কি জানি ভেতরে হয়তো আলাদা একটা চিঠি আছে তিনি দেখতে পাননি—হয়তো নজর এড়িয়ে গেছে তাঁর। অনুমান তাঁর মিথ্যে হ'ল। না, আলাদা কোনো চিঠিপত্র কিছু নেই। যিনি পাণ্ডুলিপিটা পাঠিয়েছেন তাঁর স্বাক্ষর কিংবা ঠিকানা পর্যন্ত কোথাও তিনি খুঁজে পেলেন না। পাণ্ডুলিপিটা পড়তে আরম্ভ ক'রেই একটু বিস্মিত বোধ

করলেন ঔপন্যাসিক। সম্বোধন করবার চেষ্টা করেননি লেখিকা—শীর্ষদেশে শুধু লেখা রয়েছে, "তাঁরই উদ্দেশে লিখছি যিনি আমায় চেনেন না"। হকচকিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। প্রশ্ন জাগল মনে: চিঠিখানা কি সত্যি সত্যি তাঁকেই লিখেছেন, না অন্য কোনো কল্পিত ব্যক্তিকে সম্বোধন করেছেন? প্রবল কৌতূহলের সৃষ্টি হ'ল তাঁর মনে। তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন :

আমার ছেলেটি গতকাল মারা গিয়েছে। ঐ ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর পিঞ্জরাবদ্ধ জীবনটাকে ধ'রে রাখবার জন্য তিন দিন তিন রাত্রি মৃত্যুর সঙ্গে কি প্রচণ্ড সংগ্রামই না আমায় করতে হ'ল। ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের উত্তাপে বেচারীর দেহটা যখন জ্ব'লে-পুড়ে খাক হ'য়ে যাচ্ছিল তখন আমি ক্রমান্বয়ে চল্লিশ ঘণ্টা ধ'রে ব'সে ছিলাম ছেলেটার পাশে। রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা কপালে ওর জলপটি দিয়েছি। কষ্ট পাচ্ছিল খুব, অস্থিরতায় অধীর কচি কচি হাত দু'খানা ওর নিজের হাতের মধ্যে ধ'রে রেখেছিলাম। তৃতীয় দিন সন্ধের পরে ভেঙে পড়লাম আমি—শক্তি আমার নিঃশেষ হ'য়ে এল। নিজের অজ্ঞাতসারে শক্ত চৌকির ওপরেই ঘণ্টা তিন-চারের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ছেলেটা ঠিক সেই সময়েই মারা গেল। ঐ তো আমার সোনার চাঁদ তার ছোট্ট বিছানাটার ওপর শুয়ে রয়েছে। মৃত্যুর আগে যেমন দেখেছি এখনো যেন ঠিক তেমনিভাবেই প'ড়ে আছে ওখানে। শুধু চোখ দু'টো ওর বোজা। আহা, বুদ্ধিদীপ্ত কালো কালো চোখ দু'টো কি সুন্দরই না ছিল! অস্থির হাত দু'খানা এখন বুকের ওপর আড়াআড়িভাবে স্থির হ'য়ে আছে। বিছানার চার কোনায় চারটে মোমবাতি জ্বলছে। দৃশ্যটা যে মর্মান্তিক তাতে আর সন্দেহ নেই। ব'সে ব'সে দেখতে পারছি না, অথচ উঠেই বা যাই কি ক'রে! উঠে যাওয়া অসম্ভব। মোমবাতির আলোটা যখন কেঁপে কেঁপে ওঠে তখন মনে হয়, ওর নিশ্চল মুখ আর নিস্পন্দ ঠোঁটের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে ছায়ার মিছিল—ঢেউ-এর মতো এক-একটা ছায়া অন্যটার পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত। হঠাৎ যেন দেখতে পাই, মুখ আর ঠোঁট দু'টো বুঝি একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠল! কল্পনা করছি, ছেলেটা বোধহয় মরেনি। ঘুম থেকে জেগে উঠবে সে, স্পষ্ট স্বরে এমন কিছু একটা বলবে যার মধ্যে থাকবে শুধু বালকোচিত প্রিয় সম্ভাষণ। কিন্তু…কিন্তু আমি জানি সে তো মৃত। আর আমি ওর দিকে চাইব না—আরও একবার

আশা করতে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে আরও একবার নৈরাশ্যে নিমগ্ন হওয়া। এখন আমি নিঃসন্দেহ হয়েছি, গত কাল ছেলেটি আমার মারা গিয়েছে। এখন আপনিই শুধু আমার একমাত্র ভরসা—পৃথিবীতে আমার আর কেউ নেই। আপনি আমায় চেনেন না, তা সত্ত্বেও বলছি, আপনি আমার সব। মানুষ এবং যাবতীয় জাগতিক ব্যাপার নিয়েই তো আপনার কারবার চলেছে এবং কারবারটি যে আপনার কাছে আনন্দপ্রদ তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই, তবুও বলছি শুধু আপনাকেই আমি ভালবাসি। এই ভালবাসার স্রোতে কোনোদিনও ভাঁটা পড়েনি।

টেবিলে ব'সে চিঠি লিখছি, অতএব মোমবাতি একটা জ্বালাতে হ'ল। ছেলেটার মৃতদেহের পাশে একা একা ব'সে থাকা অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। কারো কাছে মনের কথা খুলে বলতে পারলে বেঁচে যেতাম। এইরকম একটা ভয়ংকর মুহূর্তে আপনার কাছে ছাড়া অন্য কার কাছেই বা মনের কথা বলব? বিশ্বাস করুন, আগেও যেমন আপনাকে আমি একমাত্র বন্ধু ব'লে ভাবতাম এখনো ঠিক সেইরকমই ভাবছি। বোধহয় ব্যাপারটা আপনার কাছে স্পষ্ট হচ্ছে না—নিজেকে হয়তো পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করতে পারছি না। বোধ-হয় সেই কারণেই আমার কথা আপনি বুঝতে পারছেন না। ভীষণ মাথা ধরেছে, কপালের রগ উঠেছে ফুলে, হাতপা সব বেদনায় টনটন করছে। মনে হয়, জ্বর এসেছে আমার। এই অঞ্চলে ইনফ্লুয়েঞ্জার প্রকোপ খুব বেশি। কে জানে, হয়তো আমার মধ্যেও রোগবীজাণু সংক্রামিত হয়েছে। এই উপায়ে যদি আমি আমার ছেলের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হ'তে পারি তাতে আমার খেদ থাকবে না কিছু। মাঝে মাঝে চোখে আমি অন্ধকার দেখছি। হয়তো এই চিঠি আমি শেষ করতে পারব না। কিন্তু তবুও আমি চেষ্টার ত্রুটি রাখব না শেষ করতে। আমার বক্তব্যটুকু আপনাকে বলবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব আমি। আপনি আমার প্রিয়জন, যদিও জানি আমাকে আপনি চেনেন না।

জীবনে এই প্রথম শুধু আপনার কাছেই সব কথা খুলে বলতে চাইছি আমি। সমস্ত কাহিনীটা শুধু আপনাকেই শোনাতে চাই। আপনি জানেন না বটে, কিন্তু তবু বলব এর সবটুকুই আপনার। আমার মৃত্যুর পরে কাহিনীটা জানতে পারবেন আপনি। তখন আর কারো কাছে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না। যদি আমার মৃত্যু না ঘটে তাহ'লে অবিশ্যি এই

চিঠি আমি টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলব এবং যা এতকাল লুকনো ছিল অতঃপর সেটা লুকনোই থাকবে। আপনি যদি এ চিঠি কখনো হাতে পান তাহ'লে বুঝবেন যে, একজন মৃত স্ত্রীলোক তার জীবনকাহিনী ব'লে যাচ্ছে আপনাকে। আমার জীবনটা তো গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত আপনার হাতেই সঁপে দিয়েছি আমি। এতে আপনার ভয় পাওয়ার কারণ নেই। যে মৃত সে তো আর কিছুই চায় না। ভালবাসা, সহানুভূতি এবং করুণা প্রত্যাশার সুযোগ তার নেই। যে দুঃসহ যন্ত্রণায় জর্জরিত হ'য়ে আজ আমি গোপন কাহিনীটি লিখতে বাধ্য হলুম তার সবটুকুই যেন সত্য ব'লে আপনি গ্রহণ করতে পারেন তেমন প্রত্যাশাই আমার রইল। আমি যা লিখতে যাচ্ছি তার বিন্দুবিসর্গও মিথ্যে নয়। একমাত্র সন্তানের মৃতদেহের পাশে ব'সে মা কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারেন না। আমার প্রতিটি কথা আপনি বিশ্বাস করবেন, এই অনুরোধের বাইরে আপনার কাছে আমার আর দ্বিতীয় কিছু চাওয়ার নেই।

যেদিন আমি আপনাকে প্রথম দেখলাম সেইদিন থেকেই আমার কাহিনীর শুরু। তার আগে যা কিছু আমার মনে পড়ে তার সবটাই চরম বিভ্রান্তি আর বিষণ্ণতায় আবৃত। স্মরণযোগ্য অতীত সেটা নয়। মনে পড়ে, জীবনটা ছিল মাটির তলায় একটা ঘরের মতো—তার মধ্যে জিনিসপত্র যা ছিল তার সবই ধুলো আর মাকড়সার জাল দিয়ে আচ্ছন্ন। যাঁরা বাস করতেন ওখানে তাঁরাও ছিলেন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। অবিশ্যি মন আমার কোনো দিনও সেখানে বাসা বাঁধেনি। আপনি যখন আমার জীবনে প্রথম এসে উপস্থিত হলেন তখন আমার বয়েস মাত্র তেরো। আপনি এখন যেখানে বাস করছেন ঠিক সেই জায়গাতেই আমিও তখন বাস করতাম। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে ঐখানে ব'সে আপনি আমার চিঠিখানা এখন পড়ছেন। একই তলায় আমাদের ফ্ল্যাট—আপনার দরজার উল্টো দিকেই ছিল আমাদের দরজা। আমাদের আপনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। অ্যাকাউন্টেন্ট সাহেবের সেই শোকসন্তপ্তা বিধবা স্ত্রীর কথা কিংবা তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্কা রোগা ধরনের মেয়েটির কথা কি মনে আছে? মনে থাকা সম্ভব নয় জানি। আমরা এমন সঙ্গোপনে বাস করতাম সেখানে যে, কেউ কখনো আমাদের উপস্থিতির কথা জানতে পারত না। যারা দরিদ্র তাদের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে নিজেদের

অস্তিত্ব অপর কাউকে বুঝতে না দেওয়া—সত্যিকারের ভদ্রতা প্রকাশের লক্ষণ এ নয়। এমন ধারণা করাই আমার পক্ষে সংগত হবে যে, আপনি আমাদের নাম জানতেন না। কারণ, আমাদের বাইরের দরজার সামনে কারো নাম লেখা ছিল না। এবং কেউ কোনো দিন আমাদের সঙ্গে দেখা করতেও আসেননি। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে সময়ের ব্যবধানও বেড়ে গেছে অনেক—পনরো কি ষোল বছর হবে। অতএব, আমাদের কথা মনে রাখা অসম্ভব। আমি কিন্তু ভুলিনি কিছুই—খুঁটিনাটি ঘটনাও সব মনে রেখেছি। পরম আশ্চর্যের কথা, আপনাকে আমি যেদিন এবং যে সময়ে প্রথম দেখেছিলাম তাও আমি পরিষ্কারভাবে স্মরণ করতে পারছি। মনে হয় যেন এই এক্ষুনি আপনার সঙ্গে দেখা হ'ল—পনরো ষোল বছরের ব্যবধানটা লোপ পেয়ে যেতে বিলম্ব হ'ল না। একটু ধৈর্য ধরুন আপনি, আগাগোড়া সবই বলছি—পুরো কাহিনীটা বলতে দিন আমায়। গল্পটা বলতে কতটুকুই বা সময় লাগবে, আর, আপনি যেন ক্লান্তি বোধ করবেন না। ভেবে দেখুন তো, আপনাকে আমি সমস্ত জীবন ধ'রে ভালবেসে আসছি, অথচ মুহূর্তের জন্যেও ক্লান্তি বোধ করিনি।

আপনার আগে যারা ঐ ফ্ল্যাটে বাস করত তারা ছিল অত্যন্ত জঘন্য স্বভাবের মানুষ। দিনরাত্রি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করত। সাংঘাতিক রকমের দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও, ওরা কিন্তু আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন ছিল না। আমরা কারো সঙ্গে মেলামেশা করতাম না ব'লে ওরা বরং আমাদের ঘৃণা করত খুব। ওদের মধ্যে একজন মদ খেয়ে এসে বউকে প্রায়ই মারধোর করত। বোধহয় কাঁচের প্লেট এবং চেয়ার ইত্যাদি ছোঁড়াছুঁড়ি করত তারা। মাঝরাত্রে আওয়াজ শুনে প্রায়ই আমাদের ঘুম ভেঙে যেত। একদিন তো পরিস্থিতি গুরুতর হ'য়ে উঠল। এত বেশি মার খেল বউটি যে, তার নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। সহ্য করতে না পেরে সে ছুটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। আমরা দেখলুম, মহিলাটির মাথার চুল সব খোলা, এলোমেলোভাবে হাওয়ায় উড়ছে। মাতাল স্বামীটি তার পেছনে পেছনে কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে দিতে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ল্যাণ্ডিং-এর ওপর। ইতিমধ্যে অন্যান্য সবাই এসে হাজির হয়েছিল সেইখানে। পুলিশ ডেকে আনবার হুমকি দিল তারা। আমার মা এদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক

রাখতেন না। তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলা করতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন তিনি। এই কারণে, সুযোগ পেলেই ওরা আমার ওপর মনের ঝাল ঝাড়তে দ্বিধা করত না। রাস্তায় যদি দেখা হ'য়ে যেত তাহ'লে ওরা আমায় গালি দিত খুব। একবার তো একটা ঢিল ছুঁড়ে মারল—আমার কপালে লেগে কেটে গেল খানিকটা। কেউ ওদের পছন্দ করত না। তারপর কি যেন একটা ঘটল—সম্ভবত চুরির অপরাধে লোকটিকে পুলিশ এসে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে গেল। মুক্তির নিশ্বাস ফেললাম আমরা। কয়েকদিন পর্যন্ত দরজার সামনে ঝুলতে লাগল 'ভাড়া দেওয়া হইবে' লেখা একটা বিজ্ঞপ্তির ফলক। একদিন দেখলুম, ফলকটা ওখানে আর নেই। বাড়িওয়ালার দারওয়ানের কাছে শুনতে পেলাম যে, একজন লেখক ঐ ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছেন। তিনি অবিবাহিত এবং শান্তপ্রকৃতির মানুষ। গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। সেইদিনই প্রথম আপনার নামের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটল।

কয়েকদিন পরেই ঘরদোর সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করা হ'ল। শুধু তাই নয়, মিস্ত্রী এবং ডেকোরেটার এসে নতুন ক'রে রং ফিরিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিয়ে গেল। অবিশ্যি তার ফলে হৈ-হল্লা খানিকটা হ'ল বটে, কিন্তু মা তাতে খুশিই হলেন খুব। তিনি বললেন, অরাজকতার হাত থেকে বাঁচা গেল—পাশের ফ্ল্যাটে এবার থেকে শান্তি বিরাজ করবে। আপনি যখন বাড়ি বদল ক'রে নতুন ফ্ল্যাটে এসে ঢুকলেন তখন আমি আপনাকে দেখিনি। ঘর-দোর সাজানো-গুছনোর সময় আপনি ছিলেন না, ছিল আপনার ভৃত্য। তারই তত্ত্বাবধানে ডেকোরেটার এবং মিস্ত্রীরা কাজ করেছে। লোকটিকে আজও আমার মনে পড়ে। বেঁটেখাট দেখতে, মাথার চুল সব পাকা। আচার-ব্যবহারের মধ্যে অপরিমিত গাম্ভীর্য। মনে হয়, সম্ভ্রান্ত পরিবারেই চিরকাল কাজ করেছে সে। এমন সুশৃঙ্খলভাবে কাজকর্ম সব গুছিয়ে ফেলল লোকটি যে, আমরা সবাই তা দেখে খুব মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম। আমাদের এই শহরতলির ফ্ল্যাটে আগে কখনো এমন সুচতুর এবং উঁচু দরের ভৃত্যের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। এ একেবারে নতুন ব্যাপার ব'লে মনে হ'ল আমাদের। অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র ছিল সে। অন্যান্য চাকরবাকরদের সঙ্গে কখনো তাকে অযাচিত অন্তরঙ্গতায় ডুবে যেতে দেখিনি। প্রথম দিন থেকেই

আমার মায়ের সঙ্গে সশ্রদ্ধভাবে কথা বলতে লাগল সে। বয়সে যদিও আমি খুব ছোটই ছিলাম, তবুও আমার প্রতি তার শিষ্টাচারের অভাব ঘটতে দেখিনি। কখনো কখনো তাকে আপনার নামোল্লেখ করতে শুনেছি বটে, কিন্তু তাতে মনিব-ভৃত্যের সম্পর্কটা প্রকাশ পেত না। বরং মনে হ'ত, আপনার পরিবারের মধ্যে সেও একজন। এইজন্য বৃদ্ধ জন-কে আমি খুবই ভালবাসতাম। কিন্তু ওকে আমি ঈর্ষাও করতাম খুব। কারণ, চব্বিশ ঘণ্টাই সে আপনার কাছে কাছে থেকে সেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল।

এইসব ছোটখাট ঘটনাগুলো কেন উল্লেখ করছি জানেন? অত অল্প বয়সে আপনার ব্যক্তিত্ব যে প্রথম দিন থেকেই আমার উপর কী গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল সেই কথাই আপনাকে বোঝাতে চাইছি আমি। আপনাকে দেখবার আগেই আপনার চতুর্দিকে সৃষ্টি হয়েছিল এক অত্যাশ্চর্য বর্ণবলয়—অলৌকিক মহিমার আলোকরশ্মি বললেও অত্যুক্তি হবে না। ঐশ্বর্য, বিস্ময় ও রহস্যের পরিবেশে আপনি ছিলেন আবৃত হ'য়ে। যারা সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে জীবনযাপন করে তারা যখন নতুনত্ব কিছু দেখতে পায় তখন তাদের কৌতূহলের আর সীমা থাকে না—প্রচণ্ডভাবে লোভী হয়ে ওঠে তারা। আমাদের এই শহরতলির বাড়িতে আপনি কত তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছবেন তারই প্রতীক্ষায় আমরা সবাই অধৈর্য হ'য়ে উঠলাম। একদিন ইস্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি আসবাব বোঝাই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে। আমার নিজের কৌতূহল তখন চরমে উঠেছে। ভারি ভারি আসবাবগুলো আগেই ওপরে উঠে গিয়েছিল। ছোট ছোট জিনিসগুলো এখন দেখলুম গাড়ি থেকে নামানো হচ্ছে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম সব। আপনার জিনিসগুলি সবই নতুন ধরনের মনে হ'তে লাগল—এতকাল যা দেখে দেখে অভ্যস্ত তার চেয়ে আলাদা এগুলো। ভারতীয় দেব-দেবীর মূর্তি, ইতালি দেশের ভাস্কর্য এবং নানারকমের ছবিও তাতে ছিল। সবার শেষে নামানো হ'ল রাশি রাশি বই—কী সুন্দরই না ছিল বইগুলি। এত বই যে মানুষের থাকতে পারে তেমন কল্পনা করা আমার পক্ষে সত্যিই অসাধ্য ছিল। আপনার ঘরের দরজার সামনে বইগুলি ক্রমশই স্তূপীকৃত হ'য়ে উঠল। দেখলুম, আপনার

ভৃত্যটি অতি যত্ন সহকারে প্রতিটি বই ঝেড়ে-মুছে রাখছে। ক্রমবর্ধমান বই-এর স্তূপটা লোভীর মতো চোখ দিয়ে গিলতে লাগলুম আমি। আপনার ভৃত্যটি তাতে আপত্তি করল না বটে, কিন্তু তাই ব'লে বইগুলো দেখবার জন্য আমন্ত্রণও জানাল না আমায়। সেই কারণে, বইগুলো ছুঁতে আমার ভয় করতে লাগল। বিশ্বাস করুন, চামড়া দিয়ে বাঁধানো মসৃণ বইগুলো ছুঁয়ে দেখবার লোভ আমার প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। ভয়ে ভয়ে কয়েকটা বই-এর নাম আমি দেখে ফেললাম। সবগুলোই প্রায় ফরাসী এবং ইংরেজী ভাষায় লেখা। স্বীকার করতে আপত্তি নেই যে, উপরোক্ত ভাষা দু'টির মধ্যে একটিও আমার জানা ছিল না। তবুও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওখানে দাঁড়িয়ে বইগুলোর দিকে চেয়ে থাকতে পারতাম আমি। কিন্তু মা আমায় ডেকে পাঠালেন ব'লে ভেতরে চ'লে যেতে হ'ল।

আপনাকে আমি তখনো চোখে দেখিনি, অথচ সমস্তটা রাত আপনার কথাই ভাবলাম শুধু। আমার নিজের বলতে গোটা বারো বাজে বই ছিল। তাও আবার তার একটা মলাটও আস্ত ছিল না, সব ছেঁড়া। তা সত্ত্বেও ঐগুলিই ছিল আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। একবার দু'বার নয়, বহুবার বইগুলি পড়েছি আমি। এখন আমি আশ্চর্য হয়ে আপনার কথাই ভাবতে লাগলাম। কত বই আপনার, কি বিরাট আপনার জ্ঞানের পরিধি, কতগুলো ভাষা শিখেছেন এবং তার ওপরে বড়লোক হ'য়েও আপনি পাণ্ডিত্যের অধিকারী। মানুষটা যে আপনি ঠিক কি ধরনের হবেন সেই চিন্তায় আমি বিভোর হ'য়ে গেলাম। এক সঙ্গে এতগুলো বই-এর কল্পনা করতে গিয়ে আপনার প্রতি শ্রদ্ধার আর সীমা রইল না। মনে মনে আপনার একটা কাল্পনিক মূর্তিও গ'ড়ে তুললাম আমি। আপনি নিশ্চয়ই বৃদ্ধ লোক হবেন—চোখে চশমা। আমাদের ভূগোলের মাস্টার মশায়ের মতো আপনারও লম্বা এবং পাকা দাড়ি আছে। তবে তাঁর চেয়ে যে আপনি দেখতে বেশি সুন্দর, অধিকতর দয়াপ্রবণ এবং বিনয়ী সে সম্বন্ধে আমার কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। আপনাকে বৃদ্ধ হিসেবে কল্পনা করা সত্ত্বেও কেন যে আমি আপনাকে সুদর্শন পুরুষ ভেবে নিঃসন্দেহ হলুম তার কারণ আমার জানা নেই। সেই রাত্রেই আপনাকে আমি প্রথম দেখলাম—আমার স্বপ্নের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন আপনি।

পরের দিন আপনি এসে নিজের ফ্ল্যাটে উঠলেন। আমি যদিও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলাম, তবুও আপনার মুখ আমি দেখতে পেলাম না। তার ফলে কৌতূহল আমার আরও ভীষণভাবে বেড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তৃতীয় দিন আপনাকে আমি দেখলাম। ছেলেমানুষী কল্পনা দিয়ে যে-মানুষটিকে গ'ড়ে তুলেছিলাম আমি তাঁর সঙ্গে আপনার কোনো সামঞ্জস্য নেই। আপনাকে একেবারে আলাদা মানুষ দেখে আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না। আমি তো ভেবেছিলাম, চশমা-পরা একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখব। কিন্তু আপনি এসে উপস্থিত হলেন, এমন একটি মানুষ হিসেবে যার দেহে কিংবা মনে বয়সের ছাপ পড়েনি। ফিকে বাদামী রঙের কোট-প্যাণ্ট পরা ছিল আপনার। বালকোচিত উদ্যমে দু' সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছিলেন আপনি। টুপিটা আপনার হাতে ছিল। সেইজন্য আপনার মুখ দেখতে অসুবিধে হয়নি। আজও আপনার সেই তারুণ্যপূর্ণ হাসিখুশি মুখটি আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে ওঠে। সুন্দর, ঋজু এবং ফিটফাট মানুষটিকে দেখে আমি শুধু বিস্মিত হইনি, প্রচণ্ড একটা ধাক্কাও খেলুম যেন। আমি অনুভব করলাম, আপনার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে দু'টি মানুষ। দু' রকমের অভিব্যক্তি নজরে পড়ল আমার। একটি মানুষ খেলাধুলো এবং দুঃসাহসিক কর্মপ্রচেষ্টায় চঞ্চল—অপরটি আবার শিল্পকলা ও জ্ঞানচর্চার মধ্যে নিমগ্ন। অন্যান্যের মধ্যে আমিও নিজের অজ্ঞাতসারে বুঝতে পারলাম, আপনি দু' রকমের জীবন যাপন করেন। একটির সঙ্গে পরিচয় ছিল সবার, সেটি আপনার বাইরের রূপ। অন্যটার বিচরণভূমি ছিল আপনার নিজের অন্তরে—সংসারের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ ছিল না। আমার মতো একটি তেরো বছরের ছোট্ট মেয়েকে আপনি কী সাংঘাতিকভাবে সম্মোহিত ক'রে রেখেছিলেন তার প্রমাণ শুনলে নিজেও খুব বিস্মিত বোধ করবেন। ঐ বয়সেই আপনার জীবনের গোপন সত্যটি নজরে পড়েছিল আমার। প্রথম দৃষ্টিতেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম আপনার দুই অস্তিত্বের মাঝখানকার প্রগাঢ় ফাটলটা।

এখন আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, আপনাকে একটা প্রলুব্ধকর প্রহেলিকার মতো মনে করতুম আমি? আপনি লেখক এবং স্বনামখ্যাত ব'লে সবাই আপনাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত। আমি দেখলুম আপনাকে উৎফুল্ল স্বভাবসম্পন্ন পঁচিশ বছর বয়সের একটি যুবক হিসেবে। এ কথা আপনাকে বলাই

বাহুল্য যে, অতঃপর আমার এই সীমাবদ্ধ ছোট্ট জগৎটিতে আপনি ছাড়া দ্বিতীয় অন্য কেউ আর রইলেন না। আপনাকে কেন্দ্র ক'রেই আমার জীবনটা ঘুরপাক খেতে লাগল। তেরো বছর বয়স্কার জীবনে যতটা সততা থাকা সম্ভব তার সবটুকুই ঢেলে দিলাম আমার এই নতুন প্রচেষ্টার মধ্যে। আপনার সব কিছুর ওপরেই আমার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। আপনার দৈনন্দিন জীবনের নানারকম অভ্যাসগুলি লক্ষ্য করেছি আমি। যেসব দর্শনপ্রার্থীরা আপনার কাছে আসতেন তাঁদেরও আমি দেখেছি। এতদ্দ্বারা আমার কৌতূহল শুধু বেড়েই গেছে। ভিন্ন ভিন্ন ধরনের দর্শনপ্রার্থীদের দেখে আপনার বিবিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটা আমার মানসিক চেতনায় প্রতিফলিত হ'য়ে উঠত। যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যুবক—অন্তরঙ্গ সঙ্গী তারা। পোশাক-পরিচ্ছদ তাঁদের ঢিলেঢালা, মনে হয় তাঁরা সবাই ছাত্র ছিলেন। এঁদের সঙ্গে আপনি হাসিঠাট্টা এবং ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত হ'য়ে থাকতেন। তাঁদের মধ্যে মহিলারাও ছিলেন। এঁরা আসতেন মোটরগাড়িতে চেপে। যুবতী মেয়েদেরও ওখানে যাওয়া-আসা করতে দেখেছি। তার মধ্যে অনেকেই যে স্কুল-কলেজের ছাত্রী তাতে আর সন্দেহ ছিল না। এমন অবলীলাক্রমে দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেন তাঁরা যে দেখলে মনে হ'ত এঁরা সবাই এখনো প্রথম যৌবনের লাজুক ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ওখানে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল খুব বেশি। এঁরা যাওয়া-আসা করতেন ব'লে আমার মনে অন্য কোনো রকমের ভাবনা-চিন্তা কখনই উদয় হয়নি। এমন কি একদিন সকালবেলা ইস্কুলে যাওয়ার পথে একটি মহিলাকে মুখ ঢেকে আপনার ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেও আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহের উদ্রেক হ'ল না। আমার বয়স তখন মাত্র তেরো বছর। যে আকুল আগ্রহ নিয়ে আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের ওপর দৃষ্টি রেখেছিলাম আমি তার অপর নাম যে ভালবাসা তেমন কথাটা আমার সেই অপরিণত মনে তখনো প্রবেশ করেনি।

কিন্তু যেদিন আমি সজ্ঞানে সমস্ত মনপ্রাণ আপনাকে সমর্পণ করলাম সেদিনটার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমারই স্কুলের এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম আমরা। এমন সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত-

ভাবে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন। আপনার এই যৌবনোচিত অধৈর্যের ভাবভঙ্গিটা আমাকে মুগ্ধ করত খুব। আপনি দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কি রকম একটা আবেগ অনুভব করলাম—আপনার ফ্ল্যাটে ঢোকবার দরজাটা খুলে ধরলাম আমি। আর একটু হ'লে আমাদের মধ্যে ধাক্কা লেগে যেত। আপনি এমন সাদর ও ক্ষমাশীল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন যে, মনে হ'ল আদরের স্পর্শ পেলাম বুঝি। পরম দরদীর মতো মৃদু হেসে আপনি আমায় ধীরে ধীরে বললেন—ঠিক ধীরে ধীরে নয়, যেন মনের কৃতজ্ঞতা গোপনে শুধু আমাকেই জ্ঞাপন করবার উদ্দেশ্যে বললেন, "অশেষ ধন্যবাদ।"

এখানেই ঘটনার শেষ। কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি আমার দিকে তাকালেন সেই মুহূর্ত থেকেই আমার সমস্ত অস্তিত্ব সঁপে দিলাম আপনার হাতে। আমার নিজের বলতে কিছু আর রইল না। পরে অবিশ্যি জানতে পেরেছিলাম যে, সব মেয়েদের দিকেই আপনি ঐ বিশেষ ভঙ্গিতে চেয়ে থাকতেন।' প্রলোভন আর আদব মিশ্রিত দৃষ্টি ব'লেই মেয়েদের আপনি প্রলুব্ধ করতে পারতেন। আপনার এই দৃষ্টির ছোঁয়াচ থেকে কোনো মেয়েই বাদ পড়ত না। আপনি যে ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার দ্বারা সব মেয়েদের পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করতেন তা নয়। যখনি কোনো স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টি পড়ত আপনার তখনি নিজের অজ্ঞাতসারে চোখ দু'টি যেন আদর-উত্তাপে ঢুলুঢুলু করত। তেরো বছর বয়সে আমি আপনাব এই দৃষ্টির বিশিষ্টতা ধরতে পারিনি। আমার মনে হ'ত, আদবের উষ্ণতায় আমি স্নান ক'রে উঠলুম যেন। আমি বিশ্বাস করতুম, আপনার ঐ ভাবপ্রবণ দরদী দৃষ্টির সবটুকুই আমার—শুধু আমার জন্যই অমন ক'রে আপনি চেয়ে থাকেন। আমার মতো একটি অপরিণত মেয়ের জীবন নবজন্মের সূচনায় চঞ্চল হ'য়ে উঠল। অনুভব করলাম, আমি আর তেবো বছর বয়সের একটি কিশোরী নই, আমি নারী। যে নারী তার ভবিষ্যৎ জীবনে নিজের ব'লে একটা কানাকড়িও লুকিয়ে বাখেনি, সব কিছু আপনার উদ্দেশে উৎসর্গ ক'রে দিয়েছিল।

আপনার জন্য আমি দরজাটা খুলে ধরেছিলাম। আপনি চ'লে যাওয়ার পর আমার বন্ধুটি জিজ্ঞাসা করল, "লোকটি কে রে?" জবাব দিতে দ্বিধা করতে লাগলাম। আপনার নামটা উচ্চারণ করা অসম্ভব হ'য়ে উঠল। হঠাৎ

যেন নামটা আমার কাছে পবিত্র ব'লে মনে হ'ল। শুধু তাই নয়, নামটি যেন আমার একলার সম্পত্তি এমন ভাব দেখিয়ে জবাব দিতে গিয়ে ভঙ্গিটা বিদঘুটে হ'য়ে উঠল। বললুম, "কেউ একজন হবেন···ঐ ফ্ল্যাটে থাকেন ভদ্রলোক।"

"তাহ'লে ভদ্রলোকটি যখন তোর দিকে চেয়ে ছিলেন তুই তখন লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলি কেন?"

মনে হ'ল, আমার লুকনো সম্পত্তির রহস্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্যে বন্ধুটি ঠাট্টা করছে। বোধহয় সেইজন্যই গাল আমার লাল হ'য়ে উঠেছে। ইচ্ছে ক'রেই রূঢ় কণ্ঠে বললুম, "কি হাবাগবা মেয়ে রে তুই!" রেগে গিয়ে আরও ব'লে ফেলেছিলাম, "গলা টিপে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করছে তোকে।" ঠাট্টার সুরে হো হো ক'রে হাসতে লাগল সে। মনের রাগ প্রকাশ করবার পথ না পেয়ে কেঁদে ফেললাম আমি। দরজার কাছে তাকে ফেলে রেখে আমি ছুটে চ'লে গেলাম ওপরে।

সেইদিন থেকে আমি আপনাকে ভালবাসি। এ কথা আমার অজানা নেই যে, মেয়েদের ভালবাসা-নিবেদনের ভাষা শুনতে আপনি অত্যন্ত অভ্যস্ত। কিন্তু আমি জানি, আমার মতো ক্রীতদাসীসুলভ মনোভাব নিয়ে সমস্ত মনপ্রাণের বিনিময়ে এত প্রগাঢ়ভাবে কেউ আর আপনাকে ভালবাসতে পারেনি। একটি বালিকার মনে একান্তে গ'ড়ে-ওঠা ভালবাসার সৌধটির সমকক্ষ সংসারে আর কিছুই নেই। এমন ভালবাসায় ভবিষ্যতের আশা থাকে না এবং তা একতরফা ব'লে দাস মনোবৃত্তির পরিচায়ক। এর মধ্যে ধৈর্য এবং আবেগের গভীরতা প্রচণ্ড। যুবতী নারীর কামনাসিক্ত কঠোর দাবি এতে নেই। যেসব বালকবালিকারা নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে তাদের মনেই এমন ভালবাসা জন্মায়। অন্যান্য সবাই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গোপন কথা নিয়ে গল্পালোচনা করে এবং তদ্দরুন প্রেমের নিবিড়তা অনেকাংশে লঘু হ'য়ে আসে। এরা প্রেম সম্বন্ধে এত গল্প শোনে এবং বই পড়ে যে, শেষ পর্যন্ত প্রেমের মর্যাদা এদের কাছে সামান্য একটা খেলার পুতুলে রূপান্তরিত হয়। ছেলেরা যখন প্রথম ধূমপান করতে শেখে তখন যেমন জাঁকালোভাবে সিগারেটটি সবাইকে দেখাতে চায়, এরাও ঠিক তেমনিভাবে প্রেমের সম্পর্কটিকে দশ-জনের কাছে গল্পচ্ছলে হাল্কা ক'রে তোলে। কিন্তু আমার কোনো অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না। বই প'ড়ে অথবা বন্ধুদের কাছে গল্প শুনে ভালবাসার শিক্ষা

গ্রহণের সুযোগ আমার ঘটেনি। আমি অনভিজ্ঞ ছিলুম এবং সন্দেহের ধোঁয়া আমার মনের সরলতাকে মলিন করতে পারেনি। অন্ধের মতো আমি আমার ভাগ্যের ওপর নির্ভর করতে লাগলাম। আমার জীবনের ভাবনা-চিন্তা সব কিছু আপনাকে কেন্দ্র ক'রেই ঘুরতে লাগল অহর্নিশ। আমার বাবা অনেক দিন আগেই মারা গিয়েছিলেন। আমাদের অভাবের সংসারে মায়ের তো দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। সামান্য পেন্সন যা পেতেন তাই দিয়ে সব খরচই তাঁকে মেটাতে হ'ত। এইসব সাংসারিক বিপর্যয়ের মধ্যে প'ড়ে গিয়ে তিনি আর অন্য কোনো কথা ভাববার সময় পেতেন না। অতএব আমার সঙ্গে তাঁর মানসিক ব্যবধান ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। স্কুলের বন্ধুদের কথা না বলাই ভালো। জ্ঞানলাভের অথবা লেখাপড়ার প্রতি তাদের বিশেষ কিছু আগ্রহ ছিল না। বিকৃত চরিত্রের মেয়ের সংখ্যা ছিল অনেক। এদের সাহচর্য আমাকে পীড়া দিত। কারণ, যে ভালবাসাকে আমি পরম পবিত্র ব'লে ভাবতাম তার প্রতি এদের ছিল চরম অশ্রদ্ধা। এদের মৌল মনোভাব ছিল চপলতাপূর্ণ। ফলে, আমার মানসিক জগৎটা আপনার চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হ'য়ে রইল। এই বয়সের মেয়েদের চিন্তা-ভাবনা সব স্বভাবতই বিক্ষিপ্ত হ'য়ে যায়। আমার কিন্তু তা হ'ল না। আমার মধ্যে এল সুদৃঢ় একাগ্রতা—আমার সমস্ত জীবনের স্বপ্ন আপনাকে কেন্দ্র ক'রে দেহলাভ করল। এমন কোনো কথাই আমি ভাবতে পারতাম না যার সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নেই। আমার এই সামগ্রিক পরিবর্তনের মূলে ছিলেন আপনি। এতকাল পর্যন্ত লেখাপড়ায় আমার তেমন কিছু মনোযোগ ছিল না। ছাত্রী হিসেবে প্রসিদ্ধির অভাব ছিল প্রচুর। হঠাৎ দেখলাম, পরীক্ষায় আমি প্রথম স্থান পেয়ে ব'সে আছি। ইতিমধ্যে আমি লেখাপড়ার মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম। বই আপনার কাছে অত্যন্ত প্রিয় ভেবে নিয়ে আমিও রাত জেগে জেগে বই পড়ছিলাম। আপনি নিশ্চয়ই গানবাজনা ভালবাসেন কল্পনা ক'রে আমিও পিয়ানো বাজাতে শুরু ক'রে দিলাম। এইসব ব্যাপার দেখে মায়ের মনে বিস্ময়ের ধোঁয়া জমল। ছেঁড়া জামাকাপড়গুলো নিজের হাতেই সেলাই ক'রে ফেললাম। কেন করলাম জানেন? আপনার চোখে যাতে কোনো কিছু অসুন্দর না ঠেকে সেইজন্যে। স্কুলে যে জামাটা প'রে যেতাম তাতে একটা চৌকোনা তালি লাগানো ছিল ব'লে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিলাম খুব।

লজ্জা করছিল, হয়তো বা তালি-দেওয়া জায়গাটায় আপনার দৃষ্টি পড়বে। সেই কারণে, সিঁড়ি দিয়ে যাওয়া-আসা করবার সময় ঐ জায়গাটা বই রাখবার ঝুলি দিয়ে ঢেকে রাখতাম। কি বোকাই না ছিলাম আমি! সেই প্রথম দিনের পরে আপনি আর কখনো আমার দিকে চেয়েও দেখেননি।

তা সত্ত্বেও আপনার প্রতীক্ষায় আমার সময় কেটে যেতে লাগল। শুধু প্রতীক্ষা নয়, পর্যবেক্ষণের মাদকতাও ছিল প্রচুর। আমাদের বাইরের দরজায় একটা ফুটো ছিল। তার মধ্যে দিয়ে আপনার দরজাটা দেখতে পেতাম আমি। আমার কথা শুনে হাসছেন কি? আপনার পায়ে পড়ি, হাসবেন না। ঐ ফুটো দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে আপনাকে দেখবার চেষ্টা করতাম ব'লে আমি কিন্তু আজও লজ্জা বোধ করি না। সামনের এই বড় হল্-ঘরটা আমাদের বরফের মতো ঠাণ্ডা হ'য়ে থাকত। মায়ের সন্দেহ উদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর বই হাতে নিয়ে ওখানে ব'সে অপেক্ষা করেছি। আপনার নিকট সান্নিধ্যের ব্যাকুল কল্পনায় আমার স্নায়ুতন্ত্র বেহালার তারের মতো টনটন ক'রে উঠত—চাপা উত্তেজনায় ভেঙে পড়তাম যেন। সত্যি কথা বলতে কি, চব্বিশ ঘণ্টাই আমি আপনার নিকটতম পরিধির মধ্যেই ঘুরে বেড়াতাম। উত্তেজনার বিরতি কখনো অনুভব করিনি। কিন্তু আপনি এ সম্বন্ধে কোনো খবরই রাখতেন না। আপনার পকেটে যে ঘড়িটা আপনার হ'য়ে চব্বিশ ঘণ্টাই সময় নির্দেশ করছে তার মূল কজাটা যেমন সর্বক্ষণই কর্তব্য সম্পাদনে কঠিন টান-পড়া অবস্থায় থাকে আমার অবস্থাও ঠিক সেইরকমই ছিল। আপনি শুনতে পান না বটে, কিন্তু সে তো অবিরাম টিকটিক আওয়াজ ক'রে যাচ্ছে। হয়তো এক লক্ষ আওয়াজের মধ্যে একবার আপনি সময় দেখবার জন্য ঘড়ির দিকে নজর দেন। আমার প্রতি ততটুকুও নজর দিয়েছেন কিনা সন্দেহ। অথচ আমি আপনার সম্বন্ধে সব খবরই রাখতাম। আপনি কি কি ধরনের জামাকাপড় অথবা নেকটাই পরতেন তাও আমি ব'লে দিতে পারি। অনতিবিলম্বে আপনার দর্শনপ্রার্থীদের সঙ্গেও দূর থেকে পরিচিত হ'য়ে গেলাম আমি। তাঁদের মধ্যে যাঁরা আমার পছন্দসই নন, কিংবা যাঁদের আমি পছন্দ করি তেমন বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা অর্জন করতে বিলম্ব হয়নি আমার। তেরো থেকে ষোল বছর পর্যন্ত আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে আপনাকে কেন্দ্র ক'রে।

বোকামি কি কম করেছি ? যে দরজার হাতলটা আপনি হাত দিয়ে ধরেছিলেন সেই হাতলটায় আমি আদরপ্রত্যাশী হ'য়ে মুখ ঠেকিয়েছি। সিগারেট খেয়ে তার শেষ অংশটুকু রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলেন আপনি। অত্যন্ত পবিত্র বস্তু মনে ক'রে সেটা আমি কুড়িয়ে নিয়েছিলাম। সন্ধের পর কত রকমের ছুতো ক'রে আমি বাইরে বেরিয়ে আসতাম বারবার। আমি পরখ ক'রে দেখতাম আপনার কোন্ ঘরটিতে আলো জ্বলছে। তাই থেকে আপনার সঠিক উপস্থিতির প্রমাণ পেতাম। চোখে না দেখতে পেলেও আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে পুরোপুরিভাবে সচেতন হ'য়ে উঠতাম আমি। মাঝে মাঝে আপনি বাইরে চ'লে যেতেন, আমার তখন মনে হ'ত জীবনটা বুঝি শূন্য হ'য়ে গেল। মন-মেজাজ বিগড়ে যেত আমার। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতাম। মায়ের কাছে ধরা পড়বার ভয়ে চোখের জল লুকিয়ে রাখতাম আমি।

আমি জানি এসবই একটি বালিকার উদ্ভট কল্পনা। আমার হয়তো লজ্জিত বোধ করা উচিত। কিন্তু লজ্জা পাওয়ার কারণ তো কিছু দেখি না। কেন লজ্জা পাব ? প্রকৃতপক্ষে সেই সময়েই আমার ভালবাসা ছিল সবচেয়ে অনাবিল এবং সবচেয়ে গভীর। আজকের চেয়ে অনেক বেশি বিশুদ্ধ। আপনার সঙ্গে আমার শুধু চোখের দেখা—অথচ আপনার সঙ্গেই যে আমি বাস করেছি তার কাহিনী বর্ণনা করতে যদি বহুদিনও সময় লাগে তবু আমার অবসাদ আসবে না। কিন্তু খুঁটিনাটি ঘটনা লিখে আপনার বিরক্তি উৎপাদন করবার ইচ্ছা আমার নেই। শুধু সেই সময়কার একটা অতি সুন্দর অভিজ্ঞতার কথা লিখব আপনাকে। আশা করি হেসে ফেলবেন না আপনি। ব্যাপারটা আপনার কাছে খুবই তুচ্ছ মনে হ'তে পারে, কিন্তু আমার কাছে এর গুরুত্বের সীমা নেই।

বোধহয় সেই দিনটা রবিবার ছিল। আপনি বাড়ি ছিলেন না। আপনার ভৃত্যটি দেখলুম খোলা দরজা দিয়ে কয়েকটা ভারি ভারি কম্বল ভেতরে নিয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার করবার জন্য বাইরে নিয়ে এসেছিল। তার একলার পক্ষে সবগুলো কম্বল ব'য়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হচ্ছিল না। মনে মনে শক্তি সঞ্চয় করলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম তাকে, "আমি তোমায় সাহায্য করব কি ?" সে বিস্মিত বোধ করল বটে, কিন্তু আপত্তি করল না। আপনার নিজস্ব রাজ্যটিতে কি গভীর সম্ভ্রম ও সশ্রদ্ধ ভয় মিশ্রিত

৭

মনোভাব নিয়ে প্রবেশ করেছিলাম তা কি আপনি উপলব্ধি করতে পারেন? আপনার জগতের অনেক কিছুই দেখলাম আমি—যে টেবিলে ব'সে লেখাপড়া করেন সেই টেবিল, বই, ছবি এবং নীল রঙের ফুলদানিতে যে ফুল রয়েছে তাও আমার নজরে পড়ল। অবশ্যি যা দেখলুম তা এক পলকের দৃষ্টিতে। আপনার ভৃত্য জনকে যদি সাহস ক'রে বলতে পারতাম তাহ'লে সে যে আমায় সব কিছুই দেখতে দিত তাতে আর সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তার আর দরকার বোধ করলাম না। মুহূর্তের মধ্যেই গোটা পরিবেশটা যেন আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিলে-মিশে গেল এবং আপনাকে কেন্দ্র ক'রে অন্তহীন স্বপ্নের মধ্যে ডুবে থাকবার নতুন প্রেরণা পেলাম আমি।

সময়টা অতি দ্রুত পার হ'যে গিয়েছিল বটে, কিন্তু সেটাই ছিল আমার বাল্যজীবনের সবচেয়ে সুখের মুহূর্ত। সেই মুহূর্তের অনেক কথাই বলতে ইচ্ছে করে--বলবার বাসনা প্রবল। বলতে পারলে আপনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারতেন যে, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় সামান্য হ'লেও আপনার ওপরেই আমার জীবনের সুখ দুঃখ সব নির্ভর করত। তারপর যে ভয়ংকর ব্যাপারটা ঘটেছিল তাও আপনাকে বলতে চাই। আগেই বলেছি যে, আপনার চিন্তার মধ্যেই তন্ময় হ'যে থাকতাম আমি। সেই কারণে অন্যান্য ব্যাপারের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র মনোযোগ কিংবা আগ্রহ ছিল না। মা কি করছেন অথবা কখন কোন্ অতিথি পায়ের ধুলো দিচ্ছেন সে সম্বন্ধে খোঁজ রাখতাম না আমি। আমাদের একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় ইনসব্রাক শহর থেকে এখানে বেড়াতে আসতেন। অনেক দিন পর্যন্ত তাঁর উপস্থিতির কথা আমি জানতেই পারিনি। মাঝে মাঝে তিনি মাকে নিয়ে থিয়েটারে যেতেন ব'লে আমি খুশি হতাম খুব। এই সময়টা নিরুপদ্রবে আপনার কথা চিন্তা করবার সুযোগ পেতাম আমি। এটাই ছিল আমার সর্বোৎকৃষ্ট আনন্দের উৎস। একদিন মা আমায় ডেকে পাঠালেন। তাঁর ভাবভঙ্গিতে বেশ খানিকটা গাম্ভীর্য লক্ষ্য করলুম। তিনি বললেন যে, আমার সঙ্গে তাঁর একটা জরুরী কথা আছে। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল! বুকের মধ্যে শুরু হ'ল ধড়ফড়ানি। তাহ'লে তিনি কি আমায় সন্দেহ করলেন? আমি কি ধরা দিলাম? প্রথমেই আপনার কথা মনে পড়ল আমার। যে গোপন সত্যটির সঙ্গে আমার জীবনের নিবিড় যোগাযোগ তার সমূহ প্রকাশ-সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন

হ'য়ে উঠলাম। কিন্তু দেখলাম মা নিজেই হতবুদ্ধির মতো ব'সে আছেন। মা কখনো আদর ক'রে আমায় চুম্বন করতেন না। এখন তিনি অত্যন্ত স্নেহ সহকারে বারবার চুম্বন করতে লাগলেন। আমায় টেনে নিয়ে নিজের পাশেই বসিয়ে দিলেন। তারপর লজ্জাজড়িত কণ্ঠে, থেমে থেমে আমায় বলতে লাগলেন যে, দূর সম্পর্কের আত্মীয়টি তাঁর কাছে বিয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন। আত্মীয়টি মৃতদার। এবং আমার কথা ভেবেই মা নাকি তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন। বিশ্বাস করুন, তখনো শুধু আপনার চিন্তায়ই মনপ্রাণ আমার ভরপুর হ'য়ে ছিল। ভয়ে ভয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আমরা এখানে থাকব তো? মানে, এই বাড়িতে?"

"না—আমরা ইনস্‌ব্রাকে চ'লে যাব। সেখানে ফার্ডিনান্ড-এর সুন্দর একটা বাড়ি আছে।" জবাব দিলেন মা। চোখে আমি অন্ধকার দেখতে লাগলাম। পরে শুনেছিলাম, অজ্ঞান হ'য়ে মাটিতে প'ড়ে গিয়েছিলাম আমি। কি অবস্থায় যে কয়েকটা দিন আমার কেটে গেল তা আর আপনাকে লিখে বোঝাতে পারব না। অভিভাবকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম আমি। কিন্তু আমার মতো অসহায় একটি ছোট্ট মেয়ের ব্যর্থ প্রতিবাদের ইতিবৃত্ত শুনেও তো আপনি তার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন না। সেদিনের সেই পুরনো স্মৃতিটা মনে পড়তেই আজও আমার হাত কেঁপে ওঠে। লেখাগুলো সব আঁকাবাঁকা হ'য়ে যায়। গোপন কথাটা খুলে বলতে পারলাম না ব'লে সবাই ভাবলেন যে, আমার এই জোর আপত্তির মূলে রয়েছে আমার বদমেজাজ। স্থান পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সত্যিই কোনো যুক্তি নেই। আমার মতামত জানবার জন্য আর কেউ চেষ্টা করলেন না। আমার অজ্ঞাতসারেই তাঁরা স্থানত্যাগের বন্দোবস্ত ক'রে ফেললেন। ইস্কুল থেকে ফিরে এসে প্রত্যেকদিনই দেখতাম, কোনো-না-কোনো জিনিস হয় সরিয়ে ফেলা হয়েছে, নয়তো বিক্রি ক'রে দিয়েছেন। মনে হ'ল, আমার জীবনটা বুঝি ভেঙে-চুরে টুকরো টুকরো হ'য়ে যাচ্ছে। একদিন যখন খেতে এলাম তখন দেখলাম ফ্ল্যাটে আর আসবাব কিছু নেই। সবই সরিয়ে নেওয়া হ'য়ে গেছে। শূন্য ঘরগুলিতে প'ড়ে রয়েছে ক'টা বাক্স—আর দুটো খাটিয়া। আর মাত্র একটা রাত এখানে আমাদের কাটাতে হবে। তারপর চ'লে যাব ইনস্‌ব্রাকে।

শেষের দিনটাতে হঠাৎ আমি স্থির ক'রে বসলাম যে, আপনার কাছাকাছি

আমায় থাকতেই হবে। নইলে আমি বাঁচব না। আপনাকে বাদ দিয়ে আমার পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব। কি যে ভাবছিলাম তখন মনে নেই। শুধু স্মরণ হয়, মা বাড়ি ছিলেন না। ইস্কুলের জামাকাপড় প'রেই আমি গিয়ে আপনার দরজার সামনে দাঁড়ালাম। তবুও ভাবতে পারছিলাম না যে, সত্যি সত্যি ওখান পর্যন্ত আমি হেঁটে যেতে পেরেছি। সমস্ত হাতপা যেন পাথরের মতো ভারি হ'য়ে গিয়েছিল—গ্রন্থিগুলিতে মৃদু কম্পন। তা সত্ত্বেও মনে হ'ল, আমি যেন একটা চুম্বকের আকর্ষণে ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল আপনার পায়ের কাছে গিয়ে লুটিয়ে প'ড়ে আপনাকে অনুরোধ করি, "আপনি আমায় যেতে দেবেন না— আপনার দাসী ক'রে আমায় রেখে দিন।" বলতে পারলাম না, ভয় পেলাম এই ভেবে যে, আপনি হয়তো পনরো বছর বয়সের মেয়েটিকে মোহাচ্ছন্ন মনে ক'রে হেসে উঠবেন। কিন্তু আপনি যদি উপলব্ধি করতে পারতেন যে, পরিস্থিতির ভয়াবহতা সত্ত্বেও আমি কেমন ক'রে সেই ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিলাম তাহ'লে আপনি নিশ্চয়ই ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারতেন না। আশঙ্কার অন্ত ছিল না, তবুও আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য হ'য়ে উঠেছিল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে সংগ্রাম করতে লাগলাম। কয়েক সেকেণ্ডের ব্যাপার, তবুও মনে হ'ল যেন অনন্তকাল ধ'রে সংগ্রাম ক'রে চলেছি। শেষ পর্যন্ত ঘণ্টা টিপলাম আমি। আজও সেই ঘণ্টার কর্কশ ধ্বনিটা আমার কানের পর্দায় লেগে রয়েছে। ঘণ্টা টিপলাম বটে, কিন্তু ভেতর থেকে কোনো সাড়া পেলাম না। কয়েক মুহূর্তের নৈঃশব্দ্য। ঐ ক'টি মুহূর্তের মধ্যে মনে হ'ল, বুকের স্পন্দন থেমে গিয়েছে, দেহের রক্ত সব জ'মে গেল বুঝি। এই অবস্থায় আপনার আগমন প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

কিন্তু আপনি এলেন না। আমার ডাক শুনতে পেল না কেউ। আপনি নিশ্চয়ই বাড়ি ছিলেন না। জনও বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিল। ঘণ্টার কর্কশ ধ্বনিটা তখনো যেন কানে বাজছিল, আমি আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। পা টিপে টিপে ফিরে এলাম আমাদের শূন্য ঘরে। একটা কম্বলের ওপর শুয়ে পড়লাম। খুবই পরিশ্রান্ত বোধ করছিলাম। আমাদের ঘর থেকে আপনার দরজা পর্যন্ত কতটুকুই বা পথ? কয়েক পা মাত্র। তবুও ঐটুকু পথ

অতিক্রম করবার পর মনে হ'ল আমি বুঝি কয়েক ঘণ্টা ধ'রে বরফের মধ্য দিয়ে পথ হেঁটে এখানে এসে উপস্থিত হলাম। এত শ্রান্তির পরেও মনের বাসনা আমার লুপ্ত হ'ল না। এখান থেকে আমায় সরিয়ে নেওয়ার আগে আপনার সঙ্গে একবার দেখা করবার এবং কথা বলবার সংকল্প আমার প্রবল হ'য়ে রইল। আপনি যেন ভাববেন না যে, আমার এই দেখা করবার মূলে দৈহিক আকাঙ্ক্ষার প্ররোচনা ছিল। বিশ্বাস করুন, এতটুকুও না। দেহের ব্যাপারে আমি তখনো অজ্ঞ ছিলাম। নেহাত ছেলেমানুষ ব'লেই ওসব প্রশ্ন তখনো আমাকে কৌতূহলী করেনি। আমি শুধু চেয়েছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করব একবার এবং আপনার সান্নিধ্য থেকে যাতে স'রে যেতে না হয় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টাও করব। সেই ভয়ংকর রাত্রিটার কথা আজও মনে পড়ে। সারাটা রাত আপনার আগমন প্রতীক্ষায় জেগে রইলাম। মা ঘুমতে চ'লে যাওয়ার পরেই আমি এসে আমাদের বাইরের ঘরে ব'সে রইলাম। আপনার পায়ের আওয়াজ শোনবার জন্য সতর্কভাবে কান পেতে রাখলাম আমি। কী ঠাণ্ডাই না পড়েছিল জানুয়ারী মাসের সেই রাতটায়! আসবাব মতো একখানা চেয়ার পর্যন্ত ছিল না ঘরে। মেঝেতে ব'সে পড়লাম আমি। দরজার ফাঁক দিয়ে দমক দমক বাতাস ঢুকছে—হিমশীতল ঠাণ্ডা বাতাস। তার ওপরে গায়ে আমার পাতলা কাপড়ের জামা—অবিশ্যি ইচ্ছে ক'রেই মোটা কাপড়ের জামা আমি পরিনি। কেন পরিনি জানেন? গরম বোধ করলেই যদি ঘুমিয়ে পড়ি। আর ঘুমিয়ে পড়লে যদি আপনার পায়ের আওয়াজ শুনতে না পাই! ঐ অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে ব'সে ব'সে পায়ে যখন আমার খিল ধ'রে যাচ্ছে তখন আমি উঠে দাঁড়াচ্ছি। বসছি, আবার উঠছি— এমনি ভাবে কতবার ওঠা-বসা করলুম। তবুও আপনার অপেক্ষায় প্রহর গুনতে দ্বিধা করলুম না আমি। কেন করব? আপনার ওপর যে আমার ভবিষ্যতের সুখশান্তি সব কিছু নির্ভর করছিল।

যতদূর মনে পড়ে বোধহয় রাত তখন দুটো কি তিনটে হবে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেলাম। দরজা খোলার আওয়াজও হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে শরীর থেকে ঠাণ্ডা ভাবটা গেল লোপ পেয়ে। গরম বোধ করতে লাগলাম। খুব ধীরে ধীরে দরজা খুললাম। ভেবেছিলাম, আপনার পায়ে লুটিয়ে পড়ব· ·উত্তেজনার মুখে কি যে করতাম বলতে পারি না। পায়ের শব্দ ক্রমশই কাছে এগিয়ে

আসছে। মোমবাতির আলোটা একটু কেঁপে উঠল। সন্ত্রস্ত হ'য়ে দরজার হাতলটা চেপে ধরলাম আমি। হাত কাঁপছিল আমার। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, সত্যিই কি সিঁড়ি দিয়ে আপনি উঠে আসছেন?

হ্যাঁ, আপনিই। কিন্তু আপনি একা ছিলেন না। মৃদু হাসির আওয়াজ পেলাম। সিল্কের কাপড়ের খসখস শব্দ এল কানে। অনুচ্চ কণ্ঠে কথা বলছেন আপনি তাও শুনলাম আমি। আপনার সঙ্গে একজন মহিলা ছিলেন ···

বাকী রাতটা যে কি অবস্থায় কাটল আমার আপনাকে তা বোঝাতে পারব না। পরের দিন বেলা আটটার সময় ওরা আমায় সঙ্গে নিয়ে রওনা হ'য়ে গেলেন ইনস্‌ব্রাকের দিকে। বাধা দেওয়ার মতো আর আমার এক বিন্দু শক্তি ছিল না।

আমার ছেলেটি গত রাত্রে মারা গিয়েছে। আমি যদি বেঁচে থাকি তা'হলে আবার আমায় একাকী, নিঃসঙ্গ হ'য়ে জীবন যাপন ক'রতে হবে। আগামী কাল শবাধার নিয়ে কালো কাপড় প'রে কতকগুলি অচেনা লোক এসে উপস্থিত হবে। আমার ছেলেকে কবর দেবে ওরা। হয়তো ফুল নিয়ে কোনো কোনো বন্ধুও আসবেন—কিন্তু শবাধারের ওপর ফুলের স্তূপ সাজিয়ে দিয়ে লাভ কি? আমাকে হয়তো এঁরা সান্ত্বনার কথাও শোনাবেন। শুধু কথা, কথা আর কথা! কথা শুনে আমার কি উপকার হবে? আমি ভালো ক'রেই জানি শেষ পর্যন্ত আমার নিঃসঙ্গতাই হবে একমাত্র পথের সম্বল। মানুষের মধ্যে বাস ক'রেও নিঃসঙ্গ বোধ করার মতো ভয়াবহ ব্যাপার সংসারে আর কি আছে। কিছুই যে নেই তেমন অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছিলাম ইনস্‌ব্রাকে গিয়ে। ষোল থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত বন্দী হ'য়ে রইলাম সেখানে। সমাজ-সংসারের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রইল না—দু'টা বছর যেন আর শেষ হ'তে চায় না। আমার মায়ের সঙ্গে যাঁর বিয়ে হ'ল তিনি অত্যন্ত শান্ত এবং নীরব প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। আমার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র বিরূপতা ছিল না। বরং সদয় ছিলেন বললেই সত্য বলা হবে। একটা অনিচ্ছাকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার মনোভাব দ্বারা উৎপীড়িত হ'য়ে মা আমার সব রকমের আবদার মিটিয়ে দিতে চাইতেন বটে, কিন্তু আমি তাঁদের

কাছ থেকে কোনো অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করতাম না। ক্রুদ্ধ হ'য়ে সব কিছু প্রত্যাহার করেছি। আপনার সান্নিধ্য থেকে বিচ্যুত হ'য়ে আমি কখনো সুখের প্রত্যাশা করিনি। অতএব অন্ধকারময় এক আত্ম-পীড়নের নির্জন জগতে বাস করা ছাড়া আমার আর উপায় রইল না। নতুন নতুন রং-বেরং-এর জামাকাপড় ওঁরা আমায় কিনে দিতে লাগলেন। আমি তাতে হাত দিতাম না কখনো। থিয়েটারে কিংবা অন্যান্য আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেওয়ার জন্য তাঁরা আমায় অনুরোধ করতেন বটে, কিন্তু আমি তাঁদের সব অনুরোধই উপেক্ষা করতাম। কদাচিৎ কখনো বাড়ির বাইরে বেরুতাম। শুনলে আপনি বিশ্বাস করবেন না যে, দু' বছর ইনস্‌ব্রাকে বাস করবার পরেও এই ছোট্ট শহরটার গোটা বারো রাস্তাও আমি ভালো ক'রে চিনতাম না। বিচ্ছেদের বিরহানলে দ'গ্ধে দ'গ্ধে মরাই ছিল আমার চরম আনন্দ। কোনো সামাজিক সম্পর্ক রাখিনি, উৎসব-আনন্দেও যোগ দিতাম না। আপনাকে না দেখার দুঃখ ভুলে থাকবার জন্য কৃচ্ছ্র‌সাধনের মাদকতায় ডুবে থাকতাম আমি। আমার সেই ছেলেবেলাকার বছরগুলি চোখের সামনে ভেসে উঠত। আপনাকে কেন্দ্র ক'রে যেসব ছোটখাট তুচ্ছ ঘটনা ঘ'টে গিয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তিতে মন আমার ভরপুর হ'য়ে থাকত। একা একা ঘরে ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন শুধু সেই অতীত স্মৃতির মধ্যে মগ্ন হ'য়ে থাকাই ছিল আমার একমাত্র কাজ। ঘটনাগুলো আমার জীবনের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, পুরনো ব'লে মনেই হ'ত না। বরং ভাবতাম যে, ঘটনাগুলো বুঝি গতকাল ঘটেছে।

সুতরাং এ কথা আপনি এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, আমার জীবনটা সম্পূর্ণভাবে আপনার ওপরই নির্ভর করছিল। আপনার লেখা বই প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি কিনে ফেলতাম। খবরের কাগজে যেদিন আপনার নাম বেরুত সেই দিনটা আমার মনে বিশেষভাবে চিহ্নিত ও স্মরণীয় হ'য়ে থাকত। আপনি কি বিশ্বাস করবেন আমি যদি বলি যে, আপনার প্রত্যেকটা বই আমার মুখস্থ? আজ তেরো বছর পরেও কেউ যদি আমায় মাঝরাত্রে ঘুম থেকে তুলে আপনার বই থেকে যে-কোনো একটা বিচ্ছিন্ন লাইন উদ্ধৃত ক'রে শোনায়, তাহ'লে সেই লাইনটার পরবর্তী অংশটা আমি অবলীলাক্রমে আবৃত্তি ক'রে যেতে পারি। আপনার প্রত্যেকটা কথাই ছিল

আমার কাছে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের মতো পবিত্র। খবরের কাগজে ভিয়েনার নতুন নতুন কনসার্টের বিবরণ প'ড়ে ভাবতুম এর মধ্যে কোন্‌টা আপনার সবচেয়ে ভালো লেগেছে। সন্ধে হ'লে কল্পনায় আমি চ'লে যেতাম আপনার কাছে। নিজের মনে মনে বলতাম, "এখন তিনি কনসার্টের প্রেক্ষাগারে প্রবেশ করলেন, এবার নিজের আসনে ব'সে পড়লেন।" একবার আপনাকে কনসার্টে যেতে দেখেছিলাম ব'লে আমার কল্পনা এমন উদ্ভট স্তবে গিয়ে পৌঁছত।

এইসব ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করার প্রয়োজন কি আমার? একটি পরিত্যক্ত বালিকার মর্মান্তিক আশাভঙ্গের কাহিনী লিখে লাভ কি? আর আপনাকেই বা লিখছি কেন? আপনি তো আমার ভালবাসার কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভেবে দেখেননি। দুঃখের কথাই বা জানলেন কই? কিন্তু আমি তো সতেরো কিংবা আঠারো বছর বয়সে বালিকা ছিলাম না। রাস্তায় বেরুলে ছেলেরা আমার দিকে দৃষ্টি দিত। তাতে আমি ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠতাম। আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসা, এমন কি ভালবাসার কথা মনে আনাও পাপ মনে করতাম আমি। আপনার প্রতি আমার ভালবাসার গভীরতা একই রকম রইল বটে, কিন্তু তার মধ্যে মস্ত বড় একটা পরিবর্তন এল। পরিবর্তনটা দৈহিক। আমার মধ্যে সৃষ্টি হ'ল আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ। আমি আর কিশোরী নই, যুবতী। আপনার হাতেই নিজেকে সমর্পণ ক'রে দিতে চাইলাম আমি।

আমার বন্ধুবান্ধবরা সবাই আমাকে ভীরু এবং লাজুক প্রকৃতির ব'লে জানত। কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। কিন্তু আমার উদ্দেশ্যের মধ্যে দৃঢ়তা ছিল। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে আমি শুধু চেয়ে ছিলাম ভিয়েনার দিকে—আপনার কাছে ফিরে যাওয়াই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। ওঁদের কাছে যতই যুক্তিবিরুদ্ধ এবং অবোধ্য ব'লে মনে হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত আমার পথ রুখে ওঁরা আর দাঁড়াতে পারলেন না। আমার সৎবাপের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। আমাকে তিনি নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসতেন। আমার ভিয়েনা যাওয়াই স্থির হ'ল। সেখানে গিয়ে নিজে আমি রোজগার করব—কারো কাছ থেকে অর্থসাহায্য নেব না ব'লে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে রইলাম। আমার প্রস্তাব তিনি অনুমোদন করলেন। তাঁরই এক আত্মীয়ের জামাকাপড় প্রস্তুতের কারখানা ছিল ভিয়েনায়। সেখানে আমার একটা চাকরিও জুটে গেল।

সত্যি সত্যি শরৎকালের এক কুয়াশাচ্ছন্ন সন্ধেবেলায় আমি গিয়ে উপস্থিত হলাম ভিয়েনায়। আপনি কি অনুমান করতে পারেন সর্বপ্রথম কোন্ দিকে আমি পা বাড়ালাম? আমার লক্ষ্য যে কোন্ দিকে ছিল তা কি আপনাকে বলবার দরকার আছে? তাহ'লে শুনুন। রেল-স্টেশনের যে-ঘরে যাত্রীরা মালপত্র রাখে সেখানে আমার বাক্সটা জিম্মা ক'রে দিয়ে ট্রামে চেপে বসলাম আমি। কী ধীরে ধীরেই না ট্রামটা চলছে! প্রত্যেকটা স্টপেজে যখন থামে তখন আমার বিরক্তির আর সীমা থাকে না। যাই হোক সেই পুরনো বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। আপনার ঘরে আলো জ্বলছিল। তাই দেখে আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে উঠলাম। যে শহরতলিটা এতক্ষণ বিষাদমগ্ন ও বিদেশের মতো মনে হচ্ছিল, সহসা সেটা জীবন্ত হ'য়ে উঠল। আমি নিজেও প্রাণচঞ্চল হ'য়ে উঠলাম। জীবন্মৃত অবস্থায় বেঁচে থাকবার আর দরকার নেই। আপনার কাছে পৌঁছে গেছি আমি। আমার সারা জীবনের স্বপ্নাচ্ছাদিত বাস্তব আপনি।

আপনার ঘরে আলো জ্বলছিল। শার্সির কাচের ওপর আলোর ছটা প্রতিফলিত হয়েছে। আমার আগ্রহাকুল দৃষ্টি আর আপনার মধ্যে শুধু ঐ পাতলা কাচখানার ব্যবধান—যদিও জানি, প্রকৃতপক্ষে আপনার মন থেকে আমি অনেক দূরে, ব্যবধান দুস্তর। আমার আর আপনার মধ্যে আকাশচুম্বী পর্বতের মতো কঠিন বাস্তব খাড়া হ'য়ে আছে। কিন্তু তেমন বাস্তবটিকেও অগ্রাহ্য করলাম আমি। উচ্ছ্বাসময় চেতনায় চরম সান্ত্বনা, প্রেমাস্পদের সান্নিধ্যলাভে সক্ষম হয়েছি আমি। আপনার জানালার দিকে যে তাকিয়ে থাকতে পারছি তাই তো আমার পক্ষে যথেষ্ট। ঘরে আপনার আলো জ্বলছে, আপনি ওখানে বাস করেন, আপনি ওখানে উপস্থিত আছেন—এই নিয়েই তো আমার জগৎটি তৈরি হয়েছে। গত দু' বছর ধ'রে এই মুহূর্তটার জন্যই তো তপস্যা করেছি। স্বপ্ন দেখেছি কবে পাব, কখন পাব, কেমন ক'রে পাব আমার প্রেমাস্পদের সঙ্গসুখ—এই তো সেই দুর্লভ মুহূর্তটা, এই তো সেই তপস্যার চরম সিদ্ধি! মাথার ওপরে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, সন্ধ্যার আবহাওয়া উষ্ণ—জানালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। কতক্ষণ, কত রাত পর্যন্ত সতৃষ্ণ দৃষ্টি আমার প্রসারিত ছিল জানি না। তারপর একসময়ে ঘরের আলোটা গেল নিবে। নিজের বাসস্থানে ফিরে গেলাম আমি।

এমনি ক'রে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় ঐ একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে থাকতাম।······

সন্ধে ছ'টা পর্যন্ত কাজ করতে হ'ত আমায়। মেহনতের কাজ তাতে আর সন্দেহ ছিল না। তবুও এমন কাজই আমি পছন্দ করলাম। দোকান-ঘরে হৈ-হল্লা চলত সারা দিন। ভালো লাগত আমার। অন্তরের অশান্তি তাতে চাপা পড়ত। যেই মুহূর্তে দোকানের দরজা বন্ধ হ'ত তক্ষুনি ছুটে চ'লে আসতাম আমার এই প্রিয় স্থানটিতে। লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম, কখন আপনার সঙ্গে একবারটি দেখা হ'য়ে যাবে—কখন···কখন একবারটি দেখতে পাব ঐ মুখ। দূরে দাঁড়িয়েই যদি চোখ দিয়ে গ্রাস করতে পারতাম আপনাকে! দুধের বদলে ঘোলের স্বাদেই যদি ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় তো হোক।

এক সপ্তাহ পরে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমার। আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম! আমি যখন তন্ময় হ'য়ে আপনার জানালার দিকে তাকিয়ে ছিলাম আপনি তখন রাস্তা পার হ'য়ে আসছিলেন। এক মুহূর্তের মধ্যেই আমি যেন তেরো বছরের বালিকায় রূপান্তরিত হ'য়ে গেলাম। গাল দুটো আমার লাল হয়ে উঠল। বুভুক্ষুর মতো আপনার সাক্ষাৎ আমি কামনা করছিলাম বটে, কিন্তু আপনাকে দেখবামাত্র হনহন ক'রে হেঁটে আমি চ'লে গেলাম দূরে—যেন আমাকে কেউ পেছন থেকে তাড়া করেছে। পরে অবিশ্যি নিজের এই ব্যবহারে লজ্জিত বোধ করেছি। স্কুলের মেয়ের মতো অমনি ক'রে আমার পালিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি। এখন আমি বুঝতে পারছি কেন আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম আপনি আমাকে চিনবেন। এতগুলি বছরের ক্লান্তিকর অপেক্ষার পর আপনার ভালবাসার নিবিড় নৈকট্য অনুভব করতে চেয়েছিলাম আমি।

প্রতি রাত্রেই আমি আপনার বাড়ির বাইরে সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। ভিয়েনার শীত সহ্য করেছি, বরফ পড়েছে তাতেও আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। ঠাণ্ডা কনকনে হাওয়া বইছে, তবুও আমার অপেক্ষার তন্ময়তা ভঙ্গ হয়নি। কতদিন এমনিভাবে পার হ'য়ে গেল, আপনার দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করতে পারলাম না। মাঝে মাঝে দেখতাম, বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আপনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। একটি মহিলার হাত ধ'রে আপনাকে একদিন বেড়াতেও দেখেছি। বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠল আমার। আগে তো আমি

কতবার আপনার ফ্ল্যাটে মেয়েদের ঢুকতে দেখেছি। আমার তাতে ভাব-বৈলক্ষণ্য ঘটত না। কিন্তু এখন একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে আপনার এই ঘনিষ্ঠতায় আমার মন উঠল বিষিয়ে। আপনাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও প্রবল হ'য়ে উঠল। আত্মাভিমানে জর্জরিত হ'য়ে একদিন আমি আর এলুম না। আমার এই বিরোধিতা ও আত্মত্যাগের ফলে সেই সন্ধ্যাটা কী শূন্যই না মনে হয়েছিল। পরের দিন অবিশ্যি যথারীতি আবার এসে দাঁড়িয়ে পড়লাম নিজের জায়গায়। জানালার দিকে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আপনার আবদ্ধ-জীবনের বাইরে দাঁড়িয়ে এতকাল যেমন অপেক্ষা ক'রে এসেছি আজও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

একদিন আমার ওপর দৃষ্টি পড়ল আপনার। দূর থেকেই আপনাকে দেখতে পেয়েছিলাম আমি। আপনার দৃষ্টিপথ থেকে যাতে স'রে না যাই তার জন্য মনে মনে প্রবলভাবে যুদ্ধ করতে লাগলাম। ঠিক সেই সময় একটা ঠেলাগাড়ি এসে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে পড়ল। অতএব আমার পাশ দিয়ে ছাড়া আপনার আর অন্য পথ ধরবার উপায় রইল না। আপনি আমায় দেখতে পেলেন। আমি যে আপনার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলাম তা আপনার নজরে পড়ল না। মেয়েদের দিকে ঠিক যেমনভাবে তাকিয়ে থাকবার আপনার অভ্যাস, আমাকে দেখবামাত্রই আপনার চোখে আজও সেই ভাবটা ফুটে উঠতে বিলম্ব হ'ল না। অতীত স্মৃতিটা বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো মনের মধ্যে খেলে গেল আমার। সেই দৃষ্টি, যার মধ্যে লুকিয়ে থাকত অপরিমিত আদর আর অপ্রতিরোধ্য প্রলোভন। আপনার এই দৃষ্টির ছোঁয়াচ লেগেই তো কয়েক বছর আগে আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল নারীত্ববোধ—ভালবাসতে শিখেছিলাম আমি।

সেই প্রলুব্ধকর দৃষ্টিতে আমার দিকে আপনি তাকিয়ে রইলেন দু'এক মুহূর্তের জন্য—আমি নিজেও অন্য দিকে চোখ ফেরাতে পারলাম না। তারপর আপনি রাস্তা পার হ'য়ে চলে গেলেন। বুকের মধ্যে এত জোরে জোরে আওয়াজ হচ্ছিল যে, আমার চলার গতি গেল ক'মে। দ্রুত গতিতে হাঁটা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠল। কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিলাম না, পেছন ফিরে দেখলাম, আপনি আমার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন। আপনার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির ভাবভঙ্গি দেখে নিঃসন্দেহ হলাম যে, আপনি আমায়

চিনতে পারেননি। তখন এবং পরেও আমায় আপনি চিনতে পারেননি। আমার নৈরাশ্যের সুগভীর যন্ত্রণা কেমন ক'রে বোঝাব আপনাকে? এই ধরনের নৈরাশ্যের অভিজ্ঞতা এই আমার প্রথম। আমার মরণের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি আপনার কাছে অজ্ঞাতই র'য়ে যাব। আমার এই নিদারুণ হতাশার কথা কেমন ক'রে হৃদয়ঙ্গম করবেন আপনি? ইনস্‌ব্রাকে যতদিন ছিলাম আপনাকে আমি প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করেছি। আপনার সঙ্গে ভিয়েনায় একদিন দেখা হবে সেই কথা ভেবে কতরকমের কল্পনার জাল বুনেছি আমি। কখনো উদ্ভট, কখনো পরমানন্দময় কল্পনায় বিভোর হ'য়ে থাকতাম। মন যখন বিষণ্ণতায় ছেয়ে যেত তখন ভাবতাম আপনি আমায় প্রত্যাখ্যান করবেন। কাকুতি-মিনতি দ্বারা আপনাকে আমি উত্যক্ত করছি ব'লে অথবা আমার গ্রাম্য সরলতার প্রমাণ পেয়ে আপনি আমায় অবজ্ঞা করবেন ব'লেও ভাবতাম আমি। মানুষের পক্ষে যতরকমের অপ্রিয় ব্যবহার অথবা উপেক্ষা প্রদর্শন করা সম্ভব তাও আমি কল্পনা করতে বাকী রাখিনি। কিন্তু আপনি আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারে পুরোপুরি অজ্ঞ থেমন কথা উদ্ভটতম কল্পনাতেও অনুমান করা অসম্ভব ছিল। এখন আমি বুঝতে পেরেছি (অবিশ্যি আপনার কাছ থেকেই শিখেছি!) যে, পুরুষমানুষের চোখে মেয়েদের চেহারা দীর্ঘদিন ধ'রে যদি একই রকম থাকে তাহ'লে তাদের ভালো লাগে না, ঘন ঘন পরিবর্তন হওয়া চাই। আয়নায় প্রতিফলিত ক্ষণস্থায়ী প্রতিবিম্বের মতো এও একটা পুরুষের সাময়িক মানসিক অবস্থা। পুরুষমানুষরা অতি সহজেই মেয়েদের মুখ ভুলে যায়। কারণ, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের চেহারাও যায় বদলে। তা ছাড়া মনে না রাখবার আরও একটা কারণ আছে। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সাজসজ্জা করে ব'লেও মেয়েদের মুখ নিত্যপরিবর্তনশীল হ'য়ে ওঠে। পুরুষদের এই চপল মনোভাবের সত্যটি সম্বন্ধে মেয়েরা যখন পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হ'য়ে ওঠে তখন তাদের হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। কিন্তু আমার তো তখনও বয়স কম, অতএব আপনার এই বিস্মৃতির অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। আপনাকে দেখবার পর থেকেই আমার মনে আপনার মূর্তিটি চিরদিনের জন্য আঁকা হ'য়ে গিয়েছিল, এক মুহূর্তের জন্যও তা অস্পষ্ট হয়নি। এই কারণেই আমি অলীক কল্পনায় বিভোর হ'য়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম যে, আপনিও নিশ্চয়ই চব্বিশ ঘণ্টা আমার

কথাই ভাবছেন এবং অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন কবে আমার সঙ্গে দেখা হবে। আমি যে আপনার কেউ নই এবং আপনার কাছে যে আমি সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত এই সত্য যদি প্রথমেই আমার মনে উদ্ঘাটিত হ'ত তাহ'লে এতদিন আমি বেঁচে থাকতাম কি ক'রে? আপনার সেদিনের সেই সন্ধে-বেলার দৃষ্টি থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আপনার জীবনে আমি বিন্দু-মাত্র রেখাপাত করতে পারিনি এবং আমাদের উভয়ের মধ্যে যে বন্ধনের বজ্রটি একেবারে আলগা তাও আমি উপলব্ধি করেছিলাম। সেইদিনই আমি প্রথম বাস্তবের মুখোমুখি হ'য়ে দাড়ালাম। এই থেকে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে সর্বপ্রথম সচেতন হ'য়ে উঠলাম আমি।

আপনি আমায় চিনতে পারলেন না। দু'দিন পর আবার আমাদের সেই রাস্তার পাশেই দেখা হয়ে গেল। এবার আপনার দৃষ্টিতে অন্তরঙ্গতার আভাস ফুটে উঠল। হঠাৎ এই অন্তরঙ্গতার অভিব্যক্তি কেন? যে মেয়েটি এত দীর্ঘদিন ধ'রে সঙ্গোপনে ব'সে আপনাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে এসেছে এ কি তার সেই নিষ্ঠাবন্ত স্বীকৃতি? একেবারেই না। আঠারো বছর বয়সের একটি সুন্দরী মেয়েকে দু'দিন আগে ঠিক ঐ জায়গাতেই দেখেছিলেন ব'লে আজও আপনি তার দিকে শুধু একবার তাকিয়ে দেখলেন। আপনার ভাবভঙ্গিতে বন্ধুভাবাপন্ন বিস্ময় ফুটে উঠেছিল—আমি দেখলাম, আপনার মুখে মৃদু হাসির হিল্লোল। অন্য দিনের মতো আজও আপনি খানিকটা দূর এগিয়ে গিয়ে চলার গতি দিলেন কমিয়ে। উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলাম আমি। উল্লাসের আতিশয্যে ভেঙে পড়বার উপক্রম! সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলাম আপনি এসে আমার সঙ্গে কথা বলবেন ব'লে। এই আমি প্রথম অনুভব করলাম, আমি আর কল্পনার রাজ্যে বাস করছি না. বহু-প্রতীক্ষিত প্রেমাস্পদের সন্নিকটে দাঁড়িয়ে বাস্তবের স্বাদ পাচ্ছি যেন। আমিও ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম, আপনাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলাম না। মনে হ'ল, হঠাৎ আপনি আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মুখ না ঘুরিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম এবার আপনি সোজাসুজি আমায় ডাকবেন—ডেকে কথা বলবেন। প্রিয়তমের কণ্ঠস্বর শোনবার আকাঙ্ক্ষায় অস্থির হ'য়ে উঠলাম। আকাঙ্ক্ষার প্রাবল্যে সারা শরীর প্রায় অবশ হ'য়ে এল। বুকের মধ্যে এত জোরে জোরে আওয়াজ হ'তে লাগল যে, আমি ভাবলাম আর বোধহয়

হাঁটতে পারব না। আপনি আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। এমন ঘনিষ্ঠভাবে কথা বললেন আমার সঙ্গে যেন আমাদের পরিচয় অনেক দিনের। অথচ আমি তো জানি আপনি আমায় চেনেন না। আমার জীবনের কোনো ঘটনাই আপনার জানা নেই। আপনার ব্যবহার এত সুন্দর ও সরল ব'লে মনে হ'ল যে, প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলাম না। সেই পথ ধ'রে আমরা পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। আপনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, একসঙ্গে ব'সে রাত্রের খাওয়া খেতে আমার আপত্তি আছে কি না। বললাম, আপত্তি নেই। আপনার সঙ্গলাভের জন্য এতকাল অপেক্ষা ক'রে আছি, অতএব আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে?

ছোট্ট একটা রেস্তরায় খেতে বসলাম আমরা। আপনার অবিশ্যি সেই জায়গাটার কথা মনে নেই। মনে থাকা সম্ভব নয়। ওরকম শত সহস্র রেস্তরাঁয় বিভিন্ন মেয়েদের নিয়ে আপনি যাওয়া-আসা করেছেন। সুতরাং আজকের এই বিশেষ একটা রেস্তরাঁর কথা মনে ক'রে রাখবেন কেন? আমাকে নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে নিয়ে এলেন বটে, কিন্তু আমি জানতাম এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করার মতো বাতুলতা সংসারে আর কিছু নেই। হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে আমিও একজন—আমাকেও আপনি ভুলে যাবেন অনতিবিলম্বে। মনে ক'রে রাখবার মতো এমন কি ঘটেছিল সেই সন্ধ্যায়? কিছুই না। মুখ দিয়ে কথা বেরুতে চায়নি আমার। আপনার সান্নিধ্যলাভে এত বেশি উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছিলাম যে, বাজে কথা ব'লে সময়ের অপব্যবহার করতে চাইনি আমি। ঐটুকু সুযোগের জন্য আজও আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এতগুলো বছর পরেও কৃতজ্ঞচিত্তে সেই সন্ধ্যাটার কথা স্মরণ করি—পরের মন বুঝে চলবার দক্ষতা যে আপনার অসীম তাতে আর সন্দেহ নেই। আপনার আচার-ব্যবহারের মধ্যে তার প্রমাণ পেতে দেরি হ'ল না। আমার প্রতি আগ্রহ অথবা আদর প্রকাশের জন্য অসংগতভাবে ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেননি আপনি। তবুও আপনার মধ্যে এমন একটা সহৃদয় মনোভাবের স্পর্শ পেলুম যার ফলে যে-কোনো নতুন পরিচিতার পক্ষেও আত্মসমর্পণ করা অসম্ভব হ'ত না। তার মনটিকে আপনি সহজেই কেড়ে নিতে পারতেন। আমার পাঁচ বছরের প্রতীক্ষা সফল হ'ল। এই সফলতার তৃপ্তি যে আমাকে কি গভীর আনন্দ দিয়েছিল তা কি আপনি উপলব্ধি করতে পারেন?

বেশ রাত হ'য়ে গিয়েছিল। রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। বাড়ির কাছে পৌঁছে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে ?" "না। আমার হাতে প্রচুর সময়।" জবাব দিলাম আমি। মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করলেন আপনি, তারপর জানতে চাইলেন আপনার বাড়িতে ঢুকতে আমার আপত্তি আছে কি না। বললাম, "একটুও না। বরং তাতে আমি খুশিই হব।" আপনার কাছ থেকে গোপন করবার মতো কোনো কথাই ছিল না আমার। কেন করব? আমি তো আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ ক'রে ব'সে আছি। নিজের ব'লে কোনো কিছুই ধ'রে রাখিনি। অতএব আমার মনের কথা আপনার কাছে প্রকাশ করতে দ্বিধা করলাম না। কিন্তু আমি দেখলাম, আমার জবাব শুনে আপনি বিস্মিত বোধ করলেন। আপনার মনো বিরক্তি না আনন্দের সৃষ্টি হ'ল তা আমি সঠিকভাবে বুঝতে পারলাম না। আজ অবিশ্যি আপনার বিস্ময়ের কারণটা আমার অজানা নেই। পুরুষের কাছে মেয়েদের আত্মসমর্পণের বাসনা যতই প্রবল হোক না কেন, আমন্ত্রণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের সম্মতি প্রকাশ করা উচিত নয়। পুরুষের মনে সংশয় ও উত্তেজনা সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে প্রথম প্রথম তারা ভান করে- আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে চায় না। মেয়েদের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য ওরা সনির্বন্ধ অনুরোধ করবে, হাজার মিনতির দ্বারা অতিষ্ঠ ক'রেও তুলবে। মিথ্যে কথা বলতেও দ্বিধা করবে না। শুধু কি তাই? কতরকমের প্রতিশ্রুতি দেবে ওরা। এতটা বাড়াবাড়ি না দেখলে মেয়েরা পুরুষের প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জানায়। আমি জানি, এত সহজেই যারা রাজী হ'য়ে যায় তারা গণিকা, নয়তো তারা অপ্রাপ্তবয়স্কা কুমারী মেয়ে। কিন্তু আমার এই সরলতাপূর্ণ সহজ স্বীকৃতি যে দীর্ঘদিনের নীরবে গ'ড়ে-ওঠা আশা-আকাঙ্ক্ষার চরম অভিব্যক্তি তা কি আপনি বুঝতে পারেন ?

যাই হোক, আমার এই ব্যবহারে আপনি আমার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হ'য়ে উঠলেন। আপনার কৌতূহল উৎপাদনে সমর্থ হলাম আমি। আমরা পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমি অনুভব করলাম, সামান্য যা কথাবার্তা হ'ল তা থেকে আমার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করবার চেষ্টা করছেন আপনি। নিবিড় নৈকট্যপূর্ণ আলোচনা থেকে সহসা আপনি উপলব্ধি করলেন যে, একটি অসাধারণ মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আপনার।

আপনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই সুন্দরী এবং পরম সৌজন্যপূর্ণ মেয়েটির মধ্যে একটা গোপন সত্য লুকনো রয়েছে। আপনার মনে অনুসন্ধিৎসার সৃষ্টি হ'ল। এবং এমন সতর্কভাবে আপনি আমায় প্রশ্ন করতে লাগলেন যে, আমি নিঃসন্দেহ হলুম, আপনি আমার লুকনো সত্যের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য অত্যন্ত সচেষ্ট হ'য়ে উঠেছেন। সেইজন্যই আমার জবাবের মধ্যে এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়াসই প্রবল হ'য়ে উঠেছিল। ভাবলাম, ধরা দেওয়ার চেয়ে আপনার কাছে বোকা সেজে থাকাই ভালো।

আপনার ফ্ল্যাটের সামনে এসে উপস্থিত হলাম। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার সময় আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেলাম আমি। দীর্ঘ অপেক্ষার পর প্রত্যাশিত গন্তব্যে পৌঁছবার আশু সম্ভাবনায় মানসিক চাঞ্চল্যে অস্থির হ'য়ে উঠলাম। চোখের জল না ফেলে সেদিনের কথা আজও আমি ভাবতে পারি না। এত কান্নার পর আজ বোধহয় এক বিন্দু জলও আর নেই। আপনার বাড়ির কোনো কিছুই আমার কাছে অচেনা ছিল না। আমার অনুভূতিরাজ্যে প্রত্যেকটা জিনিসই ছিল আমার বালিকা-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার এক একটা প্রতীক। ফ্ল্যাটে ঢোকবার দরজার এপাশে দাঁড়িয়ে আপনার আগমন প্রতীক্ষায় কতদিন যে আমি অতিবাহিত করেছি তার সংখ্যা বড় কম নয়। এই তো সেই সিঁড়ি, যেখান দিয়ে আপনি ওপরে উঠে আসতেন। আপনার পদধ্বনি শুনতে পেতাম আমি। এই সিঁড়িতেই আপনাকে আমি প্রথম দেখতে পেয়েছিলাম। দরজার ফুটো দিয়ে আপনাকে কতবার যে যাওয়া-আসা করতে দেখেছি তার সীমাসংখ্যা নেই। আপনার দরজার সামনে আমি একবার নতজানু হ'য়ে ব'সে পড়েছিলাম। তালা খোলার আওয়াজ পেলেই আপনার আগমন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতাম আমি। আমাদের দু' দরজার মাঝখানের স্থানটুকুর মধ্যেই আমার বাল্যজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার জগৎটা সীমাবদ্ধ হয়েছিল। এখন আমি সেই জায়গাটাই অতিক্রম করছি—আপনি আমার পাশে রয়েছেন। আপনার সঙ্গে সঙ্গে আমিও আপনার ফ্ল্যাটে প্রবেশ করছি। এ শুধু আপনার একলার ফ্ল্যাট নয়, এ আমাদের বাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠছি আর ভাবছি, পাওয়ার আর বাকী রইল কি? সবই তো পেলাম। এই স্বল্প আয়তনটুকুর মধ্যেই তো আমার সমস্তটা জীবন আবদ্ধ হ'য়ে ছিল। কথাগুলো হয়তো আপনার কাছে তুচ্ছ মনে হ'তে পারে। কিন্তু আমার কাছে

এই ছিল সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বাস্তব। আপনার দরজার সীমা অতিক্রম ক'রে ওপাশে যেতে পারিনি। শুধু এপাশে দাঁড়িয়ে নিজের জগৎটাকে সৃষ্টি করেছি আমি। প্রতিদিনকার একঘেয়ে জীবনের এই তো ছিল আমার বাস্তব পৃথিবী। ছেলেমানুষী স্বপ্নের শুরু এইখান থেকেই—আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো কল্পনা আমার জ্ব'লে উঠেছিল এই পরিসরটুকুর মধ্যেই। আমি এখন সেই দরজার মধ্যে দিয়ে ভেতরে ঢুকছি। অধীর আগ্রহে মুহূর্তটা চঞ্চল! আপনার পক্ষে এমন চাঞ্চল্যের পরিমাপ করা অসম্ভব। লুব্ধ দৃষ্টিতে ঐ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতাম আমি, একদিন দু'দিন নয়—বহুদিন, বহুবার। এক মুহূর্তের জন্য ক্লান্তি আসেনি, অবসাদে ঝিমিয়ে পড়িনি। লুকনো জগৎটার দিকে চেয়ে রয়েছি আমি। ব্যর্থতার বোঝা ভারি হ'য়ে উঠেছে, তবু ভেঙে পড়িনি। আজ আমি আপনার সঙ্গে সেই রাজ্যের দিকেই হেঁটে চলেছি। আমার সেই মুহূর্তের হৃদয়ানুভূতির গভীরতা আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন না। .

সেই রাত্রিটা আপনার সঙ্গেই বাস করেছিলাম আমি। আপনার আগে কোনো পুরুষ যে আমায় স্পর্শ করতে পারেনি তেমন কথা আপনার পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। স্পর্শ করা তো দূরের কথা, এমন কি আমার দেহটাও কেউ দেখতে পায়নি। সম্ভোগের ক্ষুধা আপনার প্রবল হ'য়ে উঠল, আমি বাধা দিলাম না। আমার ব্যবহারে বিন্দুমাত্র লজ্জা-শরমের চিহ্ন দেখতে পেলেন না ব'লে আপনি কি ভেবেছিলেন বলুন তো? আপনাকে যে আমি গোপনে ভালবাসি সেই কথাটা যাতে প্রকাশ হ'য়ে না পড়ে সেইজন্যই অতি সহজে আমি আত্মসমর্পণ করেছিলাম। ভালবাসার কথা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই ভীত হ'য়ে উঠতেন। যা সহজে আসে তার প্রতি ছিল আপনার আকর্ষণ। কারো ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বার ভয়ে আপনি আলগা হ'য়ে থাকতে চাইতেন। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' এই প্রবাদবাক্যটির সঙ্গে আপনার চরিত্রের ছিল অদ্ভুত মিল।

আপনার কাছে আমার কুমারী-জীবনের অবসান ঘটল ব'লে এ কথা যেন ভাববেন না আপনি যে, আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছি আমি। দোহাই আপনার, ভুল বুঝবেন না আমায়। আপনি আমায় প্রলোভন দেখিয়ে কিংবা প্রতারণার দ্বারা বিপথে টেনে আনেননি। যদি ভ্রষ্টা হ'য়ে গিয়ে থাকি তার

জন্যও আপনাকে দায়ী করছি না। আমি স্বইচ্ছায় আপনার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চেয়েছি। নিজের ভাগ্যকে মেনে নেওয়ার জন্য নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়েছি আমি। আপনার স্পর্শসুখের অভিজ্ঞতায় সেই রাত্রিটা আজও আমার কাছে পবিত্র হ'য়ে আছে। শত শত ধন্যবাদ আপনাকে। অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ যখন চোখ খুললাম, আপনি তখন আমার পাশেই শুয়ে ছিলেন। ভগবানের নামে শপথ ক'রে বলছি, আমার মনে হয়েছিল মর্তের সীমা পেরিয়ে স্বর্গলোকে পৌঁছে গেছি বুঝি। বিশ্বাস করুন, মাথার ওপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ আমি দেখতে পেলাম না ব'লে বিস্মিত বোধ করেছিলাম খুব। সেই রাত্রের আত্মসমর্পণের জন্য জীবনে কখনো আমি অনুতাপ করিনি। আপনি আমার পাশে শুয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়লেন, অতীব আগ্রহে আমি তখন আপনার নিশ্বাসের আওয়াজ শুনতে লাগলাম। অতৃপ্তির আগুনে আবার যেন জ্ব'লে উঠলাম—আপনার দেহের ওপর হাত রাখলাম আমি। আপনার এত কাছে শুয়ে আছি ভেবে সুখানুভূতি প্রবল হ'য়ে উঠল—আনন্দাশ্রুতে বালিশ আমার ভিজে যেতে বিলম্ব হ'ল না।

খুব ভোরেই আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম আমি। কাজে গিয়ে যোগ দিতে হবে আমায়। তা ছাড়া, আপনার ভৃত্যটির দৃষ্টি এড়াবার জন্যও অত ভোরে বেরিয়ে আসতে হ'ল। আমি যখন যাওয়ার জন্য তৈরি হয়েছি আপনি তখন আমায় জড়িয়ে ধ'রে আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে ছিলেন। আপনার মনে কি অন্য কোনো একটা অতীত চিত্র অস্পষ্টতার আবরু কাটিয়ে ভেসে উঠেছিল? কিংবা আমার এই সুখোদ্দীপ্ত মুখখানা আপনার চোখে সুন্দর লাগছিল ব'লে অতক্ষণ পর্যন্ত তাকিয়ে ছিলেন? যাই হোক, আমার ঠোঁটের ওপর মুখ ঠেকিয়ে আদর করলেন আপনি। তারপর দরজার দিকে যখন এগিয়ে গেলাম, আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "শুধু হাতে ফিরে যাবে? দু'-একটা ফুল নেবে না?" টেবিলের ওপর যে নীল রঙের ফুলদানিটা ছিল তাতে দেখলাম গোটা চার সাদা গোলাপ ফুটে রয়েছে। আপনি চারটে ফুলই আমায় উপহার দিলেন। কতদিন যে সেই ফুল ক'টাকে মুখের কাছে তুলে এনে আদরচিহ্নিত করেছি তার খবর আপনি রাখেন না।

দ্বিতীয় সাক্ষাতের ব্যবস্থা হ'ল অন্য এক রাত্রে। সেদিনের রাতটাও

আনন্দে ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিল। তৃতীয় সাক্ষাতের সুযোগও আপনি আমায় দিয়েছিলেন। তারপর আপনি বললেন যে, কয়েকদিনের জন্য ভিয়েনার বাইরে আপনাকে যেতে হবে। আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না যে আপনার ঐ বাইরে যাওয়াটা কী ভীষণভাবে আমি অপছন্দ করতাম। ভিয়েনা ত্যাগ করার আগে আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, ফিরে এসে খবর দেবেন আমায়। পোস্ট-অফিসের ঠিকানায় চিঠি লেখবার ব্যবস্থা হ'ল। আমার সত্যিকারের নাম ঠিকানা আজও আমি গোপন ক'রে রাখলাম। বিদায় নেওয়ার আগে এবারও আপনি আমায় গোটা কয়েক গোলাপ ফুল উপহার দিলেন।

এর পর দু' মাস কেটে গেল। প্রতিদিন আমি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছি ·· না, থাক, আমার সেই ব্যর্থ প্রতীক্ষার মানসিক যন্ত্রণার বিবরণ লিখে আপনাকে আর বিব্রত করতে চাই না। অভিযোগ ক'রেই বা লাভ কি? আমি জানি, মেয়েদের সম্বন্ধে আপনি পরম উৎসাহী, আবার তাদের ভুলেও যান তাড়াতাড়ি। আপনি উদার, অথচ আপনার ওপর আস্থা স্থাপন করা অসম্ভব। তা সত্ত্বেও আপনার প্রতি আমার ভালবাসা হ্রাস পায়নি। আগের মতো আমি আপনাকে ভালবাসতে লাগলাম। আপনি অনেক আগেই ভিয়েনায় ফিরে এসেছিলেন। বাইরে থেকে আপনার ঘরে আলো জ্বলতে দেখেছি। কি আকুল আগ্রহে আপনার আমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতাম আমি। কিন্তু আপনি আমায় চিঠি লিখলেন না—জীবনের এই শেষ মুহূর্তেও অনুভব করছি, কি নিদারুণ শূন্যতার মধ্যে ঘর বেঁধেছিলাম আমি। আপনার হাতে লেখা একটা চিঠিও আমার কাছে নেই—শুধু একটা কথাও যদি থাকত! অথচ আমার সমস্ত জীবনটাই আপনাকে দিয়ে দিয়েছিলাম, নিজের ব'লে কোনো কিছুই ধ'রে রাখিনি। ব্যর্থ প্রতীক্ষার মেয়াদ শুধু বেড়ে যেতে লাগল। আপনি আমায় ডাকলেন না, চিঠিও লিখলেন না।

গতকাল ছেলেটি আমার মারা গিয়েছে। এই ছেলেটি আপনারই ছিল। আপনি ওর পিতা। সন্তান সম্ভাবনার শুরু থেকে ওর জন্মমুহূর্ত পর্যন্ত আমি শুধু আপনার কথাই ভেবেছি। দ্বিতীয় কোনো পুরুষের চিন্তা আমার মনের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারেনি। আমার মাতৃত্ব তো আপনারই স্পর্শ-পুণ্যের ফল। অতএব, এ সন্তান আমাদের। আমার সচেতন ভালবাসার ও

আপনার খেয়ালী মনের অনিচ্ছাকৃত প্রেমানুভূতির মধ্যেই জন্ম হয়েছিল তার। সেই ছিল আমাদের একমাত্র সন্তান। আপনি হয়তো এই কথা শুনে চমকে উঠবেন, কিংবা তুচ্ছ ব্যাপার মনে ক'রে সামান্য একটু বিস্মিত বোধ করবেন। হয়তো বা আশ্চর্য হ'য়ে ভাববেন এতদিন কেন ছেলেটির কথা আপনাকে জানাইনি। যখন জানালাম তখন তো সে আর বেঁচে নেই। আপনার মনে এই ধরনের প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। কিন্তু আগে আপনাকে আমাদের সন্তান সম্বন্ধে খবর জানানো অসম্ভব ছিল। কেন জানেন? আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারতেন না। যে অপরিচিতা স্ত্রীলোকটি এত আগ্রহের সঙ্গে আপনার ওখানে রাত কাটিয়ে এল তার মুখের কথা আপনি বিশ্বাস করতেন কি ক'রে? আমি যে আপনাকে এতকাল স্বামীরূপে কল্পনা ক'রে ভালবেসে এসেছি তেমন কথাও বিশ্বাস করা কঠিন হ'ত। নিঃসংশয়ে ছেলেটিকে আপনি নিজের সন্তান ব'লে গ্রহণ করতে পারতেন না। আমার কথার ওপর আস্থা স্থাপন করলেও সন্দেহ আপনার পুরোপুরি দূর হ'ত কি? ভাবতেন, হয়তো বা অপরের সন্তানকে আপনার মতো একজন স্বনামধন্য বিত্তশালীর ঘাড়ের ওপর জোর ক'রে চাপিয়ে দিচ্ছি। মিথ্যা পিতৃত্বের গোপন সন্দেহের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি পেতেন না আপনি। আপনার আর আমার মধ্যে একটা অবিশ্বাসের প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়াত। এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না। তা ছাড়া আপনার চরিত্রের সবগুলো বৈশিষ্ট্যই আমার খুব ভালো ক'রে জানা ছিল। নিশ্চিন্ত, দুর্ভাবনাহীন জীবনের প্রতি ছিল আপনার প্রবল আসক্তি। কোনোরকম ঝঞ্ঝাটের মধ্যে জড়িয়ে পড়া আপনার স্বভাব-বিরুদ্ধ। দায়িত্বহীন ভালবাসাকেই পছন্দ করতেন আপনি। হঠাৎ একটি সন্তানের পিতা হ'য়ে বসতে গেলে আপনার আর বিরক্তির সীমা থাকত না। ছেলেটির ভবিষ্যৎ আপনার ওপরেই নির্ভর করত। এত বড় দায়িত্ব আপনি নিতে চাইতেন কি? দায়িত্বহীন মুক্ত জীবনের স্বাধীনতা হারালে আমাকেও আপনি একটা বোঝার মতো মনে করতেন। কিন্তু আমার আত্মাভিমান তো কম ছিল না—তাই আমি আপনার ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে দিয়ে বিব্রত করবার চেষ্টা করিনি। নিজেই সেটা বহন করেছি। বহু মেয়েদের সঙ্গেই আপনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলেন। তাদের কথা যখন স্মরণ করতেন তখন আপনার হৃদয় প্রেম ও কৃতজ্ঞতায় ভরপুর হ'য়ে উঠত। আমিও তাদের মতোই একজন

হ'তে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার কথা আপনার কোনো দিনও মনে পড়েনি। আপনার স্মৃতি থেকে আমি একেবারে পুরোপুরিভাবে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গিয়েছিলাম।

আপনাকে আমি অপরাধী করছি না। বিশ্বাস করুন, আপনার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই আমার নেই। এই লেখার মধ্যে যদি হঠাৎ কখনো অপরাধের ভাষা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে তাহ'লে আমায় আপনি ক্ষমা করবেন। এটা ইচ্ছাকৃত নয়। মানসিক যন্ত্রণার দোয়াতের মধ্যে মাঝে মাঝে কলমের মুখটা যেন ডুবে যাচ্ছে ব'লে সন্দেহ করছি। আমার অপরাধ নেবেন না। আমার ছেলেটি—আমাদের একমাত্র সন্তান চিরনিদ্রায় অচেতন। তার মাথার ওপরে মোমবাতির শিখাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। মৃতদেহের পাশে ব'সে চিঠি লিখছি আমি। ভগবানের বিরুদ্ধে হাত আমার উদ্যত হ'য়ে উঠেছে। শোকের জ্বালায় এত বেশি অস্থির হ'য়ে পড়েছি যে, মনে হচ্ছে ভগবান নিজে হাতে আমাদের সন্তানটিকে হত্যা করেছেন। অতএব, কোথাও যদি অসন্তোষ প্রকাশ ক'রে থাকি তাহ'লে ক্ষমা করবেন আমায়। আমি জানি, আপনার সহৃদয়তার তুলনা নেই। পরোপকারের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত। মুখের কথা প্রকাশ হওয়ার আগেই যে-কোনো একজন অপরিচিতকেও সাহায্য করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে ওঠেন আপনি। কিন্তু আপনার এই পরোপকার মনোবৃত্তিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আপনাকে দয়ার সাগর ব'লে অভিহিত করলেও অত্যুক্তি হবে না। আপনার সহৃদয়তার কোনো সীমা নেই। যে-কেউ তার দু' হাত ভ'রে আপনার কাছ থেকে সব কিছু আদায় ক'রে নিতে পারে। শুধু একবার চাইলেই হ'ল। যারা মুখ খুলে চাইতে পারে তারাই কেবল পায়। আপনার এই পরোপকার মনোবৃত্তির মূলে লজ্জা আছে, দুর্বলতা আছে—শুধু পরোপকার করবার নিছক আনন্দ এতে নেই। আজ আমি খোলাখুলি-ভাবে বলতে দ্বিধা করব না যে, যারা লাঞ্ছিত এবং দুঃখী তাদের চেয়ে যারা সুখী তারাই আপনার কাছে প্রিয়তর। ছেলেবেলাকার একটা ঘটনা মনে পড়ছে আমার। আপনি তো জানেন আমাদের দরজার ফুটো দিয়ে আপনার যাওয়া-আসার প্রতি দৃষ্টি রাখতাম আমি। একদিন একটা ভিখিরী এসে আপনার দরজার ঘণ্টাটা টিপে দিল। আপনি দরজা খুলে ভিক্ষে দিলেন তাকে। আপনার ভিক্ষে দেওয়ার ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম আমি। ভিখিরীটা কোনো

কিছু চাইবার আগেই আপনি তাড়াতাড়ি ক'রে তাকে ভিক্ষে দিয়ে বিদায় ক'রে দিলেন। আপনার ভাবভঙ্গির মধ্যে একটা অস্বাভাবিক রকমের দ্রুতি এবং দৌর্বল্য দেখতে পেয়েছিলাম আমি। যেন লোকটার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যই অত তাড়াতাড়ি দানের পয়সা বার ক'রে দিলেন। মনে হ'ল তার চোখের দিকে চাইতে গিযে ভয় পেলেন আপনি। তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সময় পর্যন্ত দিলেন না। ভীরু এবং উপক্রত মনোভাবপূর্ণ আপনার এই দানের ব্যাপারটা আজও আমি ভুলিনি। সেই কারণেই বিপদের দিনেও আমি গিয়ে আপনার কাছে হাত পাতিনি। আমি জানি, সাহায্য করতে আপনি এক মুহূর্তের জন্যও দ্বিধা করতেন না। সন্তানের পিতৃত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকলেও সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসতেন আপনি। আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতেন। প্রচুর অর্থ দিয়েও যে সাহায্য করতেন তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার কার্যকলাপের মধ্যে একটা অধৈর্য ভাব লুকিয়ে থাকত এবং ঝঞ্ঝাট থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করতেন আপনি। অবৈধ সন্তানটি যেন জন্মলাভ না করতে পারে তার জন্যও উপদেশ দিতে পারতেন ব'লে আমার বিশ্বাস হয়। আপনার উপদেশ আমায় মানতেই হ'ত—সেই ভয়েই আপনার কাছে আমি সাহায্য চাইতে যাইনি। জীবনে তো আমি কিছুই পাইনি, শুধুমাত্র এই সন্তানটি ছাড়া। এ ছিল আমার কাছে সাত রাজার ধন এক মানিক। আসলে, আপনিই তো ওর মধ্যে নবজন্ম লাভ করেছিলেন। আপনি দায়িত্বহীন সুখের জীবন যাপনে অভ্যস্ত, আপনাকে আমি কিছুতেই ধ'রে রাখতে পারতাম না। কিন্তু নবজাত শিশুটি সম্বন্ধে সে প্রশ্ন ওঠে না। সে আমারই রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে এবং আপনার অস্তিত্ব আমি সমস্ত দেহমন দিয়ে অনুভবও করব। আপনাকে ধ'রে রাখবার এই তো আমার শেষ প্রচেষ্টা! আপনাকে আমি পালিয়ে যেতে দিইনি—আমার সারা দেহে, শিরা-উপশিরায় আপনার উপস্থিতি আমি অনুভব করেছি। সেই কারণেই যখন আমি প্রথম জানতে পারলাম যে, মাতৃত্বের অধিকারিণী হয়েছি আমি তখন আনন্দে ও খুশিতে মন আমার ভ'রে উঠল। এখন বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই কেন আমি এত বড় খবরটা আপনার কাছ থেকে গোপন ক'রে রেখেছিলাম?

কিন্তু আপনি যেন ভাববেন না যে, মাঝখানের সময়টা আমার খুব সুখে

কেটেছে। মানুষের নীচতা আমায় কষ্ট দিয়েছে অনেক। তা ছাড়া নানা-রকমের অসুবিধাও ছিল। শেষের দিকে আমি দোকানে কাজ করতে পারতাম না। আমার সৎপিতার আত্মীয়স্বজনরা আশেপাশেই ঘোরাঘুরি করতেন। আমার দিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়লে খবরটা নিশ্চয়ই তাঁরা মায়ের কানে পৌঁছে দিতেন। এমন অসুবিধায় পড়লাম যে, টাকার সমূহ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও মায়ের কাছে চাইতে পারলাম না। ছোটখাট জিনিস ফেরি ক'রে বেচে পয়সা রোজগার করতে হ'ল। সময় হওয়ার দিন সাতেক আগে দেখলাম বাকী টাকা ক'টা আমার চুরি হ'য়ে গেছে। চুরি করেছে আমারই ধোপা। সুতরাং আমায় হাসপাতালে গিয়ে উঠতে হ'ল। যারা পরিত্যক্তা, গরিব এবং হতভাগ্য তারাই এসে এখানে আশ্রয় নেয়। আপনার সন্তানটির জন্ম হ'ল এদের মধ্যেই। এখানে কেউ কাউকে চেনে না। যে যার বিছানায় শুয়ে নিঃসঙ্গতায় কষ্ট পায়। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই জনাকীর্ণ, এক ইঞ্চি ফাঁকা জায়গা তাতে নেই। সারা ঘরময় কোলোরোফর্মের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা। রক্ত-মাখা বিছানাগুলিও চোখে পড়ে। তার ওপর চিৎকার আর যন্ত্রণার চাপা গোঙানিতে ঘরের আবহাওয়া ভারি হ'য়ে ওঠে। কি জঘন্য জায়গা! কারো সঙ্গে কারো প্রীতির সম্পর্ক নেই। বরং একে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্না। শুধু চরম দারিদ্র্য আর নিদারুণ দুর্দশার জন্যই আমরা একসঙ্গে একই ওয়ার্ডে এসে আশ্রয় নিয়েছি। এখানে এসে সবাই যার যার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য সব হারিয়ে ফেলে। পরিচয়টুকু শুধু লেখা থাকে হাসপাতালের খাতায়। বিছানায় যারা শুয়ে আছে তারা মানুষ নয়, এক-একটা জৈব দেহ মাত্র—ব্যথায়, বেদনায় কেঁপে কেঁপে মরছে। হয়তো বা চিকিৎসকদের চোখে আমরা বিচার-বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু ছাড়া আর কিছু নই……

এইসব কথা লিখলাম ব'লে ক্ষমা করবেন আমায়। এই সম্বন্ধে আর কোনোদিনই একটা কথাও বলব না। গত এগারো বছর ধ'রে চুপ ক'রে ছিলাম। আবারও আমি বোবা হ'য়ে যাব, কিন্তু এবার হব চিরজন্মের মতো। তার আগে একটিবার আমায় মুক্তকণ্ঠে কথা বলবার সুযোগ দেবেন না? একবার অন্তত বলতে দিন আমায়, যে ছেলেটি আমার জীবনের একমাত্র আনন্দের উৎস ছিল, যাকে প্রভূত মূল্যের বিনিময়ে অর্জন করতে হয়েছিল

সে আর নেই—সে মৃত। ওর হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে চেয়ে, ওর কণ্ঠস্বর শুনে হাসপাতালের সেই ভয়ংকর সময়টুকুর কথা এতকাল ভুলে গিয়েছিলাম। ওর মৃত্যুর পর আবার আমি পীড়ন অনুভব করছি। সুতরাং আমার এই মানসিক যন্ত্রণার কথা আপনাকে না জানিয়ে পারলাম না। তাই ব'লে আপনাকে আমি অপরাধী করছি না। আমার অভিযোগ শুধু ভগবানের বিরুদ্ধে। বলতে পারেন, এমন একটা উদ্দেশ্যবিহীন যন্ত্রণাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করবার কি তাঁর প্রয়োজন ছিল? আপনার ওপর এক মুহূর্তের জন্য রাগ পর্যন্ত করিনি। এমন কি গর্ভযন্ত্রণায় যখন কাতর হ'য়ে পড়েছি তখনও না। আপনার সঙ্গে রাত কাটিয়েছি ব'লে কখনো আমি অনুতাপ করিনি। সেই নরকবাসের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, যদি দরকার হয় আবারও আমি বারবার ঐ হাসপাতালে ফিরে যেতে পারি।

আমাদের ছেলেটি গতকাল মারা গিয়েছে। আপনি তাকে কখনো চোখে দেখেননি—চিনতেন না ওকে। ওর জন্মের পর অনেক দিন পর্যন্ত আপনার কাছ থেকে লুকিয়ে ছিলাম আমি। আপনার সঙ্গলাভের আকাঙ্ক্ষা তখন অনেকটা ক'মে গিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে আর আগের মতো মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসতাম না। তার জন্য অবিশ্যি শিশুটিই দায়ী। ওকে পাওয়ার পর থেকে মানসিক অস্থিরতা গেল কমে। আপনি স্বাধীন এবং সুখী, কি দরকার আমার আপনাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় দিনরাত্রি জ্ব'লে পুড়ে মরবার? এখন আমি ইচ্ছেমতো শিশুটিকে আদর করতে পারি, ভালবাসতে পারি। দু'জনের মধ্যে ভালবাসা ভাগ ক'রে দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম না আমি। আপনার জন্য যে অশান্তি আমি ভোগ করেছি তাও যেন লোপ পেয়েছে ব'লে মনে হ'ল আমার। আপনার ফ্ল্যাটে যাওয়ার লোভ থেকেও মুক্তি পেলাম। শুধু আপনার জন্মদিনে একগুচ্ছ সাদা গোলাপ পাঠিয়ে দিতাম। আমাদের প্রথম মিলনের পর আপনিও আমাকে ঠিক ঐরকমের ফুল উপহার দিয়েছিলেন। গত দশ-এগারো বছরের মধ্যে একবারও কি আপনার মনে প্রশ্ন জাগেনি, কে আপনাকে প্রতি জন্মদিনে এমন ক'রে ফুল পাঠায়? আপনি নিজেও যে একটি মেয়েকে সাদা গোলাপ উপহার দিয়েছিলেন তা কি মনে পড়ে আপনার? জানি না মনে পড়ে কি না, কোনোদিন জানতেও পারব না। কিন্তু প্রতি বছর ঐ একটি দিন ফুল

পাঠাবার সৌভাগ্যই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। অন্তত একটা দিন সেই অতীত স্মৃতির শৌখিনতায় ডুবে থাকতে পারতাম আমি।

আমাদের ছেলেটি আপনার কাছে অপরিচিত র'য়ে গেল। এইজন্যে নিজেই আমি নিজেকে দোষ দিই খুব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একবার দেখলেই ওকে আপনি ভালবাসতে বাধ্য হতেন। আহা, প্রথম যেদিন ঘুম ভাঙবার পর সে হেসে উঠল, আমার মনে হয়েছিল সারা বিশ্বের অন্ধকার কেটে যেতে বুঝি এক মুহূর্তও লাগল না! কালো কালো চোখ দুটো ঠিক আপনার মতোই ছিল। হাসিখুশি ভরা সেই চোখ দিয়ে সে চেয়ে থাকত আমার দিকে —প্রকাণ্ড এই পৃথিবীটার দিকে। একবার দেখলেই তাকে আদর করবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হ'য়ে উঠত। বুদ্ধির দীপ্তিতে মুখখানা সব সময়েই ঝলমল করত ওর। আপনার চিন্তাভাবনাশূন্য খেয়ালী মনের বৈশিষ্ট্য শিশুটির মধ্যেও দেখতে পেয়েছিলাম আমি। আপনি যেমন মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করেন সেও ঠিক তেমনি ভাবে যে-কোনো খেলনার মধ্যে মোহাবিষ্টের মতো ডুবে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বই হাতে পেলে তার চেহারা যেত বদলে। বইয়ের প্রতি আকর্ষণ ছিল খুব। ওর মধ্যে আপনিই পুনর্জন্ম লাভ করেছিলেন। আপনার চারিত্রিক লক্ষণগুলি ওর মধ্যেও ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছিল। আমোদপ্রিয়তার সঙ্গে আন্তরিকতার সংমিশ্রণ ঘটতে দেখেছিলাম আমি। সাদৃশ্যের লক্ষণগুলি যত বেশি প্রকাশ পেতে লাগল আমার ভালবাসার মাত্রাও বাড়তে লাগল তত বেশি। লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ ছিল খুব। ফরাসী ভাষা এত ভালো শিখেছিল যে, ম্যাগ্‌পাই পাখির মতো অনর্গল কথা ব'লে যেতে পারত। ক্লাশের মধ্যে ওর খাতাপত্রই ছিল সবচেয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সবার চেয়ে বেশি ছিম্‌ছাম। ঋজু দেহের ছোট্ট মানুষটি দেখতে কি সুন্দরই না ছিল! একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রাদোর সমুদ্র উপকূলে ওকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। মেয়েরা ওকে দেখলেই দাঁড়িয়ে পড়ত এবং ওর কোঁকড়া কোঁকড়া সোনালী চুলের ওপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিত। সেমারিং-এ গিয়ে যখন সে বরফের ওপর দিয়ে স্লেজ গাড়ি চালাত তখন প্রত্যেকেই চেয়ে থাকত ওর দিকে। সত্যিই ছেলেটা যেমন সুন্দর ছিল দেখতে, তেমনি তার স্বভাবচরিত্রও ছিল অত্যন্ত মধুর ও নম্র! প্রতিটি মানুষকেই আকর্ষণ করত সে। গত বছর সে কলেজে ভর্তি হয়েছিল।

সেখানকার হস্টেলেই থাকত। কলেজের ইউনিফর্ম পরতে হ'ত ওকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শিক্ষানবিস বালক 'নাইটদের' মতো ইউনিফর্ম—কোমরে বেল্টের তলায় ছোরা বাঁধা। ওরকম পোশাকে কি যে সুন্দর দেখাত ওকে—আর এখন সেই ছেলেটিই নতুন পোশাক প'রে ঐখানে শুয়ে রয়েছে। বিবর্ণ ঠোঁট, হাত দুটো আড়াআড়িভাবে ফেলে রেখেছে বুকের ওপর—ঘুমিয়ে রয়েছে খোকা। এ ঘুম আর কোনোদিনও ভাঙবে না।

আপনি নিশ্চয়ই আশ্চর্য হচ্ছেন ভেবে যে কি ক'রে ছেলেকে আমি এত ভালোভাবে লেখাপড়া শেখাচ্ছিলাম, এবং কি ক'রেই বা সে সমাজের উঁচু অংশে প্রবেশের সুযোগ পেল। কোথা থেকে টাকাপয়সা এল সেই সম্বন্ধেও আপনার মনে অবশ্যই নানারকমের প্রশ্ন জাগছে। প্রিয়তম, আজ আমি একটা কথাও গোপন করব না। লজ্জা-শরমের বালাই আমার নেই, সবই খুলে বলছি। ঘৃণাভরে মুখ ঘুরিয়ে স'রে যাবেন না যেন। নিজেকে আমি বিক্রি করেছিলাম। যদিও সাধারণ বারাঙ্গনাদের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়াইনি আমি, তবুও দেহের বিনিময়ে রোজগার করতে হয়েছিল আমায়। আমার বন্ধু এবং প্রেমিকরা সবাই ছিল ধনীলোক। প্রথমে তাদের আমি খুঁজেছি—তারপর তারাই আমায় খুঁজে বেড়াতে লাগল। কারণ আমার সৌন্দর্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে বিলম্ব হয়নি। আমি যে সুন্দরী ছিলাম তা কি আপনি কখনো লক্ষ্য করেছিলেন? যাদের আমি সঙ্গ দিয়েছি তারা প্রত্যেকেই আমার প্রতি একান্তভাবে অনুরক্ত ছিল। তারা আমার সত্যিকারের প্রণয়ী। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে দ্বিধা করেনি কখনো। তাদের সবার কাছ থেকেই ভালবাসা পেয়েছি আমি। শুধু আপনার কাছ থেকেই পেলাম না কিছু। অথচ আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমি ভালবাসতে পারিনি।

এই সরল স্বীকৃতির পর আমায় কি আপনি ঘৃণা করবেন? অবশ্যই না। আমি জানি আমার বিপর্যয়ের তাৎপর্য আপনি বুঝতে পারবেন। আমি যা করেছি তা যে আপনার জন্য এবং আপনার সন্তানের জন্যই করতে বাধ্য হয়েছি তেমন কথা আপনি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবেন না। দারিদ্র্য যে কি জঘন্য ব্যাপার তার অভিজ্ঞতা আমি সঞ্চয় করেছিলাম হাসপাতালে থাকতে। আমি জানি যারা গরিব, যারা পদদলিত সমাজে তাদের দুরবস্থার সীমা নেই। আপনার এমন সুন্দর ছেলেটা পথের ঐ বিকৃত চরিত্রের ছেলেদের মধ্যে

লালিতপালিত হবে এবং বস্তির বিষাক্ত বায়ু টেনে টেনে মানুষ হ'য়ে উঠবে তেমন কথা কল্পনা করতেও ভয় পেয়েছি আমি। কি সুন্দর রুচি ও কোমল মুখখানা ওর! সেই মুখ দিয়ে ওকে অশ্লীল ভাষা শিখবার সুযোগ দিইনি আমি। নোংরা আর মোটা সুতোর জামাকাপড় পরলে যে ওর নরম ও সোনালী রঙের গায়ের চামড়ায় ক্ষতের সৃষ্টি হবে তা আমি জানতাম। সংসারের সবচেয়ে ভালো জিনিসগুলি তার পাওয়া চাই। আমোদ-আহ্লাদ ও সচ্ছলতার মধ্যে সে মানুষ হ'য়ে উঠুক, তাই ছিল আমার ইচ্ছা। আমি চেয়েছিলাম ছেলেটা আমাদের আপনার আদর্শই মেনে চলবে—আপনি সমাজের যে-উঁচু অংশটায় বাস করেন তারই অনুরূপ জগৎ ওর জন্যও আমায় সৃষ্টি করতে হয়েছিল।

সেই কারণেই দেহটা আমার পণ্যের মতো বিক্রি করতে হ'ল। এটা আমার আত্মত্যাগের নিদর্শন ব'লে মনে করি না আমি। কারণ, "সম্ভ্রম", "মর্যাদা" ব'লে যেসব সামাজিক কথাগুলো প্রচলিত আছে তার কোনো মূল্যই ছিল না আমার কাছে। প্রকৃতপক্ষে আমার দেহটা ছিল আপনার একলার নিজস্ব সম্পত্তি। আর আপনার ভালবাসাই যখন পেলাম না, তখন দেহের পবিত্রতা বাঁচল, না নষ্ট হ'ল তাতে আমার কি যায় আসে? প্রণয়ীদের গভীরতম অনুরাগও আমার হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি, যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল আমার শ্রদ্ধার পাত্র। নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে তাদের অতৃপ্ত ভালবাসার প্রতি আমার সহানুভূতি জেগে উঠত। এদের সহৃদয়তার তুলনা মেলা কঠিন। আদর দিয়ে দিয়ে এরা আমায় নষ্ট ক'রে ফেলল। তাদের সশ্রদ্ধ বাধ্যতায় আমি মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলাম। এদের মধ্যে একজন ছিল মৃতদার। বয়স একটু বেশিই হয়েছিল। সামাজিক প্রতিষ্ঠা ছিল তার প্রচুর। তারই প্রতিপত্তির জোরে আপনার ছেলেটি কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। এই লোকটি বার কয়েক বিয়ের প্রস্তাবও করেছিল আমার কাছে। তার প্রস্তাব যদি গ্রহণ করতাম, আজ তাহ'লে আমি সংসারের সব কিছু দুর্ভাবনা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তার টাইবলের প্রাসাদে ব'সে কি সুখেই না জীবন কাটাতে পারতাম বলুন তো? উচ্চ প্রভাববিশিষ্ট অত বড় একজন অভিজাত ব্যক্তিকে বিয়ে করলে আমিও সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টেসের পদমর্যাদা লাভ করতাম। শুধু কি তাই? আমার ছেলেটা একজন স্নেহশীল

পিতার কাছে আশ্রয় পেত। আমি পেতাম একজন শান্ত, ধীর এবং হৃদয়বান স্বামী। আমি জানতাম লোকটি কষ্ট পাবে, তবুও তার প্রস্তাব আমি বার-বার প্রত্যাখ্যান করেছি। কেন প্রত্যাখ্যান করলাম তার কারণটা গোপন করব না। আমি অন্য কোথাও বাঁধা পড়তে চাইনি। আপনার জন্যই নিজেকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলাম। আমার অবচেতন মনের আকাশে তখনো সেই ছেলেবেলাকার স্বপ্নটা ভেসে বেড়াচ্ছিল। ভাবছিলাম, একদিন-না-একদিন আপনি নিজের কাছে আমায় ডেকে নিয়ে যাবেন—এক ঘণ্টার জন্য হ'লেও ডাকবেন। এই লোভনীয় সম্ভাবনাটা এত বড় ক'রে দেখেছিলাম যে, সব রকম প্রস্তাবই আমি অতি অনায়াসে বাতিল ক'রে দিলাম। কিন্তু কেন? নিজেকে মুক্ত রেখেছি—আপনার ডাক শুনে যেন তক্ষুনি গিয়ে আপনার কাছে উপস্থিত হ'তে পারি। আমার সমস্ত নারী-জীবনটাই তো একটা বিলম্বিত প্রতীক্ষার মধ্যে কেটে গেল—শুধু অপেক্ষা ক'রে রইলাম আপনার খেয়ালী মনের আহ্বান শোনবার জন্য।

শেষ পর্যন্ত সেই বহু-প্রতীক্ষিত মিলন-মুহূর্তটা এসে উপস্থিত হ'ল। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আপনি নিজে কিন্তু তা জানতেও পারলেন না! আপনি আমায় চিনতে পারেননি। কোনোদিনও আপনি চিনতেন না আমায়—কোনোদিনও না। থিয়েটারে, কনসার্টে এবং অন্যান্য কত জায়গায় আপনাকে দেখতাম আমি। দেখবার সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহে মন আমার আকুল হ'য়ে উঠত, কিন্তু প্রতিবারই আমার পাশ দিয়ে চ'লে যেতেন আপনি—আমাকে লক্ষ্য করতেন না। বাহ্যিক চেহারা আমার বদলে গিয়েছিল। সেই ভীরু ছোট্ট মেয়েটির দেহমনে নারীত্বের রং লেগেছে এখন—সুন্দরী ব'লে সর্বত্রই সে প্রশংসিত। এখন এই সুসজ্জিতা নারী একা নয়, প্রণয়প্রার্থীদের দ্বারা সর্বক্ষণই সুপরিবেষ্টিতা। আপনি তো এই ভীরু মেয়েটিকে দেখতে পেয়েছিলেন শুধু আপনার শয়নকক্ষের স্তিমিত আলোয়—অতএব আপনি কি ক'রে চিনবেন আমায়? কখনো কখনো আমার সঙ্গীরা আপনাকে অভিবাদন করত। প্রত্যভিবাদনের সময় আপনি আমার দিকে দৃষ্টিও দিতেন। সেই দৃষ্টির মধ্যে দেখতাম অচেনা-অজানার ভদ্রতা আর শ্রদ্ধা রয়েছে, কিন্তু পরিচয়ের স্বীকৃতি নেই।

এই অস্বীকৃতির খোঁচা আমি সহ্য করতে পারতাম না। মনে পড়ে একবার

আমরা একই প্রেক্ষাগারে অপেরা দেখতে গিয়েছিলাম। বসেছিলাম পাশাপাশি বক্সে। মাঝখানে শুধু একটা ভেলভেটের পর্দা ঝুলছিল। বাজনা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগারের আলোগুলো ক্ষীণ হ'য়ে গেল। আপনার মুখ আর আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু আপনার নিশ্বাসের আওয়াজ শুনছিলাম। আওয়াজটা এত কাছ থেকে ভেসে আসছে যে, আপনার শয়নকক্ষের কথা মনে পড়ল আমার।

পর্দার ঠিক পাশেই আপনি হাত রেখেছিলেন। লোভ হ'ল মুখ নিচু ক'রে হাতটা আপনার স্পর্শ করি—আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল হ'য়ে উঠল। আপনার ঐ হাতের সুমধুর স্পর্শের সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার। বাজনার শব্দ যত বাড়তে লাগল আমার আকাঙ্ক্ষাও বাড়তে লাগল তত বেশি। নিজেকে সংযত রাখবার জন্য ভীষণভাবে সংগ্রাম করতে হ'ল। প্রথম দৃশ্য শেষ হওয়ার পরে আমার সঙ্গীটিকে বললাম যে, আমি বাড়ি যেতে চাই। অন্ধকারের মধ্যে আপনার এত কাছে ব'সে অপেরা দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠল। এত কাছে, তবু ব্যবধান দুস্তর!

এটাই আমার শেষ সুযোগ নয়, আরও একবার সুযোগ এসেছিল। প্রায় বছরখানেক আগে আপনার জন্মদিনের ঠিক পরের দিনটায়। আপনার জন্মদিনটিকে উৎসবের দিন ব'লে মনে করতাম আমি। সকালবেলা আপনার জন্য সাদা গোলাপ কিনতে গেলাম। বিকেলে গেলাম ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে। দু'জনে একসঙ্গে চা খেলাম আমরা। তারপর সন্ধেবেলা থিয়েটারও দেখলাম। আমি চেয়েছিলাম, সে যেন এই বিশেষ দিনটাকে একটা গূঢ় অর্থপূর্ণ বাৎসরিক তিথিপালনের মতো মনে করে, যদিও তার কারণ সে জানত না। পরের দিনটা কাটল আমার একজন অন্তরঙ্গ যুবক বন্ধুর সঙ্গে। ব্রান শহরের একজন ধনী কারবারী—কারখানার মালিক ছিল সে। গত দু' বছর ধ'রে তার সঙ্গেই বাস করছিলাম আমি। খুবই ভালবাসত আমাকে। বিয়ের প্রস্তাব সেও পেশ করেছিল আমার কাছে। তার প্রস্তাবও আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। প্রত্যাখ্যানের কারণটা সে জানতে পারেনি। আমার প্রতি তার অনুরাগের অন্ত ছিল না। জিনিসপত্র উপহার দিতে তার মতো মুক্তহস্ত লোক খুব কমই দেখেছি। তার সঙ্গেই সেই রাত্রে কনসার্টে গেলাম। রেস্তরাঁয় গিয়ে রাত্রের খাওয়া শেষ ক'রে আমি প্রস্তাব করলাম, "একটা কোনো

নাচের হলে গেলে কেমন হয় ?" সাধারণত ওসব জায়গায় যাওয়া আমি পছন্দ করতাম না। রুচিবোধে আঘাত লাগত আমার। কিন্তু কেন যেন আজ আমার মন বলছিল নাচের হলে যাওয়ার জন্য। রেস্তরাঁর অন্যান্য সবাই একসঙ্গে আমার প্রস্তাবটি সোৎসাহে অনুমোদন ক'রে ফেলল। কি এক দুর্জ্ঞেয় কারণে প্রাণচঞ্চলতায় আমিও উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলাম। মনে হচ্ছিল কি যেন একটা ঘটবে।

আমরা সবাই মিলে একটা নাচের হলে এসে উপস্থিত হলাম। প্রথমেই খানিকটা শ্যাম্পেন খেয়ে নিলাম আমি। স্ফূর্তির ঝড় বইতে লাগল আমার মনে—প্রায় উন্মাদ হওয়ার উপক্রম। আগে কখনো এমন অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। গেলাসের পর গেলাস মদ খেয়ে চললাম। একটা প্রেমের গান হচ্ছিল তখন, আমিও গায়কদলের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ফেললাম। ইচ্ছে হচ্ছিল উল্লাসের আতিশয্যে নাচতে আরম্ভ করি। এমন সময় হঠাৎ আমার হাত-পা সব বরফের মতো ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। আমি দেখলুম পাশের টেবিলে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে ব'সে আছেন আপনি। সপ্রশংস এবং লোলুপ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েও রয়েছেন। আপনার ঐ বিশেষ দৃষ্টিটি চিরকাল আমায় রোমাঞ্চিত ক'রে তোলে—সারা দেহে শিহরন ব'য়ে যায়। দশ বছর পর এই প্রথম আবার আপনার উত্তপ্ত দৃষ্টির স্বাদ পেলাম আমি, যদিও জানি প্রেমানুরাগের উত্তাপ বিকিরণ করা আপনার স্বভাবধর্ম। উত্তেজনায় হাত আমার কাঁপতে লাগল, মদের গেলাসটা হাত থেকে প'ড়ে যেতে যেতে সামলে নিলাম। সৌভাগ্যবশত আমার সঙ্গীরা কেউ আমার এই অস্থিরতার প্রতি দৃষ্টি দেয়নি। তারা সবাই গানবাজনা এবং হাসির হুল্লোড়ের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

আপনার লালসামণ্ডিত দৃষ্টির প্রখরতা ক্রমশই বাড়তে লাগল। তার স্পর্শে আমার নিজের কামনাও প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল। আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না আপনি আমায় চিনতে পেরেছেন কি না। এমন হওয়াও হয়তো অসম্ভব নয় যে, একজন অপরিচিতা সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখে আপনার আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয়েছে। আমার গাল দুটো লাল হ'য়ে উঠল। বকবক ক'রে অনবরত কথা ব'লে যেতে লাগলাম। আপনার দৃষ্টি যে আমাকে স্পর্শ করেছে তাও আপনি বুঝতে পারলেন। যেন কারো দৃষ্টিগোচর না হয়

এমনভাবে আপনি মাথা নাড়িয়ে পাশের ঘরে যাওয়ার জন্য আমায় ইশারা করলেন। হোটেলের বিল্ চুকিয়ে দিলেন আপনি। তারপর বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় আরও একবার ইশারা ক'রে আমায় জানিয়ে গেলেন যে, বাইরে কোথাও আমার জন্য অপেক্ষা করবেন আপনি। জ্বরের উত্তাপে আমি যেন ঠকঠক ক'রে কাঁপতে লাগলাম। কেউ প্রশ্ন করলে তার জবাব পর্যন্ত দিতে পারছি না। আবেগ-আলোড়নের প্রাবল্যে বক্ষে যেন আগুন লাগল আমার। ঠিক এই সময় বাইরে বেরুবার একটা সুযোগ এসে গেল। দু'জন নিগ্রো বর্বরোচিত উল্লাসে এমনভাবে নাচতে শুরু ক'রে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এত চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গান করতে লাগল তারা যে সবাই চেয়ে রইল তাদের দিকে। এই সুযোগে ব্রান শহরের বন্ধুটিকে বললাম, "আমি এক্ষুনি আসছি।" তারপর আপনার পিছু ধরলাম আমি।

বাইরে আমার জন্য আপনি অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখবামাত্র আপনার মুখ হাস্যোজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। আপনি এগিয়ে এলেন আমার কাছে। আমি এবার বুঝতে পারলাম, সেই পুরনো দিনের মেয়েটিকে আপনি চিনতে পারেননি। আজকেও আপনার কাছে আমি একজন নতুন পরিচিতা ছাড়া আর কিছু নই। আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার হাতে কি ঘণ্টাখানেক সময় আছে?" আপনার কথা শুনে নিঃসন্দেহ হলাম যে, আমাকে আপনি রাস্তার একজন সাধারণ স্ত্রীলোক ব'লেই ভেবে নিয়েছেন, যাকে এক রাত্রির জন্য যে-কেউ ভাড়া ক'রে রাখতে পারে। আমি বললাম, "হ্যাঁ, সময় আছে আমার।" দশ বছর আগে আধো-অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠিক এই সুরেই আরও একবার আপনার প্রস্তাবে আমি সম্মতি জানিয়েছিলাম। সেদিনের মতো আজও আমি সম্মতি জানাতে দ্বিধা করলাম না। তারপর আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বলো, কখন তোমাকে পাওয়া যায়?"

"যখনই বলবেন—" আপনি ব'লেই সঙ্গে সঙ্গে রাজী হ'তে লজ্জা বোধ করলাম না আমি। এত সহজে রাজী হ'য়ে গেলাম ব'লে আপনি কিন্তু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। শুধু বিস্ময় নয়, তার মধ্যে ছিল কৌতূহল আর সন্দেহ। আপনার এই বিশেষ ভঙ্গিটি আমার কাছে নতুন নয়, দশ বছর পূর্বেও দেখেছি। এক মুহূর্ত দ্বিধা করবার পর আপনি জানতে চাইলেন, "এখুনি কি যেতে পারবে?" "হ্যাঁ, চলুন যাই।"

হোটেলের ক্লোক-রুমে আমার কোটটা রেখে এসেছিলাম। সেটা নিয়ে আসতে যাওয়ার জন্য ফিরে যাব ভাবছি এমন সময় মনে পড়ল কোট এবং আরও দু'-একটা জিনিসপত্র জিম্মা রাখার রসিদটা ব্রান শহরের বন্ধুর কাছে রয়েছে। তার কাছ থেকে রসিদটা চাইতে গেলে মুশকিল হ'তে পারে ভেবে ফিরে যাওয়া অসম্ভব হ'ল। আপনার সঙ্গলাভের সুযোগের জন্য কত বছর ধ'রে অপেক্ষা ক'রে রয়েছি বলুন তো? এখন যদি সেই সুযোগটা নষ্ট হ'য়ে যায়? অতএব হোটেলে ফিরে না যাওয়ার সিদ্ধান্তই গ্রহণ করলাম তক্ষুনি। শালটা ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকারের মধ্যে পা বাড়ালাম। কোটটা হোটেলেই প'ড়ে রইল। এমন কি ব্রান শহরের বন্ধুটির প্রতি অবিচার করতেও দ্বিধা করলাম না। গত কয়েক বছর ধ'রে তার সঙ্গেই বাস করছিলাম আমি। সর্বসমক্ষে এইভাবে হঠাৎ স্থানত্যাগের ফলে তার বন্ধুবান্ধবরা কি ভাবল জানি না—হয়তো তাকে অত্যন্ত বিশ্রী অবস্থার মধ্যে ফেলে এলাম। হয়তো তারা ভাবল, এ কি রকমের রক্ষিতা, একজন অচেনা লোকের ইশারায় প্রলুব্ধা হ'য়ে সে তার প্রণয়ীকে ফেলে চ'লে গেল? একজন সৎ বন্ধুর প্রতি আমি যে অত্যন্ত হীন এবং অকৃতজ্ঞ ব্যবহার ক'রে এলাম সে সম্বন্ধে পূর্ণ মাত্রায় আমি সচেতন ছিলাম। আমি জানতাম, আমার এই অমার্জনীয় ভুলের জন্য তাকে আমি চিরজন্মের মতো দূরে সরিয়ে দিলাম এবং আমি যে নিজের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা খেলছি সে সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল ছিলাম। কিন্তু আপনার এই সঙ্গসুখের অপ্রত্যাশিত সুযোগের কাছে তার বন্ধুত্বের অথবা আমার জীবনের কোনো মূল্যই ছিল না। আজকে যখন সব কিছু শেষ হ'য়ে গেছে তখন আর আপনার কাছে গোপন করবার মতো একটা কথাও আমার নেই। আপনাকে আমি এত বেশি ভালবাসতাম যে, মৃত্যুশয্যায় শুয়েও যদি আপনার ডাক শুনতাম, তাহ'লেও আপনার কাছে ছুটে যেতাম আমি।

ট্যাক্সি চেপে আপনার বাড়ি পর্যন্ত এলাম আমরা। সেই পুরনো পরিবেশের মধ্যে ফিরে এলাম আবার। আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে যাওয়ার উপক্রম! যথাযথ বর্ণনার ক্ষমতা আমার নেই—সেই দশ বছর পূর্বের ভাবোচ্ছ্বাস আবার আমায় উদ্বেল ক'রে তুলল। স্মৃতি-বিজড়িত অতীতটা আমার কাছে দূরের বাস্তব ছিল না। আমি একই সঙ্গে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে বাস করতাম। আমার সমগ্র সত্তা আপনার মধ্যে মিশে গিয়েছিল পরিপূর্ণভাবে।

আপনার ঘরগুলো দেখলাম আমি। বিশেষ কোনো পরিবর্তন নজরে পড়ল না। দু'-চারটে ছবির সংখ্যা বেড়েছে। বই দেখলাম আগের চেয়ে অনেক বেশি। দু'-একটা নতুন আসবাবের প্রতিও দৃষ্টি পড়ল আমার। তা সত্ত্বেও সমগ্রভাবে পরিবেশটার মধ্যে পুরনো বন্ধুত্ব পরিচয়সূচক স্বীকৃতি রয়েছে। লেখবার টেবিলে সেই ফুলদানির মধ্যে সাদা গোলাপ—আমারই উপহার দেওয়া গোলাপগুচ্ছ। আগের দিন স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ফুলগুলো পাঠিয়েছিলাম আমি। অথচ আপনি আমার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছেন। এমন কি আজকে যখন আপনি আমায় আলিঙ্গনাবদ্ধ ক'রে রাখলেন তখনও আমি আপনার কাছে অপরিচিতা হ'য়ে রইলাম! কিন্তু আমারই দেওয়া ফুলগুলো যে আদর ক'রে সাজিয়ে রেখেছেন সেই কথা ভেবে খানিকটা সান্ত্বনা ও স্বস্তি পেলাম আমি।

আপনার ওখানেই সমস্তটা রাত কেটে গেল। উন্মাদনাপূর্ণ গৌরবোজ্জ্বল রাতটা জীবনের এক স্মরণীয় চিহ্ন আমার। আপনার দেহ-নৈকট্যের স্বর্গসুখ উপভোগ করবার সময় আমার স্পষ্টতই ধারণা জন্মাল যে, আপনার প্রেমানুভূতির অভিব্যক্তির মধ্যে অকৃপণতার শত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আপনি আপনার স্বভাবের বাইরে যেতে পারেননি। একজন বারাঙ্গনা আর প্রেম-প্রার্থিনীর মধ্যে তফাত কিছু নেই—উভয়ের প্রতি আপনার অনুরাগের গভীরতা একই রকমের। একটা হোটেল থেকে একজন অপরিচিতা নারীকে ডেকে নিয়ে এলেন বটে, কিন্তু তাই ব'লে ভদ্রতা এবং ভালবাসা প্রদর্শনে আপনার ত্রুটি ঘটল না একটুও। আপনার চরিত্রের দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্য আমার কাছে অপরিজ্ঞাত ছিল না। বুদ্ধিদীপ্ত ভালবাসার সঙ্গে দৈহিক কামনার অতি অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছিল আপনার চরিত্রে। এই কারণেই আপনার প্রতি ছেলেবেলা থেকেই আমি এত বেশি আকৃষ্ট হ'য়ে পড়েছিলাম। ঐ একটি বিশেষ মুহূর্তের সুমধুর উত্তেজনার মধ্যে কোনো পুরুষকেই এমন সম্পূর্ণভাবে নিজের অস্তিত্বকে ডুবিয়ে দিতে আমি আগে কখনো দেখিনি। তারপর সময়টা পার হ'য়ে গেলে আপনার চরিত্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। সব কিছু ভুলে যান আপনি। বিস্মৃতির ঘন কুয়াশা ঈষৎপূর্বের অতীতটাকেও ছেয়ে ফেলে চতুর্দিক থেকে। কুয়াশার ছাউনিটা আর কোনোদিনও অপসারিত হয় না।

কিন্তু আমি নিজেও তো নিজেকে ভুলে গিয়েছিলাম। এই অন্ধকারে যে-নারীটি আপনার শয্যাসঙ্গিনী হ'য়ে সময় কাটাচ্ছে সে কে? আমি কি সেই আপনার প্রেমমুগ্ধা কিশোরী মেয়েটি? আমি কি আপনার সন্তানের মা? সত্যিই কি আমি শুধু একজন অচেনা-অজানা স্ত্রীলোক মাত্র? এমন একটা পরমাশ্চর্য রাত্রির বিস্ময় কাটিয়ে ওঠবার আগে মনে হ'তে লাগল, সব কিছুই যেন আমার চেনা—আবার সব কিছুই বুঝি নতুন। মনে মনে আমি প্রার্থনা করতে লাগলাম, আজকের এই আনন্দের নিবিড়তা চিরদিনের জন্য যেন স্থায়ী হ'য়ে থাকে। কিন্তু যথাসময়েই রাত গেল শেষ হ'য়ে।.... ..

পরের দিন ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হ'য়ে গেল। আপনি আমায় ব্রেকফাস্ট খেয়ে যেতে বললেন। নিরিবিলিতে খাবার টেবিলে ব'সে আমরা আলাপ-আলোচনা করলাম। পুরনো দিনের মতো আজকেও দেখলাম আপনি তেমনি বিনয়ী, তেমনি ভদ্র। কথাবার্তার মধ্যে কোনো অহেতুক প্রশ্ন করলেন না। জানতে চাইলেন না কোথায় আমি থাকি, কি নাম আমার। বিন্দুমাত্র কৌতূহল প্রকাশ পেল না আপনার। আমার সঙ্গে আপনার এই সাক্ষাৎ হওয়াটা একটা সাধারণ ব্যাপার ছাড়া আর কিছু নয়। নাম এবং পরিচয়হীন একজন পথের স্ত্রীলোক হিসেবেই আপনার কাছে যেন এলাম, আবার চ'লেও গেলাম। রাতটা শেষ হওয়ার পরে স্মৃতির চিহ্ন সব বিলুপ্ত হ'য়ে গেল।

আলোচনা প্রসঙ্গে আপনি আমায় বললেন যে, বিদেশ-যাত্রায় প্রস্তুত হচ্ছেন। উত্তর আফ্রিকায় দু'তিন মাস ঘুরে বেড়াবেন। ঘোষণাটার মধ্যে যেন আমার সমস্ত সুখের মৃত্যু-বীজ লুকনো ছিল। আপনার পায়ের ওপর লুটিয়ে প'ড়ে বলবার ইচ্ছা হ'ল, "আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো। এত দীর্ঘদিন পরে আমায় তুমি চেনবার সুযোগ পাবে!" কিন্তু বলতে পারলাম না। আমার ভীরু এবং দুর্বল মন পথ রুখে দাঁড়াল। আপনাকে শুধু বললাম, "কি দুঃখের ব্যাপার!" মৃদু হেসে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি সত্যিই দুঃখিত?"

এক মুহূর্তের জন্য আমি বোধহয় উত্তেজনায় উন্মাদ হ'য়ে গিয়েছিলাম। উঠে পড়লাম আমি। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম আপনার দিকে। তারপর বললাম, "আমি যাকে ভালবাসি সে সব সময়েই বিদেশে বেড়াতে যায়।" ভাবলাম, এবার নিশ্চয়ই আমাকে আপনার মনে পড়বে। কিন্তু আপনি একটু

হেসে শুধু সান্ত্বনা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই বললেন, "যায়, আবার কিছুদিন পরে ফিরেও আসে।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক—ফিরে যখন আসে তখন আর মনে রাখে না।"

আমার আবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বর বোধহয় আপনাকে একটু অভিভূত করেছিল। আপনিও উঠে পড়লেন। আমার দিকে সংবেদনশীল দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। তারপর আমার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে বললেন, "ভালো জিনিসগুলো মানুষ সহজে ভোলে না। তোমার কথা আমি মনে রাখব।" খুব মনোযোগ সহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমায় পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন, যেন মনের ক্যানভাসে আমার ছবিটা চিরকালের জন্য এঁকে রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন আপনি। এমন গভীরভাবে আমার ভেতরটা যখন দেখছিলেন তখন আমি ভাবলাম, যাক, এতদিন পর আপনার এই বিস্মৃতির ঘোরটা বুঝি কেটে গেল। এবার আমায় চিনতে পারবেন। মনে মনে বললাম, "এবার আমার কথা মনে পড়বে, নিশ্চয়ই মনে পড়বে!" প্রত্যাশা প্রবল হ'য়ে উঠল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি আপনার কাছে অপরিচিতাই র'য়ে গেলাম। বোধহয় অপরিচয়ের অন্ধকার সেই মুহূর্তে আরও ঘনতর হ'ল। কারণ, একটু পরেই আপনি যা করলেন তা দেখে আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। আপনার আদরের আতিশয্যে আমার চুল সব এলোমেলো হ'য়ে গিয়েছিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি যখন চুলগুলো ঠিক ক'রে নিচ্ছিলাম, তখন দেখতে পেলাম যে, আপনি লুকিয়ে লুকিয়ে আমার হাতের গ্লাভ্‌সের মধ্যে টাকা ঢুকিয়ে রাখলেন। লজ্জায় আর অপমানে আমার প্রায় ভেঙে পড়বার উপক্রম! চোখের জল রুখে রাখতে পারছিলাম না। আপনার গালে চড় বসিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষাও রুখে রাখা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠল। আমি সেই নারী যে ছেলেবেলা থেকেই আপনার প্রেমাবদ্ধা, যে নারী আপনারই সন্তানের গর্ভধারিণী। আপনার সঙ্গে রাত কাটাবার জন্য আজকে আপনি তাকেই লুকিয়ে লুকিয়ে দাম দিচ্ছেন! আপনি আমায় একজন সাধারণ বারাঙ্গনা ব'লেই ধ'রে নিয়েছেন। আপনি যে আমায় ভুলে গিয়েছেন সেটাই আমার একমাত্র শাস্তি নয়, আপনার কাছ থেকে দেহ বিক্রির দাম নেওয়ার হীনতাও আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চান।

জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে চাইলাম। দুঃখের বোঝা বইবার আর শক্তি ছিল না। টুপিটা খুঁজছিলাম। সেটা দেখি আপনার লেখবার টেবিলের ওপর রয়েছে। তারই পাশে সেই ফুলদানিটা। আমার কথা আপনাকে মনে করিয়ে দেওয়ার শেষ চেষ্টা ক'রে বললাম, "একটা সাদা গোলাপ আমায় দেবেন?"

"নিশ্চয়ই—" সবগুলো ফুলই আমার দিকে তুলে ধরলেন আপনি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "হয়তো ফুলগুলো এসেছে এমন একটি মেয়েব কাছ থেকে যে আপনাকে খুব ভালবাসে। নয় কি?"

"হতে পারে—কিন্তু কে যে এগুলো আমায় পাঠিয়েছে জানি না। সেই-জন্যই ফুলগুলো আমার এত প্রিয়।"

আপনার দিকে গভীবভাবে দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে বললাম, "যিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে হয়তো আপনি চিনতেন, এখন ভুলে গিয়েছেন।'

বিস্ময়ের ভঙ্গি আপনাব ফুটে উঠল চোখে-মুখে। আপনার দিকে আমি আরও গভীরতর দৃষ্টি ফেললাম। নিজেব মনেই বলতে লাগলাম, "এখনো কি আমার কথা মনে পড়ছে না? বোধহয পডছে। নিশ্চয়ই চিনতে পারছ।" সমস্ত দেহমন দিয়ে শুধু এইটুকুই আমি চাইছিলাম। কিন্তু ডুবন্ত মানুষেব হাত থেকে যেন শেষ কুটোটাও ফসকে গেল। আপনার মুখে সেই আন্তরিকতাব হাসি, অথচ তাতে স্বীকৃতিব চিহ্নমাত্র নেই। শেষবারের মতো আদব করলেন আমায়, তবুও চেনা-শোনাব বাইরের জগতেই প'ডে রইলাম আমি।

চোখ ভেঙে জল আসছিল আমার। আপনি যেন দেখতে না পান, সেই-জন্য তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম আপনার ঘর থেকে। গতির মুখে আপনাব ভৃত্য জনের গায়ে প্রায় হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিলাম। একধারে স'রে গিয়ে সে দরজা খুলে দিল। সেই অবসরে ওর দিকে একবার দৃষ্টি দিলাম। আমি নিঃসন্দেহ হলাম, সে আমায় চিনতে পেরেছে। ছেলেবেলার পর এই তো সে আমায় প্রথম দেখল। কৃতজ্ঞতায় মন আমাব ভ'রে উঠল। ইচ্ছে হ'ল, নতজানু হ'য়ে ওর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। হাতের ব্যাগ থেকে টাকাগুলো বার ক'রে ওর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। ভয় পেয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল সে। এই একটা মুহূর্তের মধ্যে সে আমায় যতটুকু বুঝতে পারল, আপনি সারা জীবন ধ'রেও তা পারলেন না। প্রত্যেকেই আমায় খাতির করবার জন্য

উদ্‌গ্রীব—শুধু আপনিই আমায় ভুলে গেলেন। শুধু আপনার কাছেই পরিচয়ের স্বীকৃতি আদায় করতে পারলাম না।

আমাদের ছেলেটি মৃত অবস্থায় প'ড়ে আছে। আমাকে ভালবাসবার মতো কেউ আর নেই। এই বিরাট পৃথিবীতে আপনাকে ছাড়া অন্য কারো কথা ভাবতেও পারছি না। কিন্তু আপনার কথা ভেবেই বা লাভ কি? আমি তো আপনার চোখে আজও ধরা পড়লাম না। পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মতো আমার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন, অথচ দেখতে পেলেন না আমায়। শুধু অনন্তকাল ধ'রে আমাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখলেন। এতদিন ভাবতাম, আপনাকে আমি পালিয়ে যেতে দিইনি, আমাদের সন্তানটির মধ্যে আপনাকে ধ'রে রেখেছি। কিন্তু এখন? সে নেই। অন্ধকার রাত্রে নতুন যাত্রাপথে পা বাড়াল সে—আমার কাছ থেকে পালিয়ে গেল। এমন জায়গায় গেল যেখান থেকে আর কখনো ফিরে আসবে না। আমাকেও আবার ফিরে আসতে হ'ল নিঃসঙ্গ জীবনের নির্মম পরিবেশের মধ্যে। আপনার কাছ থেকে কিছুই পেলাম না। একটা সন্তান, একটা মুখের কথা কিংবা এক লাইন লেখা—কিছুই না। এমন কি আপনার স্মৃতি থেকে পর্যন্ত লুপ্ত হ'য়ে গেলাম। কেউ যদি আপনার সামনে আমার নাম উল্লেখ ক'রে কথা কয়, তবুও আপনি ভাববেন, আমি একজন নামপরিচয়হীন অচেনা স্ত্রীলোক মাত্র। আপনার কাছেই যখন মৃতা, তখন আমার কি সত্যি সত্যি ম'রে যাওয়াই উচিত নয়?

আপনাকে আমি অপরাধী করছি না। আপনার আনন্দময় জীবনে দুঃখের বোঝা নিয়ে প্রবেশ করবার অভিপ্রায় আমার নেই। ভয় নেই, আপনার জীবনে ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করব না আমি। এই চিঠিখানা পড়বার সময়টুকু শুধু ধৈর্য ধরতে হবে আপনাকে। ছেলেটা ম'রে রয়েছে—শুধু একটিবারের জন্য মনের কথা খুলে বলবার সুযোগ দিন আমায়। নৈঃশব্দ্যের পাথরটা এতকাল বুকের ওপর চেপে ব'সে ছিল। আজকে সেই পাথরটাকে সরিয়ে ফেলেছি শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলবার জন্য। এই তো আমার প্রথম, এই তো আমার শেষ কথা বলা। তারপর আবার আমি বিস্মৃতির অন্ধকারে বিলীন হ'য়ে যাব। আগের মতো মুখের ভাষাও যাবে স্তব্ধ হ'য়ে। যতদিন বেঁচে থাকব আমার কান্নার

আওয়াজ পর্যন্ত আপনার কানে পৌঁছবে না। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির মতো এই পত্রখানা যখন আপনি হাতে পাবেন তখন আমি আর থাকব না—পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছি চিরদিনের জন্য। হয়তো তখন আপনি আমায় ডাকবেন। ঐ একবারের জন্য আমায় অবিশ্বাসিনী হ'তে হবে। কারণ, মরণের কোলে যে নারী আশ্রয় নিয়েছে সে তো আপনার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না। কোনো ছবি কিংবা স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাচ্ছি না আমি। আপনিও তো আমার জন্য কিছু রাখেননি। আমায় চেনেন না পর্যন্ত। এই অদৃষ্ট নিয়েই তো জন্মেছিলাম। মৃত্যুর পরেও অদৃষ্টের কোনো পরিবর্তন হবে না। শেষ মুহূর্তেও আপনাকে আমি ডাকব না। আমার নাম এবং পরিচয় আপনার কাছে গোপন রেখেই বিদায় নিচ্ছি আমি। মৃত্যু আমার কাছে সহজ হ'য়ে আসবে। কারণ, দূরে ব'সে এ মৃত্যুর কষ্ট আপনি অনুভব করতে পারবেন না। কষ্ট যদি পেতেন তাহ'লে আমার পক্ষে ম'রে যাওয়া অসম্ভব হ'ত।

লিখতে পারছি না আর। মাথা ঝিমঝিম করছে; হাত-পা টনটন করছে খুব, বোধহয় জ্বর এল। শুয়ে পড়তে চাই এবার। হয়তো অনতিবিলম্বে সব কিছু শেষ হ'য়ে যাবে। ছেলেটাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার শেষ দৃশ্যটা হয়তো আমায় আর দেখতে হবে না। ভাগ্য বোধহয় এই প্রথম তাঁর মঙ্গলহস্ত দিয়ে স্পর্শ করবেন আমায়।…হাত আমার আর চলছে না… বিদায় প্রিয়তম, বিদায়। আপনি আমার শত সহস্র ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। যা ঘটল তার চেয়ে ভালো আর কিছু ঘটা সম্ভব ছিল না। শেষ নিশ্বাস নেওয়ার আগে পর্যন্ত আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আমি। সব কিছু আপনাকে ব'লে যেতে পারলাম ব'লে আনন্দের আর সীমা নেই আমার। উপলব্ধি করতে না পারলেও এখন আপনি অবশ্যই অবগত হয়েছেন যে, কি গভীরভাবেই না ভালবাসতাম আপনাকে। এমন ভালবাসা বোঝার মতো আপনার বুকের ওপর চেপে বসবে না। আপনাকে আমি হতাশ করিনি ভেবে কৃতার্থ বোধ করছি, সান্ত্বনাও পাচ্ছি। আপনার সুখের জীবনে কোনোরকম পরিবর্তন না আসাই সম্ভব। আমার মৃত্যুর ফলে আপনার ক্ষতি হবে না ভেবে স্বস্তি পাচ্ছি।

কিন্তু আপনার জন্মদিনে কে আর এখন সাদা গোলাপ উপহার পাঠাবে?

ফুলদানিটা শূন্য থাকবে; আমার একটা অনুরোধ আছে—রাখবেন কি? এটা আমার প্রথম ও শেষ অনুরোধ। আমার কথা ভেবে অন্তত অনুরোধটা রাখবার চেষ্টা করবেন। জন্মদিনে আপনার ফুলদানিটা যেন শূন্য না থাকে। গোলাপ ফুল দিয়ে ফুলদানিটা সাজিয়ে রাখবেন আপনি। মৃত প্রিয়জনদের কল্যাণ কামনা ক'রে মানুষ যেমন গির্জায় গিয়ে প্রার্থনাসভায় যোগ দেয়, আপনিও যেন ঠিক তেমনিভাবে বছরে একবার আপনার জন্মদিবসটি আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করেন। এই দিনটিতেই মানুষ তার নিজের কথা নিজে ভাবে। আমার আর ভগবানের ওপর বিশ্বাস নেই। অতএব আমার জন্য গির্জায় গিয়ে প্রার্থনাসভা ডাকবার দরকারও নেই। আমার নির্ভরতা শুধু আপনার ওপর। আপনাকে ছাড়া অন্য কাউকে আমি ভালবাসি না। আপনার মধ্যেই আমি শুধু বেঁচে থাকতে চাই—বছরের সেই একটা দিন নীরবে, নিশ্চিন্তে আপনাকে কেন্দ্র ক'রে আমার আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেম প্রণয় ভালবাসা সব কিছু বাস্তব দেহ লাভ করুক। এমনি নীরবেই তো এতকাল আপনার সন্নিকটে জীবনটা আমার কেটে গিয়েছে। ওগো প্রিয়তম, আমার অনুরোধ. এইটুকু শুধু ক'রো তুমি—এর বাইরে আমার আর কিছু চাওয়ার নেই···আমার প্রথম ও শেষ অনুরোধটার স্বীকৃতি যেন পাই · শত কোটি ধন্যবাদ···তুমিই আমার একমাত্র প্রেমাস্পদ, তোমায় আমি ভালবাসি ··বিদায় ··

লেখকের চেতনাহীন অসাড় হাত থেকে চিঠিখানা প'ড়ে গেল। অনেকক্ষণ ব'সে ভাবলেন তিনি—গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন। হ্যাঁ, অনেক কথাই আবছা আবছা মনে পড়ছে তাঁর। উল্টো দিকের ফ্ল্যাটে ছোট্ট একটা মেয়ে বাস করত বটে, মেয়েটিকে বড় হ'তেও দেখেছিলেন ব'লে মনে হচ্ছে যেন—হ্যাঁ, নাচের হল্ থেকে অচেনা একটি স্ত্রীলোককে একবার ডেকে এনেছিলেন বৈ কি। সবই অস্পষ্ট, সবই ঝাপসা। একটা দুটো ক'রে অনেকগুলো ছায়া এসে উপস্থিত হ'ল—একটার পেছনে অন্যটা ছুটে চলেছে বটে, কিন্তু তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ একটা মূর্তি গ'ড়ে তুলতে পারছেন না। নানারকমের স্মৃতির টুকরো ভেসে বেড়াচ্ছে; অনুভব করছেন অথচ স্মরণ করতে পারছেন না কিছুই। জীবনের কোনো কোনো সময়ে মূর্তিগুলি তাঁর সামনে এসেছিল তা

ঠিক, পরিষ্কার ভাবে দেখতেও পেয়েছিলেন। তবুও মনে হচ্ছে, মূর্তিগুলি সব স্বপ্নে দেখা—অলীক, অবাস্তব। ফুলদানিটার দিকে দৃষ্টি পড়ল তাঁর। ওটা খালি, একটি ফুলও তাতে নেই। আগে কখনো তাঁর জন্মদিনে ফুলদানিটা শূন্য থাকত না। তিনি যেন বুঝতে পারলেন, হঠাৎ একটা দরজা খুলে গেল। দরজাটা দেখা গেল না বটে, কিন্তু মনে হ'ল, সেই দরজা দিয়ে অন্য এক জগৎ থেকে হাওয়া আসছে—এসে লুটিয়ে পড়ছে তাঁর এই নিরাপদ ঘরটিতে। কেঁপে উঠলেন তিনি। এ হাওয়া ঠাণ্ডা, এ হাওয়া দুরন্ত। এ শুধু মৃত্যুর বার্তা বহন ক'রে আনেনি, মৃত্যুহীন প্রেমের স্মরণীয় সংবাদও এনেছে। মেয়েটির কথা ভাবতে গিয়ে বুকের ভেতরটা তোলপাড় ক'রে উঠল। নিজের অন্তরে কি এক বস্তুর অস্তিত্ব যেন উপলব্ধি করলেন তিনি—দেহহীন, কিন্তু অনুরাগে সিক্ত। দূর থেকে ভেসে-আসা সংগীতের সুরের মতো মনে হ'ল তাঁর।

চন্দ্রালোকিত কানাগলি

ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ আবহাওয়ার জন্য জাহাজটা যখন ফরাসী উপকূলের বন্দরে এসে পৌঁছল তখন সন্ধে পার হ'যে গিয়েছে। আমাকে যেতে হবে আরও দূরে। কিন্তু ট্রেনটা ধরতে পারলুম না। আমাদের বিলম্বের জন্যই গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছিল। পরের দিন ছাড়া গন্তব্যে পৌঁছবার আর গাড়ি নেই। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য আটকে গেলুম। এই অপরিচিত ছোট্ট শহরে সময় কাটাই কি ক'রে? বিশেষ কিছু করবার মতো জায়গা নয় ব'লেই তো মনে হচ্ছে। একটা সন্দেহজনক জায়গা ব লে মনে হ'ল আমার—সেখান থেকে বিষাদপূর্ণ বাজনার সুর ভেসে আসছিল। ওখানে গিয়ে ঢুকে পড়ব কিনা ভাবছিলুম। নইলে তো সহযাত্রীদের সঙ্গে অবাস্তব কথাবার্তা ব'লে সময় কাটাতে হবে। একটা তৃতীয় শ্রেণীর বাজে হোটেলের ডাইনিং-রুমে আমাদের রাত্রি যাপন করতে হবে। সিগারেটের ধোঁয়ায় আর চর্বিযুক্ত খাদ্যের গন্ধে ঘরের হাওয়া ভারি হ'য়ে উঠেছে। এতদিন উন্মুক্ত সমুদ্রের পরিষ্কার হাওয়া খেয়ে এসেছি আমরা। এখন হঠাৎ এই নোংরা পরিবেশের মধ্যে ব সে থাকা অসহ্য হ'য়ে উঠল। আমি ঠিক করলুম, বড় রাস্তা ধ রে পার্কের দিকে হেঁটে বেড়াব। সেখানে স্থানীয় ব্যাণ্ড-পার্টি বাজনা বাজাচ্ছিল। পার্কে ভিড় ছিল খুব। দিনের কাজ শেষ ক'রে বাড়ি গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে খাওয়াদাওয়া শেষ করেছে এরা। তারপর অবসর বিনোদনের জন্য চ'লে এসেছে পার্কে। জনতার স্রোতের সঙ্গে গা ভাসিয়ে দিতে মন্দ লাগছিল না। খানিকক্ষণ পরে এদের কনুই-এর গুঁতো খেয়ে এবং অর্থহীন হাসির আওয়াজ শুনে শুনে নিদারুণ বিরক্তিতে মন আমার বিষিয়ে উঠল। একজন অপরিচিতের দিকে এরা হাঁ ক'রে চেয়ে ছিল। সেইজন্য উত্ত্যক্ত বোধ করতে লাগলুম। তা ছাড়া এতগুলি অজানা মানুষের এত সন্নিকটে দাঁড়িয়ে থাকতেও মনে আমার অসীম বিরক্তির উদ্রেক হ'ল।

অশান্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এলুম। এখনো যেন মনে হচ্ছে জাহাজের দোলানি থেকে মুক্তি পাইনি। ঢেঁকিকলের মতো পায়ের তলায় রাস্তাঘাট সব ওঠা-নামা করছে। গা গুলতে লাগল। জনতার সান্নিধ্য থেকে পালিয়ে এলুম আমি। ঢুকে পড়লুম একটা পাশের রাস্তায়। কি যে নাম রাস্তাটার

তাও জানবার প্রয়োজন বোধ করলুম না। এই রাস্তাটা আরও সরু। গান-বাজনার এবং হৈ-হল্লার আওয়াজ প্রবলতর। দেহের শিরা-উপশিরার মতো এখান থেকে আরও কতগুলো রাস্তা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পার্কে আলোর কোনো অভাব ছিল না। এই অঞ্চলে দেখলুম, আলোগুলো ক্রমশঃই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে আসছে।

এটা যে নাবিকদের শহর তাতে আর সন্দেহ নেই। বন্দরের সংলগ্ন বললেই চলে। স্বল্পালোকিত আবদ্ধ ঘর থেকে পচা মাছের দুর্গন্ধে চতুর্দিকটা বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে। ঝড় না উঠলে এখানকার বিষাক্ত বায়ু পরিষ্কৃত হয় না। আধো-অন্ধকারে আবৃত এই কানাগলিটার পরিবেশ আমার ভালো লাগছে। একা থাকার সৌভাগ্যে খুশি হলুম আমি। এবার আমি ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলুম। সরু গলিগুলো সব নজর দিয়ে দেখছি। প্রত্যেকটা গলি আলাদা ধরনের। একটায় হয়তো প্রেমপ্রণয়ের অভিনয় চলছে, অন্যটা আবার পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ্যের মধ্যে নিমগ্ন। তবে প্রতিটি গলিই অন্ধকার। এবং চাপা কণ্ঠের স্বর আর বাজনার অস্ফুট আওয়াজ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কোথা থেকে যে আওয়াজ আসছে সঠিকভাবে ধরতে পারা যাচ্ছে না। এইটুকু শুধু বোঝা যায় যে, ঐ বাড়িগুলির অভ্যন্তরেই আওয়াজের এই অদৃশ্য উৎস। জানলাদরজা সব বন্ধ। মাঝে মাঝে বাইরের বারান্দায় দেখলুম লাল এবং হলদে রঙের লণ্ঠনগুলো জ্বলে জ্বলে উঠছে।

অপরিচিত শহরের এই সব দেহ-বিক্রয়ের স্থানগুলো দেখলেই আমি চিনতে পারি। এদের প্রতি বিশেষ ধরনের পক্ষপাতিত্ব আমার আছে। জাহাজের নাবিকরা এক রাত্রির সম্ভোগ-আকাঙ্ক্ষায় ছুটে আসে এইখানে। ডাঙায় নেমে ঘণ্টা খানেকের আমোদপ্রমোদের মধ্যে জীবনের স্বপ্ন সার্থক করবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে। এই অঞ্চলগুলো সাধারণত শহরের 'সম্ভ্রান্ত' পল্লী থেকে দূরে দূরে থাকে। এদের জীবনের সরল বাস্তব কাহিনীগুলো ঐ সব সম্ভ্রান্ত পল্লীর আরামপ্রদ সুনির্মিত গৃহগুলি যে সহস্র আব্রুর অন্তরালে লুকিয়ে রাখে তেমন কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। এখানকার ছোট্ট ছোট্ট কামরাগুলোতে তিলধারণের জায়গা থাকে না। নাচবার জন্য জোড়া জোড়া স্ত্রীপুরুষের ভিড়। দেয়ালের গায়ে সিনেমার ঘোষণাপত্র লাগানো রয়েছে। লাস্যময়ী ফিল্ম-তারকারা জনতাকে সিনেমা দেখবার জন্য প্রলুব্ধ করছে। ঘরের সামনে

চৌকো ধরনের লণ্ঠনগুলো মিটমিট করে জ্বলে উঠে পথযাত্রীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে নিভুর্লভাবে। লাল পর্দা দেওয়া জানলার পেছন থেকে ভেসে আসে সুরাপানে মত্ত নাবিকদের কণ্ঠস্বর। একের সঙ্গে অপরের দেখা হ'য়ে গেলে এরা বিকৃতহাস্যে ঘরের বাতাস মথিত ক'রে তোলে। প্রত্যেকের দৃষ্টিতেই কামনার প্রত্যাশা। কারণ, এখানেই ওরা স্ত্রীলোকের সঙ্গ পাবে। জুয়া খেলার আড্ডাও এই কানাগলির ঘরগুলোতে। তা ছাড়া, মদ্যপানের সুযোগসুবিধাও আছে। এমন জায়গায় একরাত্রির জন্য ঝুঁকি নেওয়া নিষ্ফল হবে না। কিন্তু প্রলোভনের সামগ্রী সব বাইরে থেকে দেখা যায় না, আবদ্ধ জানলার পেছন দিকে লুকনো থাকে। ভেতরে ঢুকে খুঁজে নিতে হবে। রহস্যাবৃত পরিবেশের জন্য মানুষ আরও বেশি প্রলুব্ধ হ'য়ে ওঠে। এই একই ধরনের কানাগলির অস্তিত্ব হ্যামবুর্গ, কলম্বো, হ্যাভানা এবং লিভারপুলেও আছে। এখানকার মতো বড় বড় রাস্তা এবং বুলভার্দের আশেপাশে সম্ভ্রান্ত ধনী লোকদের বাসস্থান। বাইরে থেকে দেখতে উঁচু এবং নীচুতলার লোকদের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। প্রায় একই ধরনের ছাঁচ। এইসব বিশৃঙ্খল কানা-গলিতে মানুষ আসে তাদের দৈহিক ক্ষুধা নিবারণের উপায় খুঁজতে। অবাধ যৌনসম্ভোগের গভীর অরণ্য এগুলো। মানুষের সহজ প্রবৃত্তিজাত পাশবিক উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশের গোপন আশ্রয়স্থল। আমাদের স্বপ্নে পর্যন্ত এগুলো বারংবার এসে উদিত হয়।

এই গোলকধাঁধার জগতে এসে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লুম আমি। বর্মাবৃত দু'জন অশ্বারোহী সৈনিক কটিবন্ধে তরবারি ঝুলিয়ে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। মদ্যপানরতা কয়েকজন স্ত্রীলোক তাদের দেখে অশ্লীল রসিকতা করতে লাগল। ঘরের মধ্যে থেকে হাসি-হুল্লোড়ের আওয়াজও আসছিল। তারপর সহসা আওয়াজ এত ক্ষীণ হ'য়ে এল যে, কোনো শব্দই আমি আর যেন শুনতে পাচ্ছিলুম না। আমার চতুর্দিকে নৈঃশব্দ্য বিরাজ করতে লাগল। দু'একটা জানলার খড়খড়ির ফাঁকে ক্ষীণ আলো দেখতে পেলুম আমি। গলিটাতে আলো নেই। কুয়াশায় আচ্ছন্ন ব'লে চন্দ্রালোকও ফিকে হ'য়ে গিয়েছে। অদ্ভুত এক ভুতুড়ে পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে নির্জনতার স্বাদ উপভোগ করতে মন্দ লাগছিল না। আমি জানতুম, আবদ্ধ জানলাগুলোর ওপাশে রহস্যময়, বিপদসংকুল ও ভোগবাসনার লীলাভূমিটা বর্তমান। এই আপাতনৈঃশব্দ্যের

সবটাই মিথ্যে। কারণ, আমি জানি এই নীরবতার মধ্যে সারা পৃথিবীর আবর্জনা পুঞ্জীভূত হ'য়ে আছে। তবুও আমি দাঁড়িয়ে রইলুম কানাগলিতে। মনে হ'ল, এই শহরটার নাম আমি ভুলে গিয়েছি। রাস্তাটাও আর চিনতে পারছি না। এমন কি নিজের নামটাও স্মরণশক্তি থেকে লুপ্ত হ'য়ে গেল। আমি যেন সৈকত থেকে বিচ্যুত হ'য়ে স্রোতের টানে ভেসে চলেছি। দেহটা আমার নিজের আয়ত্তাধীনে নেই, কোন্ এক অজ্ঞাত শক্তির দ্বারা চালিত হচ্ছে। কেন যে আমি এখানে এসে উপস্থিত হলুম তারও কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না। দেহমনের সক্রিয়তার চিহ্ন নেই—পারিপার্শ্বিকের সঙ্গেও যেন সর্বপ্রকার সম্পর্ক-রহিত। তবুও চতুর্দিকেব এই উত্তেজনাময় জীবনপ্রবাহের অস্তিত্ব অস্বীকার করা অসম্ভব। মনে হচ্ছে, আমিও যেন এদের অংশ, নিজের রক্তস্রোতের মধ্যেও ওদের প্রবাহটা মিলেমিশে গিয়েছে। আমার জন্য কোনো কিছুই এখানে সংঘটিত হচ্ছে না, অথচ সবই যেন আমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ওদের ঐ আমোদপ্রমোদ এবং হৈ-হুল্লোড়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই ব'লে যদিও আমি আনন্দ উপভোগ করছিলুম, তবুও আমার অবচেতন মনে কানাগলির অভিজ্ঞতালাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল।

এই সময় গানের সুর শুনতে পেলুম আমি। একটু দূর থেকেই সুরটা ভেসে আসছিল। আবদ্ধ ঘরের দেয়ালে শব্দরোধ হচ্ছিল বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলুম, এ-কণ্ঠ নিশ্চয়ই কোনো জার্মান নারীর। বিদেশে এসে এই রকম একটা কানাগলিতে দাঁড়িয়ে অপরের কণ্ঠে নিজের ভাষা শুনতে পাওয়া যে একটা অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতা তাতে আর সন্দেহ নেই। কণ্ঠসংগীতে পারদর্শিতার অভাব থাকা সত্ত্বেও মনে হ'ল, আমায় যেন আমার জন্মভূমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কে এই জার্মান নারী? অনুচ্চকণ্ঠের সুর কোথা থেকে ভেসে আসছে জানবার জন্য আমি প্রত্যেকটা বাড়ি এক-এক ক'রে পার হ'য়ে যেতে লাগলুম। শেষ পর্যন্ত বিশেষ একটা বাড়ির কাছে এসে থেমে গেলুম। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা দেখতে পাওয়া গেল। জানলার ওপর হাত রেখে কে যেন ঘরের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে তাও আমি বুঝতে পারলুম। দরজা সব বন্ধ বটে, কিন্তু আমি জানি, প্রত্যেকটা ইটের গায়ে আমন্ত্রণের ভাষা লেখা রয়েছে। এই সেই ঘর যেখান থেকে গানের সুর আসছিল ভেসে। এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধা করলুম, তারপর

দরজা ঠেলে চ'লে এলুম ভেতরে। প্রবেশপথের মুখেই একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেলুম। লোকটি রেগে গিয়ে ভ্রূকুটি ক'রে উঠল। তারপর বিড়বিড় ক'রে ক্ষমা চেয়ে গলির পথে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। তার দিকে চেয়ে নিজের মনে বললুম, "কি অদ্ভুত খদ্দের বাবা!" ইতিমধ্যে গানের সুর আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। দ্বিধা-সংকোচ আর রইল না, সাহস ক'রে এগিয়ে গেলুম সামনে।

গান বন্ধ হ'য়ে গেল। সহসা যেন ছুরি দিয়ে কেউ গানের সুর দিল কেটে। ভীতিপ্রদ নিরেট নৈঃশব্দ্য ঘিরে ধরল আমাকে। আমি বোধ হয় কোনো কিছু একটা নষ্ট ক'রে দিয়েছি! ক্রমে ক্রমে ঘরের আধো-অন্ধকার পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় ঘটতে লাগল আমার। ঘরের এক কোণায় মদ্য-পানের জায়গা আছে। আসবাবপত্র খুবই কম। একটা টেবিল আর দু'খানা মাত্র চেয়ার। প্রকৃতপক্ষে এটা ওয়েটিং-রুম। এখানে ব'সে খদ্দেররা অপেক্ষা করে। আসল ব্যবসার জায়গা হচ্ছে পেছন দিকে। আসল ব্যবসা যে কি তাও আমি সহজেই বুঝে ফেললুম। ভেতর দিকে একটা সরু এবং লম্বা পথ। তার দু'দিকে সারি সারি শোবার ঘর। কয়েকটা ঘরের দরজা দেখলুম খোলা রয়েছে। আলোগুলোর ওপর মোটা ঢাকনা দেওয়া। প্রত্যেকটা ঘরেই জোড়া খাটের বন্দোবস্ত। একটি মেয়ে টেবিলের ওপর কনুই ঠেকিয়ে ঝুঁকে ব'সে ছিল। তার মুখের ওপর প্রসাধনের প্রলেপ খুব ঘন। মনে হ'ল, মেয়েটি ক্লান্ত। শ্রান্তির ভারে যেন নুইয়ে পড়েছে। মদ্যপানের জায়গাটার পেছন দিকে একজন মেদবহুল নোংরা ধরনের স্ত্রীলোক আমার চোখে পড়ল। তার পাশে দেখলুম, অন্য একটি যুবতী ব'সে রয়েছে। মেয়েটিকে সুন্দরীই বলা চলে। আমি অভিবাদন জ্ঞাপন করলুম, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমার অভিবাদন স্বীকৃত হ'ল না। এই রকমের একটা ভুতুড়ে নৈঃশব্দ্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ভাবলুম পালিয়ে যাই এখান থেকে। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার যথাযুক্ত কারণ না থাকায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে পড়লুম আমি। তারপর যা হয় হোক।

খদ্দেরকে আপ্যায়ন করবার কর্তব্যের কথাটা হঠাৎ বোধ হয় মনে পড়ল মেয়েটির। সে জিজ্ঞাসা করল, কি ধরনের মদ খেতে আমি ভালবাসি। তার কৃত্রিম ফরাসী ভাষার উচ্চারণ শুনে আমি নিঃসন্দেহ হলুম, মেয়েটি জার্মান। 'বীয়ার' আনতে বললুম। এমন অগোছালভাবে 'বীয়ার' এনে আমার

সামনে রাখল যেন আমি একজন সাধারণ খদ্দের। ঈষৎ পুর্বের নিস্পৃহতার চেয়েও বেশি নিস্পৃহতা দেখাবার চেষ্টা করল সে। এই সব আড্ডার যা নিয়ম সেই নিয়ম মতোই দ্বিতীয় একটা গেলাস নিয়ে এল মেয়েটি, তারপর ব'সে পড়ল টেবিলে। গেলাসটা আমার দিকে তুলে ধ'রে অভিনন্দন প্রকাশ করল বটে, কিন্তু আমার দিকে দৃষ্টি দিল না সে। আমি ওকে ভালো ক'রে দেখলুম। মুখটা এখনো সুন্দর রয়েছে। দেহের গঠনও স্বাভাবিক। কিন্তু মুখোশ-পড়া মুখ। দৈহিক ক্ষুধা মিটে গিয়েছে ব'লেই হয়তো মুখোশ পরতে বাধ্য হয়েছে সে। একটু যেন রুক্ষ। দেহের মাংস একটু ঢিলে। চোখের পাতা ভারি। মাথার চুল দেখলুম অযত্নহেতু এলোমেলো। মুখের দু'দিকে দুটো কুঞ্চনরেখাও চোখে পড়ল আমার। পোশাক-পরিচ্ছদেও যত্নের অভাব। অত্যধিক মদ্য-পান এবং ধূমপানের জন্য গলার স্বর কর্কশ হ'য়ে উঠেছে। ক্লান্তিকর জীবন-ধারণের মধ্যে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছে মেয়েটি। নিতান্ত একটা পুরনো অভ্যাসের জোরেই বেঁচে আছে যেন। হতবুদ্ধির মতো তাকে একটা প্রশ্ন করলুম আমি। আমার দিকে না চেয়েই জবাব দিল। এমন কি ঠোঁট দুটোও নড়ল না ওর। আমি ভাবলুম, আমার উপস্থিতিটা সত্য সত্যই অযাচিত ব'লে ধ'রে নিয়েছে এরা। সেই মেদবহুল বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি ভীষণ-ভাবে হাই তুলতে লাগল। সুন্দরী যুবতীটি কোণার দিকে জুবুথবু ভাবে ব'সে ছিল। সে যেন অপেক্ষা করছিল, কখন আমি তাকে ডাকব। যদি পারতুম তা হ'লে তক্ষুনি আমার সেখান থেকে প্রস্থান করাই উচিত ছিল। কিন্তু হাতপাগুলো পাথরের মতো ভারি ব'লে বোধ হ'তে লাগল আমার। অতএব চুপ ক'রে ব'সে রইলুম আমি। ঘৃণা বোধ হচ্ছিল, অথচ কৌতূহলও কম নয়। সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েটির উদাসীন মনোভাবের জন্যই আমি যেন অধিক মাত্রায় আগ্রহশীল হ'য়ে উঠলুম।

আমার পাশে যে মেয়েটি ব'সে ছিল হঠাৎ সে হি হি ক'রে হেসে উঠল। ঘরের আলোটাও সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠল একটু। বাইরের দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকে পড়েছিল ঘরে। দরজা খুলে নিশ্চয়ই কেউ ঘরে ঢুকেছে।

মেয়েটি জার্মান ভাষায় ব'লে উঠল, "আবার তা হ'লে ফিরে এসেছ দেখছি। কি জঘন্য লোক! বাড়ির চারিদিকে ঘুরঘুর ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে—এসো, ভেতরে এসো। ভয় নেই, এসো।"

প্রথমে আমি মেয়েটির দিকে দৃষ্টি ফেললুম। মনে হ'ল, চোখ-মুখ দিয়ে ওর আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। তারপর পেছন ফিরে দরজার দিকে চেয়ে দেখলুম আমি। এখানে প্রবেশ করবার সময় যে-লোকটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছিলুম, এখন তাকেই দেখলুম দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছে। ভিখিরীর মতো টুপীটা হাতে ধ'রে রেখে অত্যন্ত কাঁচুমাচুভাবে মেয়েটিকে অভিবাদন করল সে। উচ্চ হাসি এবং আমন্ত্রণের ভাষা শুনে ভয়ও পেল খুব। তার পরে বাড়িওয়ালী বৃদ্ধাটি যখন তার পাশের মেয়েটির সঙ্গে ফিসফিস ক'রে কথা বলতে লাগল তখন তার অপ্রস্তুতির আর সীমা নেই।

মেয়েটি তর্জন-গর্জন ক'রে ব'লে উঠল, "যাও, ফ্রাঁসোয়ার কাছে গিয়ে ব'সো। দেখছ না, আমি একজন ভদ্রলোক খদ্দের নিয়ে ব'সে রয়েছি?" প্রত্যেকটা কথাই সে জার্মান ভাষায় বলল। বাড়িওয়ালী আর তার পাশের মেয়েটি হাসতে হাসতে খুন হ'য়ে যাওয়ার উপক্রম। যদিও জার্মান ভাষার একটি কথাও ওদের বোধগম্য হয়নি। লোকটি যে এখানে ঘনঘন আসতে অভ্যস্ত তাতে আর সন্দেহ নেই।

মেয়েটি ঠাট্টার স্বরে অপর মেয়েটিকে বলল, "ফ্রাঁসোয়া, ওকে এক বোতল দামী মদ দাও, ভাই।" তারপর লোকটিকে সম্বোধন ক'রে বলল, "শোনো মশাই, দামী মদ কেনবার পয়সা যদি না থাকে, তাহ'লে এখানে এসে আমাদের শুধুশুধি বিরক্ত ক'রো না। জানি, কোনো কিছু খরচপত্তর না ক'রেই আমায় তুমি পেতে চাও। মাগনা মদ বামুনেও খায়। মাগনা পেলে তোমার মতো বামুন সব কিছুই খেয়ে নেবে। দূর হ'য়ে যা, জানোয়ার কোথাকার।"

বাক্যবাণে লোকটি ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে উঠল। চাবুক-খাওয়া খেঁকি-কুকুরের মতো সে ছুটে চ'লে গেল মদ্যপানের কাউন্টারের কাছে। কম্পিত হস্তে গেলাসে মদ ঢালতে লাগল সে। যে-স্ত্রীলোকটি তাকে গালাগালি দিচ্ছিল তার দিকে তাকাবার চেষ্টা করল লোকটি, কিন্তু সাহস পেল না। মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রাখল। ঘরের ক্ষীণ আলোয় লোকটির মুখ আমি দেখলুম। অতি কৃশ, ক্ষয়প্রাপ্ত মুখের রেখা। এলোমেলো চুলের গুচ্ছ ভুরুর ওপর ঝুলে পড়েছে। প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গই শিথিল, যেন গাঁটগুলো সব ভাঙা। দেহে শক্তি নেই, তবুও সাহসের বাহাদুরি আছে। প্রথম দৃষ্টিতে লোকটির প্রতি সমবেদনার উদ্রেক হয়।

মেয়েটি আমায় ফরাসী ভাষায় বলল, "ওকে নিয়ে মাথা ঘামাবেন না," তারপর আমার হাত চেপে ধ'রে মেয়েটিই বলতে লাগল, "ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক গতকাল থেকে শুরু হয়নি, বহুদিনের পুরনো গল্প ওটা।" বদমেজাজী স্ত্রীলোকটি পাতিশেয়ালের মতো দাঁত বার ক'রে পুনরায় খিঁচিয়ে উঠল, যেন কামড়ে দেবে এক্ষুনি, "এই বুড়ো খেঁকশেয়াল, আমি যা বলি ভালো ক'রে শোনো। সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে প্রাণ বিসর্জন দেব, তবু তোমার সঙ্গে আমি যাব না। বুঝেছ?"

আক্রমণাত্মক বাক্‌চাতুর্য শুনে বাড়িওয়ালীরা আবার সশব্দে হেসে উঠল। এরা বোধ হয় এই রসিকতা উপভোগ করে। এর পর ভয়ানক রকমের একটা ব্যাপার ঘটে গেল। বাড়িউলীর পাশে যে তরুণী গণিকাটি ব'সে ছিল সে এসে লোকটিকে জড়িয়ে ধ'রে আদর করতে লাগল। তরুণীর স্পর্শনৈকট্যে লোকটি এত বেশি সংকুচিত হ'য়ে উঠল যে, নিরুপায় হ'য়ে সে চেয়ে রইল আমার দিকে। ঠিক সেই সময় আমার পার্শ্ববর্তিনী দীর্ঘ নিষ্ক্রিয়তা পরিহার ক'রে সহসা সচেতন হয়ে উঠল—যেন গভীর নিদ্রা থেকে উঠে বসল সে। তার মুখের রেখা এমন বিকৃত রূপ ধারণ করল এবং হাত দুটো তার ক্রোধের উত্তাপে এমনভাবে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল যে, আমি আর ব'সে ব'সে এই কুৎসিত দৃশ্যটা দেখতে পারলুম না। কয়েকটা টাকা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়লুম আমি। কিন্তু স্ত্রীলোকটি আমায় বাধা দিয়ে বলল, "ঐ লোকটির জন্য যদি বিরক্তি বোধ করেন তাহ'লে জানোয়ারটাকে আমি বার ক'রে দিচ্ছি। আমি যা বলব তাই ওকে করতে হবে। আসুন, আর এক গেলাস ক'রে মদ খাওয়া যাক।" স্ত্রীলোকটি আমার গায়ের সঙ্গে ঘনভাবে ঘেঁষে দাঁড়াল। তক্ষুনি আমি বুঝতে পারলুম যে, লোকটিকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সহৃদয়তার ভান করছে সে। কারণ, স্ত্রীলোকটি চটুল দৃষ্টিতে বার বার ক'রে লোকটির দিকে তাকাচ্ছিল। যতবার সে আমার প্রতি আদরের ভাব দেখাচ্ছে ততবারই লোকটি কোণার দিকে জড়োসড়ো ভাবে দেহটাকে কুঁচকে ফেলছে—যেন জলন্ত লোহার শিক গায়ে ফুঁড়ছে ওর। বিরক্তিতে মন আমার ভ'রে উঠল। আমি বুঝতে পারলুম, রাগ এবং ঈর্ষায় জর্জরিত হ'য়ে উঠেছে সে। অথচ যখনি স্ত্রীলোকটি তার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছে তখনি সে ভয়ে মাথা নিচু ক'রে ফেলছে। আমার গায়ের সঙ্গে আরও

ঘন হ'য়ে দাঁড়াল মেয়েটি। আমি অনুভব করলুম, আনন্দে তার সারা শরীর ন'ড়ে ন'ড়ে উঠছে। খেলা করতে ভালো লাগছে তার। বোধহয় স্নান করেনি অনেকদিন, তার ওপর শস্তা দামের পাউডার ব্যবহার করেছে—দুর্গন্ধে গা আমার ঘিনঘিন করতে লাগল। স্ত্রীলোকটিকে একটু দূরে রাখবার উদ্দেশ্যেই পকেট থেকে সিগার বার করলুম। দেশলাই জালাবার সময় পেলুম না। তার আগেই সে চেঁচিয়ে উঠল, "এই—তাড়াতাড়ি একটা দেশলাই নিয়ে এসো।"

লোকটিকে হীন প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্যেই সে তাকে দেশলাই আনবার হুকুম দিল। তার এই ষড়যন্ত্রের অংশ নিতে ঘৃণা বোধ করলুম আমি। লোকটিকে দিয়ে কাজ করাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না আমার। আমি তাই নিজেই তাড়াতাড়ি একটা দেশলাই খুঁজে বার করবার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু স্ত্রীলোকটির হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেচারী কর্মচঞ্চল হ'য়ে উঠল। নিমেষের মধ্যেই একটা দেশলাই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এল সে। তার সঙ্গে আমার দৃষ্টিবিনিময় হ'য়ে গেল। আমি দেখলুম, দৃষ্টিতে তার ভয়-মিশ্রিত লজ্জা। সমবেদনায় অন্তর আমার সাড়া দিয়ে উঠল। জার্মান ভাষায় আমি বললুম, "ধন্যবাদ। শুধু শুধু কেন কষ্ট করতে গেলেন!" হাত বাড়িয়ে দিলুম আমি। দ্বিধা করতে লাগল সে, তারপর সোৎসাহে আমার হাতটা তার শীর্ণ হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে করমর্দন করল। কৃতজ্ঞতায় তার চোখের ভাষা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু একটু পরেই আবার বিষাদবিজড়িত চোখের পাতা দুটো বন্ধ ক'রে মুখ নিচু ক'রে দাড়িয়ে রইল সে। লোকটিকে আমার সঙ্গে বসবার জন্য আমন্ত্রণ করবার প্রবল ইচ্ছা হ'ল আমার। পারলুম না। তার আগেই অত্যন্ত কর্কশ সুরে স্ত্রীলোকটি ব'লে ফেলল, "তোমার জায়গায় গিয়ে ব'সে পড়ো। এখানে আর জালাতন করতে এসো না।"

এর রূঢ় ব্যবহারে আমি শুধু ব্যথিত বোধ করলুম না, মনে আমার অতিশয় ঘৃণার উদ্রেক হ'ল। ভাবলুম, আমি কেন এই বীভৎস একটা গণিকার কার্য-কলাপ সম্বন্ধে মাথা ঘামিয়ে মরছি? তার চেয়ে বরং বাইরের খোলা জায়গায় গিয়ে ঘুরে বেড়ানো ভালো। টাকা ক'টা স্ত্রীলোকটির দিকে ঠেলে দিয়ে আমি উঠে পড়লুম। প্রেমপ্রণয়ের নানারকম ভঙ্গির দ্বারা সে আমার পথ রোখবার চেষ্টা করল বটে, কিন্তু আমি তবু দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম। তাকে আমি

বুঝতে দিলুম যে, তার সৌন্দর্যের দ্বারা আমি জাদুমুগ্ধ হইনি। অতএব, তার এই অপমানকর ব্যবহার মোটেই আমি উপভোগ করছি না। হাজার হ'লেও লোকটি তো আমাদের মতোই একজন মানুষ। ক্রোধের আগুনে স্ত্রীলোকটি জ্বলতে লাগল। হিংস্র মনোভাব প্রবল হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু একটি কথাও সে বলল না. শুধু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল লোকটির দিকে। তার অব্যক্ত ভাষার অর্থ বোধহয় বুঝতে পারল লোকটা। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে মনিব্যাগ বার ক'রে মদের দাম দিতে গেল। ঘাবড়ে গিয়েছে। স্পষ্টতই প্রতীয়মান হ'ল যে, একা-একা আর এখানে স্ত্রীলোকটির সঙ্গে ব'সে থাকবার সাহস নেই তার। অস্বাভাবিকভাবে মনিব্যাগটা হাতড়াচ্ছিল সে। নাবিকদের মতো পয়সা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার অভ্যাস নেই তার। গুনে গুনে পয়সা দিতেই সে অভ্যস্ত।

বিদ্রূপের ভঙ্গিতে স্ত্রীলোকটি বলল, "দেখুন, লোকটার সারা শরীর কি রকম কাঁপছে—কয়েকটা পয়সা খরচ করতে হচ্ছে কিনা, তাই।" তার কাছে এগিয়ে গিয়ে সে-ই বলল আবার, "বড্ড আস্তে আস্তে পয়সা গুনছ বাবা। দাঁড়াও—"

ভয় পেয়ে লোকটি স'রে দাঁড়াল। স্ত্রীলোকটির মুখের ওপর অপরিসীম ঘৃণার ভাব ফুটে উঠতে বিলম্ব হ'ল না। উপহাসের স্বরে সে বলতে লাগল, "তোমার পয়সা আমি নেব না, ভয় নেই। তোমার টাকার ওপর আমি থুথু ফেলি। আমি জানি, আগেই তো বাবা কানাকড়িটি পর্যন্ত গুনে রেখেছ। একটি পয়সা ফালতো খরচ করবার লোক নও তুমি। কিন্তু—" লোকটির বুকের ওপর মৃদু করাঘাত ক'রে জিজ্ঞাসা করল স্ত্রীলোকটি, "ওয়েস্ট-কোটের ভাঁজের মধ্যে যে কাগজের টুকরোটা সেলাই ক'রে রেখেছ সেটার কি হ'ল?"

বুকের ওপর হাত রেখে টিপে টিপে অনুভব করল সে—যেন হঠাৎ তার বুকের তলার মাংসপেশী বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছে। অনুভব ক'রে দেখল, কাগজের টুকরোটা যথাস্থানেই আছে। বিবর্ণ মুখ তার স্বাভাবিক হ'ল।

"ও, মশাই—" চেঁচিয়ে উঠল স্ত্রীলোকটি।

এই সময় লোকটা তার মনিব্যাগটা অন্য মেয়েটির কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—যেন ঘরের মধ্যে আগুন জ্ব'লে উঠেছে। প্রথমে মেয়েটি ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তারপর যখন সে বুঝতে

পারল, লোকটা তার মনিব্যাগটা ফেলে গিয়েছে তখন সে হাসতে হাসতে লুটোপুটি খেতে লাগল।

স্ত্রীলোকটি অনড়ভাবে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। ক্রোধের আগুনে চোখ দুটো তার জলজ্বল করছে। তারপর দেখলুম, চোখের পাতা বুঁজে গেল। দেহটাও গেল নিস্তেজ হ'য়ে। ক্লান্তির ভারে নুইয়ে পড়ল যেন। অকস্মাৎ বয়স বেড়ে গেল তার। একটা পরিত্যক্ত ও পতনোন্মুখ মূর্তির মতো আমার সামনে দুলতে লাগল সে।

একটু পরেই স্ত্রীলোকটি বলতে লাগল, "এই টাকার জন্য লোকটা কাঁদবে। এমন কি থানায় গিয়ে নালিশ করতে পারে যে, আমরা ওর টাকা চুরি করেছি। কাল আবার এখানে এসে যথারীতি উপস্থিত হবে। কিন্তু আমাকে ও পাবে না। না, কিছুতেই পাবে না। যে-কেউ আমাকে পেতে চায় তার কাছেই যাব আমি, কিন্তু ওর কাছে কিছুতেই যাব না।"

মদ্যপানের জায়গাটির কাছে এগিয়ে গিয়ে ঢকঢক ক'রে এক গেলাস কাঁচা মদ খেয়ে ফেলল সে। শয়তানির ছাপ এখনো তার চোখের মধ্যে চকচক ক'রে উঠল বটে, কিন্তু মনে হ'ল, এখন আর তা আগের মতো স্পষ্ট নয়— কুয়াশাচ্ছন্ন। যেন চোখের জলের আড়ালে তা ঢাকা পড়েছে। স্ত্রীলোকটির দিকে দৃষ্টি দিলুম আমি। রাগ হ'ল খুব, করুণার উদ্রেক হ'ল না।

বিদায় নেওয়ার উদ্দেশ্যেই আমি বললুম, "নমস্কার।" জবাব দিল বাড়িউলী, "আচ্ছা, আসুন আপনি।"

রাস্তায় বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলুম, ওরা হাসছে। বিদ্রূপের হাসি।

কানাগলিতে পা দিয়েই মনে হ'ল, অন্ধকার আরও ঘন হ'য়ে এসেছে। নক্ষত্রহীন কালো আকাশটা যেন চতুর্দিক থেকে চেপে ধরল আমায়। কিন্তু একটু পরেই বিবর্ণ এবং মলিন চাঁদের আলো ফুটে বেরুল। স্বস্তি পেলুম যেন। গভীরভাবে নিশ্বাস টানলুম একবার। ঈষৎ পূর্বের ভীতিপ্রদ মনোভাবটা কেটে গেল। মানবভাগ্যের বিস্ময়কর জটিলতার কথা ভেবে দেখবার আবার আমি অবকাশ পেলুম। প্রত্যেকটা আবদ্ধ জানলার পেছন দিকে ভাগ্য তার বিচিত্র লীলারহস্যে প্রতীক্ষমাণ, সেই কথা ভেবে স্বর্গসুখের অনুভূতি এল আমার। এ অনুভূতি যেন উচ্ছ্বাসময় অশ্রুপাতের মতো সহজ এবং

সরল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগাযোগ হয়। দেখবার নৈপুণ্য থাকলেই জগতের নানাবিধ সংঘটন এখানেও ঘটতে দেখা যায়। নোংরা আবর্জনার মধ্যেও পতঙ্গগুলো কৃমি-অবস্থা থেকে নবজীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করে। পূর্বের অভিজ্ঞতাটা এখন আর ঘৃণ্যকারজনক ব'লে মনে হচ্ছে না। বরং ঐ নিষিদ্ধ স্থানের রহস্যময় পরিবেশকে কেন্দ্র ক'রে কল্পনাব জাল বুনতে আমার ভালোই লাগবে।

হোটেলে ফিরে যাওয়ার পথ খুঁজছিলুম আমি। এমন সময় মানুষের একটা ছায়া এসে পডল আমার সামনে। পরিচিত কণ্ঠের স্বর শুনতে পেলুম। লোকটি বললে, "মাপ করবেন, মশাই। আমাব বিশ্বাস, হোটেলে ফিরে যাওয়ার পথ আপনি খুঁজে বার করতে পারবেন না। আমি কি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি? কোন্ হোটেলে থাকেন আপনি?"

হোটেলের নাম বললুম আমি।

অনুরোধের সুরে সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার সঙ্গে আমি যেতে পারি কি? ঐ হোটেলটা আমি চিনি।"

আতঙ্কের শিহবন অনুভব করলুম আমি। ঐ জবুথবু কুশ্রী ধরনের জীবটিকে পাশে নিয়ে হোটেল পর্যন্ত হেঁটে যেতে হবে আমায়! কিন্তু লোকটির বিনীত ভাবভঙ্গি থেকে আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে. আমার সঙ্গে কথা বলতে চায় সে। কল্পনার জাল বুনতে মন আমার ব্যস্ত হ'যে ছিল। অতএব ভাঁড জাতীয় লোকটার সঙ্গ কামনা করবাব ইচ্ছা ছিল না আদৌ। তবুও সে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কথা বেরুচ্ছে না, শ্বাসরোধ হ'য়ে আসছে তার। মনে মনে খুশি হলুম আমি। ভাবলুম, কষ্ট পাক লোকটা। মনেব কথা ব্যক্ত করবার জন্য সংগ্রাম করছে সে। এ সংগ্রাম তার লজ্জাবোধের সঙ্গে। সেই পতিতা স্ত্রীলোকটির কথা মনে পড়ল আমার। অতীত স্মৃতি থেকে নির্গত দূষিত বাষ্পের দুর্গন্ধ পেলুম যেন। না, লোকটার প্রতি করুণা প্রকাশের প্রয়োজন নেই। কথা বললুম না। নৈঃশব্দ্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে দিলুম আমি।

পা চালিয়ে হাঁটতে লাগলুম। আমার মতো পায়ে তাব শক্তি নেই। প্রতি মিনিটে উত্তেজনা বাড়তে লাগল। আমি শুনতে চাইনে, সে তাব মনের কথা বলতে চায়। শেষ পর্যন্ত ভেঙে পডবার মুহূর্তটা এসে উপস্থিত

হ'ল। হঠাৎ সে বলতে শুরু করল, "একটু আগেই আপনি একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে এলেন। আমায় ক্ষমা করবেন···ঘটনাটা আপনার চোখে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক ঠেকেছে···ভাবছেন আমি একজন উপহাসাস্পদ ব্যক্তি। কিন্তু দেখুন ঐ স্ত্রীলোকটি···মানে উনি হচ্ছেন ··" কথা বলতে বলতে থেমে গেল লোকটা। একটু পরেই আবার নিচু স্বরে তাড়াতাড়ি ব'লে ফেলল সে, "দেখুন, উনি হচ্ছেন আমার স্ত্রী।"

আমার চোখেমুখে নিশ্চয়ই বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠেছিল। তাই সে আবার তক্ষুনি বলতে আরম্ভ করল, "অর্থাৎ, চার-পাঁচ বছর আগে উনি আমার স্ত্রী ছিলেন। আপনি যেন ওঁকে খারাপ মেয়েমানুষ ব'লে ভাববেন না। হয়তো আমারই দোষ ··আমার দোষের জন্যই তাঁর আজ এই অবস্থা। আগে উনি এরকম ছিলেন না। ভীষণ গরীব ছিলেন, তা সত্ত্বেও ওঁকে আমি বিয়ে করেছিলুম। পরবার মতো একটাই মাত্র কাপড় ছিল। আমার অবস্থা ছিল সচ্ছল··রোজগারপত্র ভালোই ছিল···হ্যাঁ, সবাই বলত আমি মিতব্যয়ী। কি করব বলুন, আমার বাবা এবং মা-ও একটু কৃপণ ছিলেন। গোটা পরিবারটাই ঐ ধরনের ছিল। তাছাড়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রতিটি পয়সা আমায় রোজগার করতে হয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রীটি ছিলেন খুবই শৌখিন প্রকৃতির সুন্দর সুন্দর জিনিস ভালবাসতেন। গরীবের সংসার থেকে এসেছিলেন, আমি যা দিতুম তার বাইরে ওঁর আর কিছু ছিল না। এই দারিদ্র্যের কথাটা ওঁকে আমি সব সময়েই স্মরণ করিয়ে দিতুম। সত্যি আমারই অন্যায়—দুর্ভাগ্য যখন এসে উপস্থিত হ'ল তখন বুঝতে পারলুম, বড্ড বেশি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্না স্ত্রীলোক তিনি। আজকের ব্যবহার দেখে ওঁকে যেন ভুল বুঝবেন না। আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যই তিনি নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করেন। এইরকমের কুৎসিত জীবন যাপন করছেন বলেই নিজেকে নিজে আঘাত দেন। হয়তো সত্যিই তিনি খারাপ কিন্তু মনে মনে আমি তা বিশ্বাস করি না। কারণ, তিনি যে কত ভালো ছিলেন সেকথা আজও আমি ভুলিনি।"

উত্তেজনার চাপে লোকটি আর কথা বলতে পারছিল না। হাঁটতে হাঁটতে থেমেও গেল। রুমাল দিয়ে চোখ মুছল সে। বিরূপ মনোভাব থাকা সত্ত্বেও তার দিকে চেয়ে দেখলুম আমি। একটু আগের সেই উপহাসাস্পদ ব্যক্তি

ব'লে আর মনে হচ্ছে না। স্ত্রীর সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে মুখের ভাবভাষা সব বদলে গিয়েছে। আমরা আবার এগিয়ে যেতে লাগলুম। লোকটি মাথা নিচু ক'রে হাঁটছিল—যেন ফুটপাতের গায়ে কাহিনীটা তার মুদ্রিত রয়েছে। গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অত্যন্ত শান্ত স্বরে সে আবার ব'লে যেতে লাগল, "দেখুন, খুবই ভালো ছিলেন আমার স্ত্রীটি। আমার প্রতি তাঁর ব্যবহারও ছিল সদয়। দারিদ্র্য থেকে যে তাঁকে আমি উদ্ধার ক'রে এনেছিলুম সেই-জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠা বোধ করেননি কখনো। আমি চাইতুম সব সময়েই তাঁর মুখ থেকে কৃতজ্ঞতার ভাষা শুনতে· ·দেখুন, অপরের মুখ থেকে বাড়িয়ে-বলা নিজের প্রশংসা শুনতে খুবই ভালো লাগত আমার। তাঁর মুখ থেকে যদি চিরকাল আমি ঐ ক'টি কৃতজ্ঞতার কথা শুনতে পেতুম তাহ'লে তার বিনিময়ে আমার টাকাপয়সা সব বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত ছিলুম আমি। কিন্তু তাঁরও তো আত্মমর্যাদাবোধ কম ছিল না। কালক্রমে তিনি অসুবিধা বোধ করতে লাগলেন। বিশেষ ক'রে যখন আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতার কথাগুলো অনবরত আবৃত্তি করবার আদেশ দিতুম তখন তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগত খুব। শেষ পর্যন্ত জামা কাপড় এমন কি এক টুকরো চুলের ফিতের জন্যেও আমার কাছে তাকে হাত পাততে বাধ্য করলুম আমি। তিন বছর এইভাবে নির্যাতন করেছিলুম ওকে। তাঁর কষ্ট ক্রমশ বাড়তেই লাগল। বিশ্বাস করুন, এই কষ্ট দেওয়ার মূলে তাঁর প্রতি আমার ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা। তাঁর আত্মমর্যাদার মনোভাবটি পছন্দ করতুম খুব, অথচ তাঁকে লাঞ্ছিত করতেও দ্বিধা করিনি। কি বোকাই না ছিলুম আমি। কোনো কিছু চাইলেই প্রকাশ্যত বিরক্তির ভাব দেখাতুম। কিন্তু মনে মনে স্বর্গসুখ অনুভব করতুম আমি—কারণ, তাঁর বাসনা চরিতার্থ করবার সুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যে অপমান স্বীকার ক'রে আমার কাছে হাত পাততেন সেটাই ছিল আমার স্ফূর্তির উৎস। তখন আমি বুঝতে পারিনি, কী গভীর ভালবাসাই না ছিল তাঁর প্রতি···"

আবার থেমে গেল লোকটা। ইতিমধ্যে আমার উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়েছে। অতঃপর সে মোহাবিষ্টের মতো বলতে লাগল, "জীবনের সেই অভিশপ্ত দিনটির কথা মনে পড়ছে যেদিন আমি প্রথম অনুভব করলুম, ওঁকে আমি কী নিদারুণ ভালবাসি। আমার স্ত্রী তাঁর মায়ের জন্য সেইদিন সামান্য

ক'টা টাকা সাহায্য চেয়েছিলেন। আমি দিইনি। সত্যিই সামান্য ক'টা টাকা! প্রকৃতপক্ষে টাকা ক'টা তাঁকে দিয়ে দেব ব'লে আলাদা ক'রেও রেখেছিলুম। কিন্তু আমি চেয়েছিলুম, তিনি বার বার আমার কাছে ভিক্ষে চাইতে আসবেন। তারপর সত্যি সত্যি দিয়ে দিতুম তাঁকে···দুঃখের বিষয়, বাড়ি ফিরে এসে দেখি টেবিলের ওপর একটা চিঠি প'ড়ে রয়েছে। চিঠি প'ড়ে জানতে পারলুম, গৃহত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছেন তিনি। লিখে গিয়েছেন: তোমার টাকার বাণ্ডিল নিয়ে ব'সে থাকো তুমি। আমি আর কখনো একটি পয়সাও চাইতে আসব না। ব্যস, এইটুকুই শুধু! দ্বিতীয় আর একটা কথাও তাতে ছিল না। উন্মাদের মতো তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়ে দিলুম আমি। তারপর তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে বেড়ালুম সর্বত্র। সত্যি কথা বলতে কি তাঁর সন্ধান পাওয়ার জন্য খরচা বাবদ পুলিশকেও শত শত টাকা দিলুম। গোপন-দুঃখের কথা প্রতিবেশীদের কাছেও প্রকাশ করেছিলুম। তারা আমায় বিদ্রূপ করতে লাগল। সব রকমের চেষ্টাই আমার ব্যর্থ হ'ল। কয়েক মাস পরে খবর পেলুম যে, একজন পরিচিত লোক তাঁকে ট্রেনে চেপে একটি সৈনিকের সঙ্গে বার্লিন অভিমুখে যেতে দেখেছে। কাজ-কারবার ফেলে রেখে সেইদিনই আমি রাজধানীর দিকে রওনা হ'য়ে গেলুম। অনুসন্ধানের ব্যাপারে আমার হাজার হাজার টাকা নষ্ট হ'য়ে গেল। আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ম্যানেজার এবং অন্যান্য কর্মচারীরা বহু টাকা তছরুপ করেছে। তবু আমি লোকসানের দিকে দৃষ্টি দিইনি· ·বার্লিনে সাতদিন র'য়ে গেলুম···তারপর শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলুম ওঁকে ”

এই পর্যন্ত ব'লে হাঁপাতে লাগল লোকটি। তারপর পুনর্বার বলতে আরম্ভ করল, “বিশ্বাস করুন, একটি কটু কথাও বলিনি তাঁকে· কেঁদেছি, হাত জোড় ক'রে বলেছি যে, আমার যা-কিছু আছে সবই তাঁর যা তিনি চান সবই দিয়ে দিতে প্রস্তুত। কারণ, আমি অনুভব করেছি, ওঁকে ছাড়া আমার পক্ষে জীবনধারণ করা অসম্ভব ··তাঁর প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শুধু নয়, গোটা সত্তাটাই আমার ভালবাসার বস্তু। বাড়িউলীকে প্রচুর টাকা ঘুস দিয়ে বেচারী লিজির সঙ্গে নির্জন ঘরে দেখা করবার অধিকার পেয়েছিলুম আমি। আমাকে দেখে মুখ ওর খড়িমাটির মতো শাদা হ'য়ে গেল। আমার বক্তব্য সব মনোযোগ দিয়ে শুনল। আমার বিশ্বাস আমাকে দেখে লিজি খুশিও

হ'ল। তারপব টাকাপয়সার আলোচনা আমায় তুলতেই হ'ল! আপনি তো বুঝতে পারেন এসব হচ্ছে সাংসারিক ব্যাপার—কিন্তু ঠিক সময় তার সোহাগের বাবুটিকে ডেকে নিয়ে এল সে। আমার মুখের ওপর দু'জনে মিলে এমনভাবে বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগল যে, আমি বোকা ব'নে গেলুম। তবু চেষ্টা করতে ছাড়লুম না। প্রত্যেকদিনই যেতে লাগলুম ওখানে। অন্যান্য যারা ঐ বাড়িউলীর কাছে থাকে তারা বললে যে, সোহাগের বাবুটি লিজিকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। টাকাপয়সা কিছু দিয়ে যায়নি। এই কথা শুনে ওর সঙ্গে দেখা করলুম আমি। টাকা পয়সাও দিলুম। কিন্তু দুঃখের বিষয় নোটগুলো সে আমার সামনেই কুটি কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলল। পরে যখন আবার দেখা করতে গেলুম তখন শুনলুম, ঐ জায়গাটা ত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছে লিজি। আপনার ধারণা নেই ওকে খোঁজবার জন্য কী না আমি করেছি! পয়সা খরচ ক'রে গুপ্তচর নিয়োগ করলুম। একটা বছর খুঁজে বেড়ালুম ওকে। শেষ পর্যন্ত খবর পেলুম, আর্জেন্টিনায় চ'লে গিয়েছে সে··· এবং···এবং একটা গণিকালয়ে বাস করছে।"

লোকটা এবার দ্বিধা করতে লাগল। শেষের কথা দুটো বলতে ওর যেন বুক ফেটে যাচ্ছিল। গলার স্বর এল গম্ভীর হ'য়ে। ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "প্রথমে বিশ্বাস করিনি। তারপর ওর এই পরিণতির জন্য নিজেকেই দায়ী করতে লাগলুম আমি। আমি ওকে লাঞ্ছিত করেছি, হীন প্রতিপন্ন করেছি। আমি তো জানি, আত্মসম্মানবোধ ছিল ওর প্রচণ্ড। কী সাংঘাতিক কষ্টই না যেন পাচ্ছে। আমার উকিলের মারফৎ আর্জেন্টিনায় কন্সালের কাছে চিঠি লিখলুম। সেই সঙ্গে টাকাও পাঠালুম আমি। শুধু একটা শর্ত রইল যে, লিজি যেন জানতে না পারে কে তাকে টাকা পাঠাল। বাড়ি ফেরবার খরচ হিসেবে টাকার পরিমাণ যথেষ্টই ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই 'তার' পেলুম যে, পরিকল্পনাটা আমার কার্যকরী হয়েছে। লিজি ফিরে আসছে। এবং যে-জাহাজে চেপে আসছে সেই জাহাজটা আমস্টারডাম্ বন্দরে অমুক দিনে এসে পৌঁছবে। খবর পেয়ে আমার উত্তেজনা এত বাড়ল যে, তিন দিন আগেই আমস্টারডামে গিয়ে ব'সে রইলুম আমি। যখন দূরে জাহাজের ধোঁয়া দেখতে পেলুম, তখন মনে হ'ল আমি বোধহয় ঘাটে লাগবার সময়টুকুও আর অপেক্ষা করতে পারব না।

এমনি আমার ছটফটানি! শেষ পর্যন্ত যাত্রীদের মধ্যে লিজিকে দেখতে পেলুম। এমন সাংঘাতিকভাবে মুখের ওপর প্রসাধনের প্রলেপ লাগিয়েছে যে, প্রথমে আমি চিনতেই পারিনি। আমাকে দেখে ওর রং-মাখানো মুখটা ফেকাশে হ'য়ে গেল। এমনভাবে দেহটা ওর কাঁপতে লাগল যে, দু'জন নাবিক এসে ধ'রে ফেলল ওকে। বাইরে বেরিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমি এগিয়ে গেলুম লিজির কাছে। আমার গলাটা এত বেশি শুকিয়ে উঠল যে, কথা বলতে পারলুম না। সেও কথা বলল না, এমন কি আমার দিকে চেয়েও দেখল না একবার। কুলীকে ওর মালপত্র তুলে নেওয়ার জন্য ইশারা করলুম। তারপর আমরা হাঁটতে লাগলুম হোটেলের দিকে। হঠাৎ সে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে কি বলব মশাই, আপনি যদি গলার স্বরটা তখন শুনতেন ···ওঃ কী বিষাদপূর্ণ স্বর! ভাবলুম, আমি বোধহয় নিজেই ভেঙে পড়ব··· সে জিজ্ঞাসা করলে, 'সত্যিই কি তুমি আমায় স্ত্রী ব'লে গ্রহণ করতে চাও? এত ব্যাপারের পরেও কি—' মুখ দিয়ে আর ওর কথা বেরুল না। সারা শরীর কাঁপতে লাগল। আমি ওর হাত চেপে ধরলুম। নিঃসন্দেহ হলুম, এবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে· কি বলব মশাই, আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেলুম আমি। হোটেলের কামরায় ঢুকে আনন্দের ঠেলায় নেচে উঠলুম যেন। বলতে লজ্জা নেই লিজির পায়ের কাছে গড় হ'য়ে ব'সে আবোল-তাবোল কত কথাই যে ব'লে ফেললুম। চোখের জল ফেলছিল সে। তবুও দেখলুম, হাসতে হাসতে লিজি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। অবিশ্যি একটু যে বাধো-বাধো ঠেকছিল ওর সেকথা অস্বীকার করব না। তা হোক, লিজির স্পর্শ পেয়ে আমি নবজীবন লাভ করলুম। হৃদয় আমার ভ'রে উঠল। হোটেলের সিঁড়ি দিয়ে বার বার নামা-ওঠা করতে লাগলুম। খাবারের অর্ডার দিয়ে এলুম। লিজিকে বললুম যে, আজকে আমাদের সত্যিকারের বিয়ের উৎসব। ওর জামা কাপড় বদলাবার জন্য সাহায্য করলুম আমি। তারপর একতলায় নেমে গিয়ে ভোজ-উৎসবে মেতে গেলুম আমরা। চতুর্দিকে যেন ফূর্তির ঢেউ বইতে লাগল। মনে হ'ল, লিজি যেন আবার কৈশোরে ফিরে গিয়েছে। ওর ভাবভঙ্গিতে অনুরাগ-উত্তাপের অন্ত নেই। কেমন ক'রে আমরা আবার ভাঙা-সংসার নতুনভাবে গুছিয়ে বসব সেই সম্বন্ধে কত কথা, কত আলোচনা···তারপর ··"

লোকটির কণ্ঠস্বর সহসা অতিমাত্রায় কর্কশ্ হ'য়ে উঠল। এমনভাবে হাতটা তুলে ধরল যেন মনে হ'ল কাউকে সে গলা টিপে মেরে ফেলতে যাচ্ছে। বলতে লাগল সে, "তারপর হোটেলের সেই খাদ্যপরিবেশনকারী লোকটি সেই জঘন্য ইতর ওয়েটারটা ভাবলে আমি মাতাল হ'য়ে গিয়েছি। খুবই হাসছিলুম কিনা···কারণ সুখের আর অন্ত ছিল না ·বিলের টাকা দিয়ে দিলুম তাকে খুচবোটা যখন ফিরিয়ে দিল সে তখন দেখলুম পাঁচ সিকে কম দিয়েছে। ভেবেছিল আমি মাতাল। পয়সা নিশ্চয়ই গুনে নেব না। লোকটাকে ডাকলুম আমি। বাকী পয়সা ফেবৎ চাইলুম। কাঁচুমাচুভাবে সে তখন প্লেটের ওপর খুচরোটা বেখে দিল তারপব সহসা লিজি হো হো ক'রে হেসে উঠল। হতবুদ্ধির মতো লিজিব দিকে তাকিযে রইলুম আমি কি বলব মশাই, ওর হাবভাব সব বদলে গেল। ওর মুখে বাগ এবং বিদ্রূপেব হাসি। সে বললে, 'স্বভাব দেখছি বদলায়নি এমন কি আজকেব এই বিয়ের উৎসব-ভোজ শেষ হ'তে না হ'তেই আবাব সেই পয়সা-পয়সা কবছ।' ঐ খুচরোটার প্রতি এত বেশি নজব দিলুম ব'লে নিজেব কপালে করাঘাত করতে লাগলুম। কিন্তু ব্যাপাবটা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে ছাড়িনি ·তা সত্ত্বেও আমোদ-আহ্লাদে আর যোগ দিল না লিজি। ওর মনে বিন্দুমাত্র আর স্ফূর্তি রইল না। নিজের জন্য একটা আলাদা কামরা চাইল সে · আমার যা মনেব অবস্থা তখন সব বকম খেয়াল মেটাবার জন্য প্রস্তুত আমি। সাবা রাত একলা ঘরে জেগে শুয়ে বইলুম ভাবছিলুম, আগামীকাল দামী জিনিস একটা উপহার দেব ওকে আমায় যেন লিজি আর কৃপণ না ভাবে। পবের দিন ভোরবেলা বেরিয়ে পড়লুম একটা গহনা কিনে ফেললুম, ব্রেস্‌লেট্। কিন্তু ফিরে এসে দেখি, হোটেল ত্যাগ ক'রে চ'লে গিয়েছে সে। চিঠিপত্র কিছু লিখে রেখে গিয়েছে কিনা খুঁজতে লাগলুম ·মনে মনে আশা করছিলুম চিঠিপত্র যেন না পাই কিন্তু ড্রেসিং-টেবিলের ওপব চিঠি একটা ছিল ·লিজি লিখেছে—"

লোকটা আবারও দ্বিধা করতে লাগল। আমি নিঃশব্দে তার বেদনা-পীড়িত মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলুম। শেষ পর্যন্ত লোকটা মাথা নিচু ক'রে অস্ফুট স্বরে বলল, "সে লিখে গিয়েছে, 'আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও। তোমার মতো একটা কুৎসিত লোকের সঙ্গে বাস করা অসম্ভব।' "

হাঁটতে হাঁটতে আমরা প্রায় বন্দর পর্যন্ত এসে গিয়েছি। নিঃশব্দ পরিবেশ। শুধু মহাসাগরের ঢেউগুলো পাড়ে এসে ভেঙে পড়ছে ব'লে সমুদ্রতট থেকে আওয়াজ উঠছে। জাহাজগুলোতে আলো জ্বলছে। মনে হয় আলোগুলো যেন বৃহদাকার জন্তুর চোখের মতো জ্বলজ্বল করছে। দূর থেকে গানের একটা অস্পষ্ট সুর ভেসে আসছিল। শহরটা ঘুমিয়ে পড়েছে। হয়তো বিরাট একটা স্বপ্নের মধ্যে ডুবেও গিয়েছে। আমার সামনে শুধু দাঁড়িয়ে রয়েছে সদ্য-পরিচিত লোকটার একটা কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি। মূর্তিটা যেন ক্রমশই বড় হ'তে হ'তে অপার্থিব হ'য়ে উঠল—তারপর আবার যেন ক্ষুদ্রাকার বিন্দুর মতো মিলিয়ে গেল অদূরের ঐ কম্পমান আলোর মধ্যে। কথা বলবার ইচ্ছা ছিল না আমার। সান্ত্বনা দেওয়ার কিংবা প্রশ্ন করবার বাসনাও আমার নেই। চতুর্দিকের নৈঃশব্দ্যটা ক্রমশই ভারি হ'য়ে উঠছিল। এমন সময় লোকটি সহসা আমার হাত চেপে ধ'রে কম্পিত কণ্ঠে বলতে লাগল, "দেখুন, ওকে এখানে ফেলে রেখে শহরটা আমি কিছুতেই ত্যাগ করব না। বহুদিন অন্বেষণের পর ওকে আমি পেয়েছি আমাকে সে যত কষ্টই না দিক, ভেঙে পড়ব না আমি। আপনাকে আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি, লিজির সঙ্গে একবারটি আপনি কথা ক'য়ে দেখুন আমার সঙ্গে সে কথা কইতে চায় না। যেমন ক'রেই হোক আমার সঙ্গে ফিরে যেতে ওকে রাজী করাতেই হবে আপনি একবার ওকে বলুন না? দয়া ক'রে একবারটি শুধু ওকে বলুন এই রকম হন্যে কুকুরের মতো আর কতকাল বাস করব আমি! অন্য লোক সব ওর কাছে যায় এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না। লিজির কাছে কেন ওরা যায় তা আমি জানি। মাতাল অবস্থায় লোকগুলো হৈ-হল্লা করতে করতে ওখান থেকে বেরিয়ে আসে, আর আমি পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যগুলো দেখি। কানাগলির সবাই আমায় এখন চিনে ফেলেছে। পথে দাঁড়িয়ে লিজির জন্য অপেক্ষা করছি দেখে ওরা আমায় কী সাংঘাতিক বিদ্রূপ করে আমি বোধহয় পাগল হ'য়ে যাব, কিন্তু তা সত্ত্বেও জেগে জেগে পাহারা দেব আমি। আপনি অপরিচিত জানি, তবুও আপনাকে আমি হাতজোড় ক'রে অনুরোধ করছি, লিজির সঙ্গে আমার হ'য়ে একবার কথা বলুন। আপনি ওর নিজের দেশের লোক···হয়তো এই বিদেশের পরিবেশে আপনার কথা কানে তুলবে সে।"

লোকটি আমার হাত চেপে ধরেছিল। হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলুম। ঘৃণা এবং বিরক্তিতে মন আমার ভ'রে উঠেছিল। যখন সে বুঝতে পারল আমি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চ'লে যাচ্ছি তখন সে পথের ওপর ব'সে প'ড়ে পা জড়িয়ে ধরল আমার। বলতে লাগল লোকটা, "দোহাই আপনার, লিজির সঙ্গে একবারটি দেখা করুন। আপনাকে দেখা করতেই হবে, নইলে সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটে যাবে। ওকে খুঁজে বার করবার জন্য সব টাকা আমার খরচ হ'য়ে গেছে, আমার লিজিকে এখানে আমি ফেলে যাব না ·অন্তত জীবন্ত অবস্থায় তো নয়ই। আমি একটা ছোরা কিনেছি। মহাশয়, আমার বিনীত অনুরোধ—একবারটি, শুধু একবারটি ওর সঙ্গে কথা বলুন আপনি ·"

বদ্ধ উন্মাদের মতো জড়োসড়োভাবে আমার পায়ের কাছে ব'সে রইল সে। ঠিক এই সময় দু'জন পুলিশের সেপাই এসে উপস্থিত হ'ল। তাকে আমি জোর ক'রে টেনে তুললুম। হতাশ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর একেবারে অন্যরকম সুরে সে বলল, "এগিয়ে গিয়ে ডান দিকের রাস্তা ধরবেন। ওখান থেকে হোটেলটা এর ঠিক অর্ধেক পথ।"

শেষবারের মতো সে আমার দিকে আবার একবার তাকিয়ে রইল। মনে হ'ল, মহাশূন্যতার মধ্যে দৃষ্টির প্রসারতা গেল তলিয়ে। তারপর অন্তর্হিত হ'য়ে গেল সে।

ঠাণ্ডা পড়েছিল খুব। ক্লান্ত বোধ করতে লাগলুম। মাতালের মতো মোহাচ্ছন্ন হ'য়ে গিয়েছিলুম। বুঝতে পারছি ঘুম আসছে, কিন্তু কেমন যেন একটা অসারতাবোধ এসে সমস্ত অস্তিত্বটাকে ছেয়ে ফেলল আমার। নিজের মনে ঘটনাগুলোকে উল্টেপাল্টে ভেবে দেখতে চেয়েছিলুম। পারলুম না। বিছানায় শুয়ে পড়তেই গভীর নিদ্রায় ডুবে গেলুম আমি।

পরের দিন যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হ'য়ে গিয়েছে। অপরিচিত শহরের অজানা মানুষ আমি। ভেবেছিলুম, গতকল্যের ব্যাপারটা সম্বন্ধে খোঁজখবর নেব। কিন্তু মন বলল, দরকার নেই। বাস্তব থেকে স্বপ্নটুকুকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ কাজ নয়। কারুকার্যের জন্য প্রসিদ্ধ একটা গির্জা দর্শনের জন্য বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু দেখতে পারলুম না, দৃষ্টি আমার কুয়াশাচ্ছন্ন।

গতরাত্রের ঘটনাগুলো মনের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। নিজের অজ্ঞাতসারে আবার আমি সেই কানা-গলিটার উদ্দেশেই রওনা হ'য়ে গেলুম। কিন্তু রাত্রি ছাড়া অন্য সময়ে এইসব রাস্তাগুলো প্রাণহীন মৃতের মতো প'ড়ে থাকে। খুব বেশি যাওয়া-আসার অভ্যাস না থাকলে দিনের বেলা এখানকার ঠিকানা খুঁজে বার করা সম্ভব হয় না। অনেক খুঁজলুম, কিন্তু সেই বিশেষ রাস্তাটিতে এসে পৌছতে পারলুম না আমি। হতাশ হ'য়ে ফিরে এলুম হোটেলে। গতরাত্রের দৃশ্যটা চোখের সামনে ভাসছে। হয় এটা আমার বিকৃত মস্তিষ্কের কল্পনা, নয়তো বাস্তব সংঘটনের সত্যিকার আলেখ্য।

রাত ন'টায় সময় ট্রেন ছাড়বার কথা। শহরটা ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছিল আমার। কুলীর মাথায় মালপত্র চাপিয়ে দিয়ে স্টেশনের দিকে রওনা হ'য়ে পড়লুম। একটা মোড়ের মাথায় এসে দেখলুম সেই বাড়িটাতে পৌছবার পথটা সামনেই রয়েছে। কুলীটাকে অপেক্ষা করতে ব'লে ঢুকে পড়লুম গত-রাত্রের কানাগলিটাতে। যাওয়ার আগে বাড়িটা একবার দেখে যাওয়ার ইচ্ছা হ'ল।

হ্যাঁ, এই তো সেই ঘর। গতরাত্রের মতোই অন্ধকার। খড়খড়ির ওপর চন্দ্রালোকের মতো আলো দেখতে পেলুম। এগিয়ে যেতেই দেখতে পেলুম, অন্ধকার থেকে সেই লোকটি বেরিয়ে এল। ইশারা ক'রে ডাকল আমায়। কিন্তু ভয় পেয়ে গেলুম। পালিয়ে এলুম কানাগলি থেকে। ট্রেন ফেল্ করবার ইচ্ছা আমার ছিল না। একটু দূরে স'রে এসে আবার আমি পেছন দিকে দৃষ্টি ফেললুম। লোকটা দেখলুম ভেতরে ঢুকছে। হাতে তার কি যেন একটা ঝকঝক ক'রে উঠল। টাকা, না সেই শানিত ছোরাটা চন্দ্রালোকে বিশ্বাস-ঘাতকতার সংকেত জ্ঞাপন করল?

লেপোরেলা

ক্রেসেনটিয়া আনা আলোশিয়া ফিন্‌কেন হিউবাবের বয়স উনচল্লিশ। পিতা মাতার পরিচয় কিছু নেই—অবৈধ সন্তান। ইনস্‌ব্রাকের কাছাকাছি পাহাড়ের ওপর ছোট্ট একটা পাড়া গাঁয়ে জন্মেছিল মেয়েটি। সরকারী পরিচয়পত্রে তাকে দাসী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বৈশিষ্ট্যের তালিকায় কোনো কিছু উল্লেখ নেই। কিন্তু যেসব সরকারী কর্মচারীরা পরিচয়পত্রটি তৈরি করেছেন তাঁরা যদি ওর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা লিখতেন তাহ'লে নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিতেন তাঁরা . "অস্থিচর্মসার লিকলিকে অতি-ক্লান্ত একটি পাহাড়ী ঘোড়া।" সত্যি কথা বলতে কি, ওর ঠোঁটের তলার দিকটা ঘোড়ার মতোই দেখতে। চোখ দুটিতে কোনো রকম ভাবের প্রকাশ নেই, বুদ্ধিশূন্যতায় ভরপুর। এমন কি চোখের পাতায় লোমের অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। তার ওপর মাথার চুলগুলোও অত্যন্ত রুক্ষ। চলাফেরার ভঙ্গিটা খচ্চরের মতো কাটখোট্টা এবং গোঁয়ার ভাবাপন্ন। খচ্চরের মতো ভাগ্যহীন পশু বড় কমই দেখা যায়। শীত গ্রীষ্মের সব সময়েই প্রস্তরময় কিংবা কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে ওপর থেকে কাঠ ব'য়ে আনতে হয়। আনার অবস্থাও তদনুরূপ। কাজের চাপ থেকে মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম পেলে মাটিতে ব'সেই ঝিমতে থাকে—ঠিক ঐ খচ্চরের মতোই সে যেন দিনের শেষে আস্তাবলে ফিরে এসে অশেষ ধৈর্য সহকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিশ্রামের সুখ উপভোগ করে। বুদ্ধিহীনতার এর চেয়ে বড় নিদর্শন খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। ওর সব কিছুই রুক্ষতায় এবং রসকসহীন শুষ্কতায় পরিপূর্ণ। চিন্তাভাবনার বালাই নেই। থাকলেও ব্যাপারটা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ওর পক্ষে। নতুন চিন্তা মাথায় ওর ঢুকতে চায় না। ঢুকলেও ঝাঁঝরির আবদ্ধ ফুটো ঠেলে ঢোকবার মতো আয়াসসাধ্য ঘটনায় পরিণত হয়ে ওঠে। কিন্তু একবার যদি নতুন চিন্তা মাথার মধ্যে প্রবেশ করে তাহ'লে সে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে থাকে হাড়-কৃপণের মতো। পড়াশোনা করে না, এমন কি খবরের কাগজ কিংবা তার প্রার্থনা-পুস্তকটিও হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে না। সে কোনো কিছু লেখবার দরকার হ'লে প্রাণান্ত হ'য়ে ওঠে। বাজারের হিসেব লিখতে হয়। তাও অক্ষরগুলো ওর নিজের দেহের মতোই কুৎসিত এবং বেঢপ। নারীদেহের

কমনীয়তাবর্জিত। গলার আওয়াজও ওর ঐ কঠিন ও রুক্ষ দেহের মতো কর্কশ। উচ্চারণের মধ্যে টাইবল দেশের বিশেষত্ব থাকা সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরে মরচে ধরা কবজার ন্যায় ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয়। ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজটা বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। কারণ, দরকার না হ'লে আনা কারো সঙ্গে কথাই বলে না। কেউ ওকে কখনো হাসতে দেখেনি। এই ব্যাপারেও 'বোবা পশুদের' সঙ্গে ওকে তুলনা করা যায়। ওদের চেয়েও আনার অবস্থা অনেক বেশি বেদনাপূর্ণ। মনের আনন্দকে হাসির মধ্যে দিয়ে ভাষা দেওয়ার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে।

অবৈধ ব'লে ওকে ছেলেবেলা থেকে নির্ভর করতে হয়েছে সমাজের পাঁচ-জনের ওপর। তাদের কাছেই মানুষ হয়েছে সে। বারো বছর বয়সে তারা ওকে চাকরানীর কাজ দিয়ে একটা রেস্তোরাঁয় পাঠিয়ে দেয়। পশুর মতো কাজ করবার সুনাম অর্জন করল সে। তারপর বড় রাস্তার ধারেই একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেলের রাঁধুনীর পদে উন্নীত হ'ল আনা। ভোর পাঁচটার সময় উঠত সে। ঘরবাড়ি ঝাড়পোঁছ করা থেকে বাসন মাজা এবং রান্না করতে করতে রাত হ'যে যেত অনেক। একটা দিনের জন্যও ছুটি চায়নি কখনো। রাস্তায় বেরুত না, শুধু গির্জায় যাওয়া-আসা করত। উনোনের আগুনটা ছিল ওর কাছে রোদের তাপ। সন্নিকটের জঙ্গলের সঙ্গে পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু সেখান থেকে কাঠের টুকরো কেটে কেটে সংগ্রহ ক'রে আনবার কাজই শুধু করেছে বছরের পর বছর।

পুরুষমানুষ সম্বন্ধে কোনো রকম কৌতূহল ছিল না আনার। হয়তো পঁচিশ বছর ধ'রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো কাজ করবার ফলে যেটুকু স্বাভাবিক নারীসুলভ কমনীয়তা ওর ছিল সেসব নষ্ট হ'যে গিয়েছিল। হয়তো সেই জন্যই প্রণয়োদ্দীপক ব্যাপারগুলি অত্যন্ত অরুচিকর ব'লে ভাবত সে। ওর একমাত্র আনন্দ ছিল অর্থসঞ্চয়ের মধ্যে। চাষী-মেয়েদের মতো টাকা জমিয়ে রাখবার স্বভাব ছিল ওর। বৃদ্ধ বয়সে আবার যদি পরের ওপর নির্ভর করতে হয় সেই কথা ভেবে ভয় পেত আনা। সে জানে, পরের দেওয়া অসম্মানের অন্ন খেলে ওর কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসবে।

আনার বয়স যখন সাঁইত্রিশ তখন সে টাকার লোভে নিজের দেশ টাইরল ত্যাগ করতে রাজী হ'য়ে গেল। চাকরি খুঁজে দেওয়ার এক সংস্থার মহিলা-

ম্যানেজার এসেছিলেন টাইরলে। গ্রীষ্মের ছুটি উপভোগ করবার উদ্দেশ্যেই তিনি এসেছিলেন এখানে। আনার এই ভূতের মতো কাজ করবার উদ্দীপনা দেখে তিনি খুব অবাক হ'য়ে গেলেন। তিনি ওকে একদিন বললেন যে, ভিয়েনায় গেলে সে এর দ্বিগুণ টাকা রোজগার করতে পারবে।

ট্রেনে চেপে ভিয়েনা চলল আনা। নিজের আসনটিতে আপনমনে মৌনীর মতো নীরব হ'য়ে ব'সে রইল সারাটা পথ। কোলের ওপর একটা ঝুড়ি। ওর যাবতীয় জিনিসপত্র সব ঐ ঝুড়িটার মধ্যেই গুছিয়ে এনেছে সে। ঝুড়িটার ওজন বড় কম ছিল না, পায়ে ব্যথা লাগছিল। সহযাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ বলল যে, ঝুড়িটা না-হয় তাকের ওপর তুলে রাখা হোক। কিন্তু রুক্ষ স্বভাবের স্ত্রীলোকটি ঝুড়িটা হাতছাড়া করতে রাজী হ'ল না। কারণ, জুয়াচোরদের হাতে গিয়ে সর্বস্ব খইয়ে বসতে পারে। ভিয়েনার মতো বড় শহরটা সম্বন্ধে এই রকমই ধারণা ছিল ওর।

ভিয়েনায় পৌছে রাস্তাঘাট চিনতে কয়েকদিন সময় লাগল আনার। বিশেষ ক'রে একা একা বাজারে যেতে ভয় পেত সে। রাস্তায় ঘাটে কী সাংঘাতিক গাড়ি-ঘোড়ার ভিড। কিন্তু গোটা চার রাস্তা যখন সে চিনে ফেলল তখন আর বাজারে যাওয়া-আসা করতে ভয় পেত না। হাতে একটা ঝুড়ি নিয়ে বাজার করতে যেত। নতুন একটা বাড়িতে কাজ পেয়েছে। ঝাড়পোঁছ থেকে শুরু ক'রে রান্নাবান্না সবই করতে হয়। টাইরলে যেমন রাত ন'টার সময় ঘুমতে যেত, এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। ঘুমবার কায়দাটাও পশুর মতো। মুখটা হাঁ ক'রে ঘুময। আর কী সাংঘাতিক ঘুম! সকালবেলা ঘুম থেকে তুলে দিতে হয়। নতুন কাজটা ওর পছন্দসই হয়েছে কিনা তাও কারো জানা নেই। হয়তো নিজেও জানে না। গাম্ভীর্য ওর অটুট রয়েছে। যখনই কোনো কাজ করবার হুকুম পায় তখনই সে শুধু বলে, "আচ্ছা।" দ্বিতীয় কথাটি আর নয়। অন্যান্য চাকরবাকরদের আমল দেয় না। তাদের হাসিঠাট্টার প্রতিও কান দেয় না সে। একবার শুধু সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছিল। ওর টাইরল দেশের উচ্চারণ শুনে একজন চাকরানী সব সময়ই হাসি-তামাশা করত। একদিন সে উনোন থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে তেড়ে গেল তার দিকে। ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল চাকরানীটা। এর পর থেকে আর কেউ ঠাট্টা করতে সাহস পেত না।

প্রত্যেকদিন রবিবার সকালে ভালো জামাকাপড় প'রে গীর্জায় যেত আনা। একবার পুরোদিনের জন্য ছুটি পেয়েছিল সে। ভিয়েনা শহরটা দেখবার ইচ্ছে হ'ল। ট্রামে চাপবে না। হাঁটতে হাঁটতে চ'লে এল ডেন্যুব নদীর ধারে। একদৃষ্টিতে নদীর স্রোতের দিকে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ। নদীটাকে ওর যেন পুরনো বন্ধু ব'লে মনে হ'ল। তারপর জনমুখর বড় বড় রাস্তাগুলো এড়িয়ে গিয়ে ফিরে চলল বাড়ির দিকে। ঘুরে বেড়ানো ব্যাপারটা আনার বোধহয় ভালো লাগেনি। কারণ, দ্বিতীয় দিন আর বাড়ির বাইরে ওকে বেড়াতে দেখা যায়নি। রবিবারের অবসর-সময়টাতে হয় সেলাইফোঁড়াই করে, নয়তো ব'সে থাকে জানলার ধারে। রাজধানীতে আসবার পরেও একঘেয়ে জীবনে ওর কোনো পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা গেল না। একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন যা এল তা হচ্ছে, মাসের শেষে দু'খানা নোটের পরিবর্তে চারখানা ক'রে নোট পাচ্ছে সে। মাইনে ডবল হয়েছে। মনের সন্দেহ ওর কাটেনি। প্রত্যেকটা নোট বার বার পরীক্ষা ক'রে দেখে। আলাদা আলাদা ক'রে নোটগুলোকে ভাঁজ করে। টাইবল থেকে সে একটা কাঠের বাক্স নিয়ে এসেছে। সেই বাক্সে অন্যান্য টাকার সঙ্গে নতুন উপার্জনের নোটগুলোও রেখে দেয়। এই ছোট্ট কাঠের বাক্সটার ধনভাণ্ডারের মধ্যেই ওর জীবনের সর্বপ্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্যটি সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে আনা। রাত্রিবেলা বালিশের তলায় বাক্সের চাবিটা সে রেখে দেয়। দিনের বেলা কোথায় যে রাখে কেউ তার সন্ধান জানে না।

এই ভুতুড়ে জীবটির ঐগুলিই ছিল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। স্বাভাবিক কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে ব্যারন ফন লিভারশাইনের বাড়িতে কাজ করা সম্ভব ছিল না। এখানে এত বেশি ঝগড়াঝাঁটি হ'ত যে, চাকরবাকররা অল্পদিন কাজ করবার পরেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চ'লে যায়। বাড়ির যিনি গৃহিণী তাঁর অকারণ কটূক্তি কেউ সহ্য করতে পারত না। একজন ধনী ব্যবসায়ীর বয়স্কা কন্যা ছিলেন ইনি। একবার কোথায় স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বেড়াতে গিয়েছিলেন। ব্যারনের সঙ্গে সেখানেই এই ভদ্রমহিলার পরিচয় হয়। ব্যারন ছিলেন এঁর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। এমন কিছু বনেদী ঘরেও জন্ম হয় নি তাঁর। কিন্তু আচার-ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত বিনয়ী এবং ভদ্র। দেখতে সুপুরুষ। দেনায় ডুবে ছিলেন। অতএব টাকার লোভে ধনী পিতার

কন্যাটিকে বিয়ে করতে রাজী হ'য়ে গেলেন। পিতামাতার আপত্তি ছিল। তাঁরা ব্যারন ফন লিভারশাইমের চেয়ে যোগ্যতর পাত্রের অনুসন্ধান করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এদের বিয়েতে মত দিতে হ'ল। বিয়ের পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই ভদ্রমহিলা আবিষ্কার করলেন যে, পিতামাতার সন্দেহ মিথ্যে হয়নি। যুবক স্বামীটি তাঁর বাজে কাজ ক'রে বেড়াচ্ছেন এবং কত টাকা যে বাজারে তাঁর ঋণ আছে সে-সম্বন্ধেও তিনি স্ত্রীর কাছে সঠিক বিবরণ কিছু দাখিল করেননি।

দায়িত্বহীন লোকেদের মতো সদাচারী, গল্পগুজব ক'রে সময় কাটাবার পক্ষে সঙ্গী হিসেবেও ভালো, কিন্তু নীতি-নিয়ম কিছু মানেন না। হিসেব ক'রে টাকাপয়সা খরচ করাটাকে তিনি সাধারণ নাগরিকদের মানসিকতা ব'লে গণ্য কবেন। বিয়ের পরেও স্বামীটি তাঁর আগেব মতো অপব্যয়ী রইলেন। পিতামাতার সংসারে যেমন নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে বাস ক'রে এসেছেন স্ত্রী চাইলেন ঠিক সেইভাবেই জীবন যাপন করতে। স্ত্রীর এই মধ্যবিত্তসুলভ মনোবৃত্তি ব্যারনের বনেদী মনে পীড়া দেয় খুব। মহিলাটির টাকার কোনো অভাব ছিল না। তিনি খরচপত্র সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করলেন। স্বামীব উদ্ভট ব্যবসাবাণিজ্যে টাকা ঢালতে অস্বীকার ক'রে বসলেন। স্ত্রীব এই উদ্ধত স্বভাবের প্রতি ক্রমশই তিনি বিরক্ত এবং অপমানিত বোধ করতে লাগলেন। অসৎ ব্যবহার কিছু করলেন না, সব ব্যাপারটাকে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মতো অগ্রাহ্য করলেন। স্ত্রীব মনে হতাশার হাওয়া বইতে লাগল। যখন তিনি তিরস্কার করেন, তখন তাঁর স্বামী মনোযোগ দিয়ে শোনেন সব, এমন কি তাঁর মন্তব্যের প্রতি সহানুভূতিও দেখান। কিন্তু উপদেশাবলী শোনবার পর সবটাই সিগারেটের ধোঁয়ার মতো অর্থহীন ব'লে উড়িয়ে দেন। পুরনো নিয়মেই জীবনযাত্রা চলতে থাকে আবার। তাঁর এই আদেশ পালনেব স্বীকৃতিসূচক মধুর স্বভাবটা স্ত্রীর কাছে অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। তার চেয়ে বরং খোলাখুলি বিরোধিতা করলেই ভালো হ'ত। সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহারের জন্য রাগ প্রকাশ করতে পারতেন না। তার ফলে অবরুদ্ধ ক্রোধের চাপ পড়ত গিয়ে দাসদাসীদের ওপর। গত দু' বছরের মধ্যে ভদ্রমহিলা ষোল বার চাকরবাকর বদলেছেন। একবার তো একজনকে আঘাত ক'রে বসে-ছিলেন। আদালতে গিয়ে ক্ষতিপূরণের দাবি করবার আগেই তিনি চাকরটিকে

অনেক টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দিয়ে দেন। নইলে সামাজিক দুর্নামের হাত থেকে রক্ষা পেতেন না তিনি।

আনাই একমাত্র জীব যাকে গালাগালির ঝড়ঝাপটা স্পর্শ করতে পারে নি। নিঃশব্দে সহ্য করবার অসাধারণ শক্তি ছিল ওব। ভদ্রমহিলা যখন রেগে উঠে বাক্যবাণ বর্ষণ করতে থাকতেন আনা তখন বিন্দুমাত্র চঞ্চলতা প্রকাশ করত না। ঘোড়ার গাডির ঘোড়া যেমন বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে স্থিরচিত্তে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকে আনার অবস্থাও ঠিক সেই রকমই হ'ত। গৃহিণী কিংবা চাকরবাকর কারো দিকেই পক্ষপাতিত্ব দেখাত না সে। এত ঘন ঘন যে চাকরবাকর বদলে যাচ্ছে তাতেও সে মুহূর্তের জন্য বিচলিত বোধ কবেনি। ব্যাপাবটা যেন সে জানেই না এমনভাবে চলাফেরা করত। সহ-কর্মীদের সঙ্গে ব'সে যে দু'এক ঘণ্টা গল্পগুজব কববে তেমন ইচ্ছা ওব কোনো দিনই হয়নি। গৃহকর্ত্রী যখন ক্রোধোন্মত্ত হ'যে মাঝে মাছে মূর্ছা যেতেন তখনও আনার কোনো ভাববৈলক্ষণ্য ঘটত না—নীরবে অন্য দিকে কান ফিরিয়ে রাখত। নিয়মিত বাজারে যাওয়া এবং রান্নাঘরের কাজ নিয়েই সে ব্যস্ত। এর বাইরে কোথায় যে কি ঘটছে সে সম্বন্ধে ওর ছিল চবম উদাসীনতা। ধান মাডাই-এব লাঠির মতো শক্ত এবং বোধশক্তিহীন—গত ক' বছবের মধ্যে হাডভাঙা খাটুনি সত্ত্বেও মনের কোনো পবিবর্তন হয়নি। রাজধানী ভিয়েনা আর টাইরলেব মধ্যে কোনো রকম পার্থক্যই নেই। ওর মানসিকতা সেই একরকমই বইল। বাহ্যিক পরিবর্তনও কিছু হয়নি। একমাত্র পরিবর্তন যা লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে ওর ছোট্ট কাঠের বাক্সটার মধ্যে। নোটের সংখ্যা বাডতে বাড়তে প্রায় এক ইঞ্চি উঁচু হ'য়ে উঠেছে। দ্বিতীয় বছরের শেষে নোটগুলো একদিন গুনতে গিয়ে দেখে যে, জীবনের আকাঙ্ক্ষা প্রায় পূর্ণ হ'য়ে এসেছে—এক হাজার টাকা জ'মে উঠতে আব বেশি দেরি নেই।

কিন্তু ভাগ্যেব হাত কখনো কখনো তীক্ষ্ণ অস্ত্রেব মতো হ'য়ে ওঠে। কঠিনতম পর্বতের দেহেও অস্ত্রের আঘাতে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটায় সে। আনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটল অত্যন্ত একটা সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র ক'বে। এই সময় গভর্নমেণ্ট দেশের জনসংখ্যা গণনা করছিলেন। দশ বছর পর পর লোক-গণনার রীতি প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক বাড়িতেই গণনার কাগজ এসে

পৌঁচেছে। তথ্য সব লিখে দিতে হবে। ব্যারন লিভারশাইম জানতেন যে, তাঁর চাকর-চাকরানীরা লিখতে পড়তে জানে না। অতএব তথ্যগুলো তিনি নিজেই লিখে দেবেন ব'লে আনাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ওর নাম, বয়স এবং জন্মস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। নাম এবং জন্মস্থানের কথা শুনে ব্যারনের কৌতূহল উদ্রেক হ'ল। নিজে একজন উৎসাহী শিকারী। তাঁর এক সহপাঠীর সঙ্গে একবার টাইরলে গিয়েছিলেন শিকার করতে। মনে পড়ে, দিন পনরোর জন্য পাহাড়ে উঠেছিলেন কৃষ্ণসার হরিণের অনুসন্ধান করবার জন্য। পথপ্রদর্শক হিসেবে ফিনকেনহিউবার নামে এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে গিয়েছিল। এখন তিনি জানতে পারলেন সেই লোকটি হচ্ছে আনার কাকা। লোকটিকে তাঁর খুব পছন্দ হয়েছিল। আনার গ্রামটিও তাঁর জানা। অতএব প্রভুভৃত্যের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হ'য়ে গেল। একবার সেখানকার এক হোটেলে তিনি অতি উপাদেয় হরিণের মাংস খেয়েছিলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যারন জানতে পারলেন যে, আনা সেই হোটেলেই আগে কাজ করত। খুবই সামান্য ঘটনা তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু ঘটনা যতো সামান্যই হোক, এই হঠাৎ যোগাযোগের মধ্যে বৃহত্তর সংঘটনের বীজ লুকনো থাকে। ভিয়েনায় এসে এই তো প্রথম একজনের সঙ্গে দেখা হ'ল যিনি ওর গ্রামের সঙ্গে পরিচিত। এই হঠাৎ যোগাযোগের ফলে আনার মনে আনন্দের আর সীমা রইল না। উত্তেজনায় মুখের রং লাল হয়ে উঠল ওর। ব্যারনের সামনে দাঁড়িয়ে বিনয় এবং ভদ্রতাসূচক মনোভাব প্রকাশ করতে লাগল। প্রকাশের ভঙ্গিটা কিন্তু হ'য়ে উঠল সৌষ্ঠবহীন। টাইরলের ভাষায় ব্যারন যখন দু'একটা হাসিঠাট্টার কথা বললেন তখন তো আত্মগর্বে ফেটে পড়ল আনা। শেষ পর্যন্ত আলোচনায় উপসংহার টানলেন ব্যারন। গ্রাম্য ঘনিষ্ঠতার সুরে বললেন, "ওগো আনা, এখন তুমি যাও, আমার কাজ আছে অনেক। দুটো টাকা বকশিশ দিলুম তোমায়। কারণ আমারই চেনা পল্লীগ্রাম থেকে তুমি এসেছ।"

এমন কিছু গভীর সংবেদনশীল মনোভাব প্রকাশ করলেন না বটে, কিন্তু গৃহকর্তার ঐ কথা কয়টিই আনার মনে আলোড়নের সঞ্চার করল। আবদ্ধ জলাশয়ের বুকে ঢিল পড়ল যেন। তরঙ্গের ছোট্ট বৃত্তটি ক্রমশ বড় হ'তে হ'তে ছড়িয়ে পড়ল ওর মনের ওপর। এতকাল পর্যন্ত কারো সঙ্গেই ওর

মনের কোনো আদানপ্রদান হয়নি—ব্যক্তিগত সম্পর্ক কিছু ছিল না। অতি-প্রাকৃত সত্যের মতো আনার এখন বিশ্বাস করতে ভয় হচ্ছে যে, প্রথম যিনি ওর প্রতি বন্ধুত্বের মনোভাব প্রকাশ করলেন তিনি ওদের ঐ অঞ্চলের পাহাড়-পর্বতের সঙ্গে পরিচিত। শুধু তাই নয়, আনার নিজের হাতে রান্না-করা হরিণেব মাংস পর্যন্ত তিনি খেয়েছেন! পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোকটির মধ্যে নারীত্ব-বোধ জেগে উঠবার উপক্রম হ'ল। অবিশ্যি আনাব মনে এমন কল্পনার উদয় হয়নি যে, সে ভাববে, ব্যারনের মতো একজন উঁচুতলার ভদ্রলোক ওর সঙ্গে সত্যি সত্যি প্রণয়ের সম্পর্ক স্থাপন কববেন। তবুও একথা অস্বীকাব করা যায় না যে, ওর নির্জীব দৈহিক কামনা এই সর্বপ্রথম সজাগ হ'য়ে উঠল।

সৌভাগ্যই বলতে হবে, ঐ অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের জন্যই আনার মধ্যে ক্রমশই এক নতুন নারী জন্মগ্রহণ করতে লাগল। প্রথমে এই রূপান্তর প্রত্যক্ষ হয়নি বটে, কিন্তু ধীরে ধীবে একটা নির্দিষ্ট অনুভূতির জন্ম হ'তে বিলম্ব হ'ল না। কুকুর যেমন একাধিক লোকের মধ্যে হঠাৎ তার নিজেব প্রভুটিকে খুঁজে বার করে এবং তাকে ভগবানের মতো ভক্তি করে, আনাব অনুভূতিটাও প্রায় ঐ ধরনেব হ'য়ে উঠল। রূপান্তরিত কুকুরটি তখন প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে সব জায়গাতে যায়। লেজ নাড়িয়ে বন্ধুত্ব জানায়, হুকুমমতো জিনিস বহন করে—এক কথায় বলতে গেলে প্রভুর কাছে সব রকমের দাসত্ব সে স্বীকাব ক'রে নেয়। এযাবৎকাল আনার ক্ষুদ্র কক্ষেব মতো মনটাতে দশ-বারোটা চিন্তাই শুধু ঘোরাফেরা করত—টাকা, বাজারে গিয়ে সওদা কেনা, উনোনে আগুন দেওয়া ইত্যাদি কয়েকটা চিন্তা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এখন হঠাৎ একটা নতুন চিন্তা এসে ক্ষুদ্র কক্ষটাতে জায়গা দাবি করছে। এবং তার ফলে, পূর্বেকার দখলকারীদের স্থানচ্যুত করতে দ্বিধা করল না আনা। পূর্বেকার অভ্যাসগুলিতে পরিবর্তন আসতে দেরি হল না বেশি। ব্যারনের জামাকাপড় এবং জুতো সে অত্যন্ত যত্ন সহকারে এবং নিপুণভাবে ঝেড়েপুঁছে রাখতে লাগল। অথচ তাঁর স্ত্রীর জামাকাপড় সব গুছিয়ে রাখবার দায়িত্ব ছেড়ে দিল অন্য একজন চাকরানীর ওপর। যেই মুহূর্তে সে টের পেত বাড়ির কর্তা ফিরে এসেছেন তখুনি সে ছুটে গিয়ে তাঁর হাত থেকে টুপী এবং ছড়িটা নিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যগ্র হ'য়ে উঠত। রান্নার কাজে আগের চেয়েও বেশি ক'রে মনোযোগ

দিচ্ছে। এবং কখনো কখনো বাজারে ছুটে যাচ্ছে হরিণের মাংস সংগ্রহের জন্য। নিজের বেশভূষার প্রতিও নজর দিচ্ছে খুব।

ওর নতুন অনুভূতির অঙ্কুর থেকে পাতা জন্মাতে দু'এক সপ্তাহ কেটে গেল। এই অনুভূতির মধ্যে ওর মনের বিদ্বেষ লুকনো ছিল। এ-বিদ্বেষ ওর ব্যারনের স্ত্রীর প্রতি। স্বামীর সঙ্গে বাস করছেন তিনি, একই শয্যায় শয়ন করছেন, যখন খুশি কথা বলবার অধিকারও আছে—অথচ সে নিজে যতটা ভক্তিশ্রদ্ধা করে ব্যাবনকে ততটা ভক্তিশ্রদ্ধা তাঁর স্বামীর প্রতি নেই। একদিন সে স্বচক্ষে দেখেছে যে, মহিলাটি ক্রোধোন্মত্ত হ'য়ে স্বামীকে কী সাংঘাতিক ইতব ভাষায় গালাগালি করছেন। সেই তুলনায় ভিনেয়ার প্রভুটি তার কত ভদ্র আর বিনয়ী। যাই হোক, নানা রকম উপায়ে আনা তার বিদ্বেষের প্রমাণ দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগল। ব্রিগিটা ফন লেডারশাইমকে অন্তত দু'বাব ক'রে ঘণ্টা বাজাতে হয়, নইলে সাড়া দেয় না আনা। তারপরেও সে আসে অত্যন্ত ধীরে ধীরে এবং অনিচ্ছাসত্ত্বে। ঘাড় দোলানোর ভাবভঙ্গি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ব্রিগিটার প্রতি ওব বিরূপতার সীমা নেই। ঠিক যেন একটা একগুঁয়ে ঘোড়ার মতো হ'য়ে ওঠে। গৃহিণীর কথার কোনো জবাব দেয় না সে। তিনি বুঝতে পারেন না তাঁব আদেশটা সে পালন করবে কি না। দ্বিতীয়বার তিনি যখন আদেশটার পুনরুল্লেখ করেন তখন সে ঘৃণাসূচক ভঙ্গিতে মাথাটা একটু নিচু করে, অথবা সে তার গ্রাম্য ভাষায় জবাব দেয়, "আপনার কথা আমি শুনতে পেয়েছি।" কোনো কোনো দিন থিয়েটার দেখতে যাওয়ার আগে ব্রিগিটা যখন গহনা বার করবার জন্য ড্রয়ারের চাবিটা খুঁজতে থাকেন তখন সেটা হাতের কাছে কিছুতেই পান না তিনি। আধ ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর ঘরের এক কোণা থেকে শেষ পর্যন্ত চাবিটা আবিষ্কৃত হয়। টেলিফোনের খবর এলে আনা আজকাল খবরটা পৌঁছয় না তাঁর কাছে। এই গলতির জন্য গালাগাল করলে স্পর্ধার ঝাঁজ মিশিয়ে জবাব দেয় সে, "মনে ছিল না আমার।" মনিব-স্ত্রীর মুখের দিকে কখনো সে সোজাসুজি তাকিয়ে দেখে না। ভয় পায় যদি ওর ভেতরের বিদ্বেষ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

এই সাংসারিক অসুবিধা ঘটবার জন্য ভদ্রমহিলার মেজাজ আরও বিগড়ে যায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহের তীব্রতা বাড়তে থাকে। চাকরানীর অভদ্র ব্যবহার ব্রিগিটার মনের ওপর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, আত্মনিয়ন্ত্রণের শক্তি

হারিয়ে ফেলেন তিনি। দীর্ঘদিন অবিবাহিতা থাকার দরুন মেজাজ তাঁর এমনিতেই খিটখিটে হ'য়ে গিয়েছিল। তার ওপর স্বামীর কাছ থেকেও আদর-যত্ন পাচ্ছেন না ব'লে মানসিক তিক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন আবার দাসীটাকেও আয়ত্তে আনতে পারছেন না। অতএব তাঁর মনের সুস্থতা ক্রমশই নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে। ঘুমের ওষুধ খাওয়ার জন্য পরিস্থিতি আরও বেশি গুরুতর হ'য়ে দাঁড়াল। এমত অবস্থায় কেউ তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতে চাইল না। সহানুভূতি দেখাতে কিংবা সাহায্য করতে কেউ এল না এগিয়ে। একজন স্নায়ু-চিকিৎসকের কাছে গেলেন তিনি। মাস দুয়েকের জন্য একটা স্যানাটরিয়ামে গিয়ে বাস করবার উপদেশ দিলেন চিকিৎসকটি। ব্যারন সোৎসাহে সম্মতি দিলেন। তাঁর অস্বাভাবিক উৎসাহ লক্ষ্য ক'রে ব্রিগিটা স্যানাটরিয়ামে যাওয়ার প্রস্তাব বাতিল ক'রে দিলেন। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি তাঁকে রাজী হ'তে হ'ল। তাঁর নিজস্ব চাকরানীটি সঙ্গে যাবে। ব্যারনকে দেখাশোনা করবার জন্য আনা থাকবে ভিয়েনার বাড়িতে।

প্রিয় মনিবটির যত্নের ভার ওর ওপর দেওয়া হয়েছে শুনে আনা উত্তেজনায় টগবগ করতে লাগল। এ যেন একটা ম্যাজিকের কৌটো থেকে প্রণয়োদ্দীপক পানীয় দেওয়া হ'ল ওকে। স্বভাবচরিত্রের পরিবর্তন হ'ল খানিকটা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও আর ভারি ভারি ঠেকে না। স্বাভাবিক এবং হাল্কা ভঙ্গিতে চলাফেরা করে। মনিব-স্ত্রীর যখন রওনা হওয়ার সময় ঘনিয়ে এল তখন সে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে নতুন উদ্দীপনায় ছোটাছুটি করতে লাগল। হুকুমের জন্য অপেক্ষা না ক'রে বাক্স গুছিয়ে দিচ্ছে—কুলীর মতো বাক্স-পেঁটরা সব নিজের ঘাড়ে ব'য়ে তুলে দিয়ে আসছে গাড়িতে। সন্ধের পর স্ত্রীকে ট্রেনে চাপিয়ে দিয়ে ব্যারন বাড়ি ফিরে এলেন। প্রতিদিনকার মতো আনা অপেক্ষা করছিল। তার হাতে টুপী এবং ওভার-কোটটা খুলে দিলেন তিনি। মুক্তির নিশ্বাস ফেলে ব্যারন ব'লে উঠলেন, "যাক, বাঁচা গেল!" এর পর যা ঘটল তাকে অসাধারণ ব্যাপারই বলা চলে। আগেই বলা হয়েছে যে, আনা অনেকটা নিম্নস্তরের পশুর মতো। সে কখনো হাসত না। কেউ তাকে হাসতে দেখেনি। কিন্তু এখন দেখা গেল, ঠোঁট দুটো ওর এক নতুন উপসর্গের দ্বারা উদ্দীপিত হ'য়ে উঠেছে। তারপর ঠোঁট দুটো ক্রমশই ফাঁক হ'তে লাগল। দাঁত বার ক'রে হাসছে আনা। চাকরানীটির বিকৃত হাসি দেখে লেভারশাইম

বিস্মিত বোধ করলেন। একজন চাকরানীর সামনে এত বেশি খোলাখুলি ভাবে কথা বলার জন্য লজ্জিত বোধ করলেন তিনি। তারপর একটি কথাও আর বললেন না, চ'লে এলেন নিজের শোবার ঘরে।

লজ্জিত ভাবটা মাত্র কয়েকটা মুহূর্তের জন্য পীড়া দিল ব্যারনকে। তারপর অবিশ্যি প্রভু এবং চাকরানী দুজনেই গৃহের নির্জনতা মনপ্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে লাগল। স্বাচ্ছন্দ্যবোধেও বিন্দুমাত্র অসুবিধা ঘটল না। স্ত্রীর অনুপস্থিতির ফলে গৃহের আবহাওয়া পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছে। ব্যারনের আর কোনো দায়িত্ব পালনের ঝামেলা নেই। কোনো কাজের জন্য স্ত্রীর কাছে আর জবাবদিহি করতে হবে না। পরের দিনই অনেক রাত ক'রে বাড়ি ফিরলেন তিনি। ব্রিগিটা এখানে উপস্থিত থাকলে নানারকমের প্রশ্নবাণে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিতেন। আনা কিন্তু সেই তুলনায় বিপরীত ব্যবহার করল। নিঃশব্দে ভক্তিগদগদ চিত্তে আমন্ত্রণ করল লেভারশাইমকে। আগের চেয়ে কাজকর্মের প্রতি আরও বেশি উৎসাহ বেড়েছে ওর। ঘুম থেকে ওঠে সকাল সকাল। আসবাবপত্র এত ভালো ক'রে ঝেড়েপুঁছে রাখে যে, নিজের মুখ দেখতে পাওয়া যায় তাতে। দরজার হাতলগুলো ঝকঝক করলেও মনঃপূত হয় না ওর। আরও বেশি ক'রে পুঁছে দেয়। প্রতিটি রান্না অতি উপাদেয় এবং সুস্বাদু হচ্ছে। ব্যারন সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য বোধ করলেন, আনা আজকাল যেসব বাসনে তাঁকে খেতে দিচ্ছে সেগুলো কোনো বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া ব্যবহার করা হ'ত না। সাধারণত এসব ব্যাপারের প্রতি তিনি নজর দিতেন না। দৃষ্টি এড়িয়ে যেত তাঁর। কিন্তু এই অদ্ভুত ধরনের চাকরানীটির সযত্ন পরিচর্যা-প্রীতি এখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। আসলে প্রাণখোলা স্বভাবের মানুষ ব'লেই তিনি তাঁর সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ করলেন। অতি উত্তম রান্নার জন্য প্রশংসাও করলেন খুব। দু'এক দিন পর ব্যারনের জন্মদিন উপলক্ষে আনা একরকমের কেক তৈরি করল। তার ওপর ব্যারনের নামের আদ্যক্ষর লিখে রাখল। শুধু তাই নয়, তাঁর বংশমর্যাদাসূচক নিদর্শনের ছবিটা এঁকে রাখতেও ভুল করল না। হাসতে হাসতে ব্যারন বললেন, "আনা, তুমি যে আমার মাথাটি খেয়ে দিচ্ছ! কিন্তু মনিব-গিন্নী যখন ফিরে আসবেন, তখন আমার কি উপায় হবে?"

অন্য দেশের ভদ্রলোকদের পক্ষে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটা এমন হওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু যুদ্ধপূর্বের অষ্ট্রিয়ার উপরোক্ত সম্পর্কটা অস্বাভাবিক ব'লে বিবেচিত হ'ত না। বনেদী মনোভাবাপন্ন ভদ্রলোকেরা এটাকে সাধারণ মানুষের প্রতি গভীর উপেক্ষা প্রদর্শনের পথ ব'লে ধ'রে নিয়েছিলেন। হয়তো শহর থেকে দূরে কোথাও একজন ধনী আর্কডিউক গিয়েছেন অস্থায়ীভাবে বাস করতে। তিনি একজন চৌকিদার পাঠিয়ে দিলেন নিকটতম এক গণিকালয়ে। সেখান থেকে একটি গণিকা সে পাকড়াও ক'রে নিয়ে এল। সারারাত আর্কডিউকটি স্ফূর্তি করবার পর গণিকার সঙ্গে সম্পর্ক রাখলেন না আর। তাঁরই মোসাহেব গোষ্ঠীর হাতে তিনি তখন তাকে সমর্পণ ক'রে দিলেন। এই সমর্পণের মধ্যে উপেক্ষা প্রদর্শনের মনোভাবই ছিল বেশি। কোনো রকম কুৎসাকেই এঁরা পরোয়া করতেন না। বিশিষ্ট কোনো পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি যখন শিকারে যেতেন তখন হয়তো সেখানে গিয়ে তিনি একজন কুলীর সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগলেন, বন্ধুভাবাপন্ন হ'য়ে একত্রে সুরাপানও করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধ্যাপক, কিংবা ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টার চেয়ে কুলীর সঙ্গে ব'সে খাবার টেবিলে হৈ-হল্লা করাই শ্রেয় মনে করতেন। আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কটা সম-সামাজিক মনে হ'লেও আসলে কিন্তু তাঁর প্রভুত্বের মর্যাদা থেকে স্খলিত হ'য়ে পড়তেন না তিনি। টেবিল থেকে উঠে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যের পুরনো সম্পর্কটা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যেত। দূরত্ব বজায় রাখতে চেষ্টার ত্রুটি রাখতেন না এঁরা। বনেদী লোকদের নকল করত মধ্যবিত্তরা। অতএব ব্যারনও একজন চাকরানীর সামনে তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে নিন্দামূলক কথা বলতে দ্বিধা করলেন না। তাঁর কথাগুলো যে একজন গ্রাম্য স্ত্রীলোকের মনের ওপর কী নিদারুণ আবেগের সৃষ্টি করল তা তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি।

যাই হোক কয়েকটা দিন নিজেকে সামলে রাখলেন ব্যারন। কথাবার্তা এবং আচার-ব্যবহারে খানিকটা সংযম আনলেন। আনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন। এবং বিবাহপূর্বের উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ জীবনযাপন করতে শুরু ক'রে দিলেন। ভবিষ্যতের বিপদসম্ভাবনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন না। এটা তাঁর নিজের বাড়ি, স্ত্রীও অনুপস্থিত। অতএব স্ফূর্তি করতে বাধা কিছু নেই।

দিন সাতেক পর লেডারশাইম একদিন আনাকে ডেকে এনে বললেন যে,

রাত্রিতে দু'জনের জন্য খাবার প্রস্তুত করতে হবে। তাঁর ফিরতে হয়তো অনেক রাত হ'য়ে যাবে। সুতরাং আনার অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকবার দরকার নেই। বিনা দ্বিধায় সে গিয়ে যেন শুয়ে পড়ে। তিনি নিজেই দেখেশুনে খাবার ব্যবস্থা ক'রে নেবেন।

"বেশ, তাই করব।" বলল আনা। সে যে মনিবের মতলবটা টের পেয়েছে তেমন ব্যাপারটা ভাবে ভঙ্গিতে বুঝতে দিল না ব্যারনকে। রাত্রিতে বাড়ি ফিরে এসে তিনি বুঝতে পারলেন, চাকরানীটিকে যতটা বোকা ভেবেছিলেন ততটা বোকা সে নয়। থিয়েটার থেকে একজন যুবতী অভিনেত্রীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন লেভারশাইম। তিনি দেখলেন, খাবার টেবিলটা ফুল দিয়ে সাজানো। শয়ন-কামরায় প্রবেশ ক'রে আরও বেশি বিস্মিত হ'য়ে গেলেন তিনি। আনা শুধু তাঁরই বিছানাটা পেতে রাখেনি, তাঁর স্ত্রীর বিছানাটাও আজ সে পেতে রেখে দিয়ে গেছে। ত্রিগিটাব রাত্রের জামাকাপড় পর্যন্ত সাজিয়ে রেখেছে সে। আনা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিল যে, মনিবটি তাব সঙ্গে ক'রে একজন স্ত্রীলোক নিয়ে আসবেন। আনা তাঁর একজন বিশ্বাসের পাত্রী হ'য়ে দাঁড়াল। এবং পবেব দিন সকালেই এর পর থেকে তাকে ডেকে পাঠাতে সংকোচ বোধ করলেন না। বললেন যে, অতঃপর আনাই হবে তাঁর প্রেমিকাদের খাস চাকরানী।

এই সময় থেকেই নতুন জ্ঞানচক্ষু ফুটল আনার। অভিনেত্রীটি ব্যারনকে ডন্ যুয়ান ব লে সম্বোধন কবতে লাগল। পরে যেদিন সে আবার এসে উপস্থিত হ'ল সেদিন অভিনেত্রীটি স্ফূর্তির সুরে ব্যারনকে বলল, "ডন্ যুয়ান, তোমাব ঐ লেপোরেলাকে ডেকে পাঠাও না একবার।"

নামটি ভারি পছন্দ হ'ল ব্যারনের। দুঃখ শুধু, ঐ ঝবা-পাতার মতো গেঁয়ো স্ত্রীলোকটার এমন সুন্দর একটা নাম ধারণেব যোগ্যতা কিছু নেই। অপপ্রয়োগই বলা যেতে পারে। তা সত্ত্বেও লেভাবশাইম ও:কে লেপোরেলা ব'লেই সম্বোধন করতে লাগলেন। প্রথমে খুবই চমকে উঠেছিল আনা, তারপর অবিশ্যি নতুন নামকরণটা প্রশংসাসূচক ব'লেই ধ'রে নিল সে। তার মনিবটি যে ওকে একটা ডাক-নাম দিয়ে অভিহিত করেছেন সেই কথা ভেবে আত্মগর্বে স্ফীত হ'য়ে উঠল সে। যখনই তিনি "লেপোরেলা" ব'লে ডেকে ওঠেন, তখনই আনার মুখে হাসি ফুটে ওঠে এবং ঘোড়ার মতো বড় বড় দাঁতগুলো

বেরিয়ে পড়ে। ছুটতে ছুটতে চ'লে আসে মনিবের হুকুম তামিল করবার জন্য।

খুবই লঘুচিত্তে নামটা ধার্য করা হয়েছিল এবং অপপ্রয়োগ ব'লেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সত্যিকারের লেপোরেলার সঙ্গে আনার সাদৃশ্য আছে অনেক। সত্যিকারের লেপোরেলাও ছিল দুষ্কর্মের নিত্যসাথী। বিগতযৌবনা অবিবাহিতা স্ত্রীলোকটি প্রেমের স্বাদ কখনো পায়নি, অথচ প্রাণবন্ত যুবক মনিবের অবৈধ কামলীলায় গর্ব বোধ করছে। বিজাতীয় স্ফূর্তির আবেগে উল্লসিত হ'য়ে ওঠে। অপর স্ত্রীলোকের পরিবর্তে, আনা কল্পনা করে, সে নিজেই গিয়ে ব্যারনের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে। সারাটা জীবন পশুর মতো কঠোর পরিশ্রম করার ফলে যৌনচেতনা প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছে। অতএব, মনিব-গৃহিণীর শয্যায় যত নতুন নতুন স্ত্রীলোক এসে ব্যারনের সঙ্গে রাত্রি যাপন করছে তাই দেখে ওর আনন্দের আর সীমা থাকছে না। অসচ্ছন্দেশ্যে নারী-সংগ্রহকারিণীরা যে-ধরনের আনন্দ পায় আনার আনন্দও ছিল সেই ধরনের। সত্যিকারের লেপোরেলার মতো সেও সক্রিয় এবং প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠল। এমন একটা যৌনভাবাপন্ন প্রেমের আবহাওয়ার মধ্যে বাস করতে লাগল যার সঙ্গে আগে কখনো ওর পরিচয় ঘটেনি। ব্যারনের দুষ্কর্মের সহ-সাথী হওয়ার ফলে ওর কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হ'য়ে পড়ল। ছলচাতুরীর কৌশল প্রণয়ন এবং লুকিয়ে লুকিয়ে অপরের কথাবার্তা শোনা—ইত্যাদি অভ্যাস আগে ওর ছিল না। এখন সে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা শোনবার চেষ্টা করে, টেরা চোখে দরজার ফুটো দিয়ে চেয়ে থাকে এবং কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য এখানে ওখানে আগ্রহ সহকারে ছুটে বেড়ায়। প্রতিবেশীরা বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে গেল। আনা আজকাল তাদের সঙ্গে সামাজিকভাবে মেলামেশা করছে। চাকরবাকরদের সঙ্গে খোশখবর সম্পর্কে গল্প করছে, পিওনের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কি মারছে—বাজারে গিয়ে শবজীওয়ালীদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও করছে। একদিন সন্ধেবেলা আনার ঘরের আলো গেল নিবে। উল্টোদিকের বাড়ির চাকরচাকরানীরা শুনতে পেল, আনার ঘর থেকে কি এক অদ্ভুত ধরনের গুনগুন আওয়াজ আসছে। এতকাল ঐ ঘরটাতে নীরবতা বিরাজ করত। তারপর শোনা গেল, কর্কশ স্বরে গান ধরেছে আনা! অ্যালপাইন পাহাড় অঞ্চলে

গয়লানীরা এইরকমের গ্রাম্য সংগীত গায়। অব্যবহৃত পুরনো পিয়ানোর ওপর বাচ্চাছেলেরা আঙুল টিপে দিলে যেরকমের পাঁচমিশেলী আওয়াজ বেরোয়, আনার স্বরও ঠিক সেই ধরনের হ'ল। ছেলেবেলায় গান গাইবার চেষ্টা করেছিল। এখন যেন অতীতের সেই বিস্মৃতপ্রায় অন্ধকার থেকে পুরনো আকাঙ্ক্ষাটা সজাগ হ'য়ে ওঠবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

আনার এই অভূতপূর্ব রূপান্তরটা কিন্তু ব্যারনের চোখে পুরোপুরি ধরা পড়ল না। অথচ এই জন্য তিনি নিজেই দায়ী। অবিশ্যি নিজের ছায়ার প্রতি দৃষ্টি ফেলতে কারই বা ইচ্ছা হয়? লেভারশাইম ওর মধ্যে যেটুকু পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন তা হচ্ছে, তাঁর সুখসুবিধার জন্য আনা সর্বদাই নিঃশব্দে একান্তমনে কাজ করতে ব্যগ্র। ওর এই নির্বাক সেবার প্রচেষ্টা ব্যারনের পছন্দ হয়েছে খুব। কুকুরের গায়ে মাঝে মাঝে হাত বুলিয়ে আদর দেখাবার মতো আনাকেও তিনি দু'একটা মিষ্টি কথা বলতেন। ঠাট্টার ভঙ্গিতে হয়তো বা কানটা টেনে ধরলেন ওর—তারপর পকেট থেকে একটা টাকা কিংবা থিয়েটারের টিকিট বার ক'রে গুঁজে দিলেন আনার হাতে। কিন্তু বেচারী আনা এগুলোকে মহামূল্যবান সম্পত্তির মতো জমিয়ে রাখত তার সেই ক্ষুদ্রাকার ক্যাশ-বাক্সটাতে। ক্রমে ক্রমে লেভারশাইম পুরোপুরি বিশ্বাস স্থাপন করলেন ওর ওপর এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিতেও দ্বিধা করলেন না। তাঁর বিশ্বাসের মাত্রা যত বাড়তে লাগল আনার ভক্তিশ্রদ্ধার পরিমাণও বাড়তে লাগল তত বেশি। ব্যারনের মনের আকাঙ্ক্ষা আগে থেকেই বুঝে নেয়ার চেষ্টা করে সে। তাঁর অস্তিত্বের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে পারলে বেঁচে যায় যেন। তাঁরই চোখ দিয়ে সব কিছু দেখবার প্রচেষ্টা কি ওর কম? যেসব নতুন নতুন স্ত্রীলোকের সঙ্গলাভে আমোদ উপভোগ করছেন ব্যারন, আনাও যেন তাঁর সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়ে সেই আমোদের অংশ পেতে চায়। লেভারশাইম যখন নতুন কোনো স্ত্রীলোক নিয়ে বাড়ি ফেরেন তখন সে আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে ওঠে। কিন্তু কেউ যদি সঙ্গে না থাকে তাহ'লে ওর মুখের ওপর হতাশার ছায়া পড়ে। শারীরিক পরিশ্রম করা ছাড়া অন্য কিছু আর ওর করবার ক্ষমতা ছিল না। এখন সে চিন্তা করবার ক্ষমতা পেয়েছে। চব্বিশ ঘণ্টাই নানা রকম চিন্তায় মাথাটা ওর ভরপুর হ'য়ে থাকে। মালবাহী পশুটি যেন হঠাৎ আজ মানুষে রূপান্তরিত

হ'য়ে গেল, যদিও সে আগের মতোই নীরবে কাজ ক'রে যায়। গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে থাকে এবং সঘৃণ ঈর্ষায় জর্জরিত হ'য়ে ওঠে।

একদিন একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এলেন ব্যারন। অবাক হ'য়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। রান্নাঘরে কথাবার্তার আওয়াজ শুনলেন। ওখানে এযাবৎকাল অটুট নৈঃশব্দ্য বিরাজ ক'রে এসেছে। ঘরের দরজাটা অর্ধেক খোলা ছিল। সামনে এসে উপস্থিত হ'তেই লেপোরেলা একটু বিব্রত-ভাবে ব'লে উঠল, "মাপ করবেন, হয়তো একটু বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছি। বাবুর্চির মেয়েটাকে ডেকে এনেছি। দেখতে ভারি সুন্দর। আপনার সঙ্গে ভাব করতে পারলে খুবই খুশী হবে সে।"

লেডারশাইম একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আনার দিকে। ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না কি করবেন তিনি। নারী-সংগ্রহকারিণীর প্রস্তাবটা গ্রহণ করবেন, না কি বাতিল ক'রে দেবেন? শেষ পর্যন্ত লোভ সংবরণ করতে না পেরে তিনি বললেন, "ডাকো দেখি, সুন্দরীটিকে একবার পরখ করি।"

বছর ষোল বয়স হবে মেয়েটির। ইতিমধ্যে সে লেপোরেলার কাছ থেকে অনেক রকমের মিথ্যে আশার গল্প শুনেছে। এখন সে খিলখিল ক'রে হাসতে হাসতে এবং বিশ্রীভাবে হেলতে দুলতে বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। ভাবল, কেতাদুরস্ত ভদ্রলোকটিকে বুঝি এমনিভাবেই ওর প্রতি সে মন্ত্রমুগ্ধ ক'রে রাখবে। দূর থেকে আগেও সে ব্যারনকে দেখেছে। দেখেছে এবং প্রবল আকর্ষণও বোধ করেছে। মেয়েটির চেহারা লেডারশাইমের চোখে ভালো লাগল। তিনি তাকে নিজের শয়নকামরায় চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন। আনা তাকে কোনো ইঙ্গিত করছে কিনা দেখতে গিয়ে বুঝতে পারল, ওখান থেকে উধাও হ'য়ে গিয়েছে সে। এমত অবস্থায় মেয়েটি আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ল। এ যেন মাকড়সা পোকাটাকে বলছে, "আমার এই সুন্দর জালের ঘরটাতে এসে বসবে কি?"

সদ্যজাগ্রত ক্ষীণ আকাঙ্ক্ষার তাড়নায় আনার মধ্যে খানিকটা মননের শক্তি জন্মাল বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে পশুর মতো কল্পনাশক্তিহীন হ'য়ে রইল। ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়ার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে পারল না। প্রভুভক্ত

কুকুরের মতো সে শুধু মনিবকেই সেবা ক'রে যাচ্ছে—অনুপস্থিত মনিব-স্ত্রীর কথা এক মুহূর্তের জন্যও মনে পড়ল না ওর। সহসা বজ্রপাতের মতো আনা একদিন শুনতে পেল যে, পরের দিন বিকেলবেলা মনিব-স্ত্রী বাড়ি ফিরে আসছেন। খবরটা দিতে এলেন ব্যারন নিজেই। তিনি বললেন যে, আজকের মধ্যেই বাড়িঘর সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখতে হবে আনাকে। খবর শুনে ওর মুখের রং গেল বিবর্ণ হ'য়ে। হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ যেন ওকে বুঝি কেউ ছুরিকাঘাত করেছে! ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল মনিবের দিকে। ব্যারন বললেন, "মনে হচ্ছে, খবব শুনে তুমি খুশী হওনি, আনা। কিন্তু আমাদের তো এ সম্বন্ধে কোনো কিছু কববার নেই।"

ওর প্রস্তরাকার মুখের মধ্যে একটু যেন সাড়া জাগল। মনে হ'ল, কি এক বিশেষ চিন্তায় ডুবে আছে সে। ক্রমে ক্রমে বিবর্ণ মুখটা লাল হ যে উঠতে লাগল। ঠোঁট দুটো ন ড়ে উঠল, তাবপর অতি কষ্টে সে বলবার চেষ্টা করল, "কিন্তু যাই বলুন না কেন তিনি তো তিনি তো অবশ্যই " আর একটি কথাও বলতে পাবল না, শ্বাসরোধ হ'য়ে এল। বিদ্বেষের প্রচণ্ডতায় মুখের বেখাগুলো কুঁচকে গিযেছে। এবার লেডাবশাইম নিজেই ভয় পেয়ে গেলেন এবং ওখান থেকে স'বে এলেন তিনি। আনা আবার গিয়ে কাজ করতে বসল। একটা তামার থালা এত জোবে জোবে মাজতে লাগল যে, হয়তো বা আঘাত লেগে হাতেব আঙুলগুলো ক্ষতবিক্ষত হ'যে যাবে।

গত দু' মাসেব শান্ত পবিবেশ আবাব বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠল। গৃহকর্ত্রীব প্রত্যাবর্তনের পব কলহ-বিবাদ পুনরায় শুরু হ'য়ে গেল। অকারণে তিনি কটূক্তি কবতে লাগলেন। হযতো প্রতিবেশীবা কেউ তাঁকে বেনামী চিঠি লিখে গত দু' মাসের ঘটনা সব জানিয়ে দিয়েছে। কিংবা এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, স্বামীর প্রেমানুরাগের অভাব দর্শনে তাঁব মনমেজাজ বিগড়ে গিয়েছে। যাই হোক, আগের চেয়েও পরিস্থিতি বেশি গুরুতর হ'য়ে দাঁড়াল। দু' মাসের চিকিৎসার ফলে গৃহকর্ত্রীর মানসিক অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয়নি। বরং আরও অবনতির দিকে গিয়েছে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন, আবার কখনো বা হিস্টিরিয়া রোগীর মতো উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ করেন। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা দিন দিনই অসহনীয় হ'য়ে উঠতে লাগল। কয়েকটা সপ্তাহ পর্যন্ত স্ত্রীর

প্রশ্নগুলোর জবাব তিনি দিলেন না, ভদ্রভাবে এড়িয়ে গেলেন। ভদ্রতা প্রকাশের ভঙ্গিটা তাঁর স্বভাবজাত। স্ত্রী যখন বিবাহ-বিচ্ছেদের হুমকি দিলেন এবং পিতামাতাকে সব খুলে চিঠি লিখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন তখনও ব্যারনের ভদ্রতাবোধ অটুট রইল। স্বামীর উদাসীন মনোভাবের দরুন ব্রিগিটার বিশ্বাস জন্মাল যে, চতুর্দিকে তাঁর শত্রুরা লুকিয়ে রয়েছে। এবং তাঁকে অহর্নিশ নির্যাতন করছে তারা। শেষ পর্যন্ত এটা একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেল ওর কাছে।

পুরনো দিনের মতো আনা আবার নির্বাক হ'য়ে কাজকর্ম করছে। কিন্তু এই নীরবতা ওর ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে। গৃহকর্ত্রী যখন বাড়ি ফিরে এলেন আনা তখন তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য সামনে এল না। তাকে আসবার জন্য ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও সে ব'সে রইল রান্নাঘরে। কাঠের মূর্তির মতো শক্ত হ'য়ে গিয়েছে। গৃহকর্ত্রীর প্রশ্নগুলোর জবাব সে এত সংক্ষিপ্তভাবে দেয় যে, এখন আর তিনি ওকে প্রশ্নই করেন না। ধৈর্য হারিয়ে তিনি স'রে আসেন ওর সামনে থেকে। আনার চোখে বিদ্বেষের বিষ ঘন হ'য়ে ওঠে। ভাবে গৃহকর্ত্রীর প্রত্যাবর্তনের জন্য মনিবের সঙ্গলাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে। তাঁকে সেবা করবার সুখপ্রদ সুযোগটা নষ্ট হ'য়ে গেল। আবার ওকে রান্নাঘরে গিয়ে কঠিন পরিশ্রম ক'রে সময় কাটাতে হবে। এমন কি ওর 'লেপোরেলা' প্রিয় নামটা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেলেন মনিব-গৃহিণী। ব্যারন তাঁর স্ত্রীর সামনে সতর্ক থাকেন, আনার প্রতি কোনো রকম দরদ প্রকাশের চেষ্টা করেন না। স্ত্রীর কলহপূর্ণ ব্যবহারে মাঝে মাঝে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েন ব্যারন। তখন তিনি লুকিয়ে চ'লে আসেন রান্নাঘরে। অপরিষ্কার একটা টুলের ওপর চেপে ব'সে ব্যথিত সুরে ব'লে ওঠেন, "এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না।!"

যখন এই পূজনীয় প্রভুটি ওর সমবেদনা ভিক্ষার জন্য পালিয়ে আসতেন রান্নাঘরে তখনকার মুহূর্ত ক'টিই শুধু লেপোরেলার কাছে আনন্দের উত্তাপে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠত। উত্তর দেওয়া কিংবা সান্ত্বনার ভাষা উচ্চারণ করা ওর সাহসে কুলিয়ে উঠত না। বোবার মতো নির্বাক হ'য়ে সমবেদনার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত ওর শৃঙ্খলাবদ্ধ দেবতাটির মুখের দিকে। ওর এই বাণীহীন সমবেদনা প্রকাশ লেডারশাইমকে কিছুক্ষণের জন্য অন্তত শান্তি দিত। কিন্তু

যখন তিনি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন তখনই তাঁর মনটা গভীর উৎকণ্ঠায় পুনরায় পরিপূর্ণ হ'য়ে যেত। অসহায়ভাবে রাগে গরগর করত আনা। রাগপ্রকাশের অন্য কোনো পথ নেই ব'লে সে আওয়াজ ক'রে ক'রে বাসন মাজতে শুরু ক'রে দিত।

একদিন এই শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটল। প্রবল বেগে ঝড় উঠল। ক্রোধোন্মত্তা ব্রিগিটার প্রতি আর তিনি তাঁর স্বভাবোচিত ভদ্রতা প্রদর্শনে সমর্থ হলেন না। ধৈর্য হারিয়ে ফেললেন। দড়াম ক'রে দরজা খুললেন তিনি। ফ্ল্যাটের সর্বত্রই আওয়াজের প্রতিধ্বনি উঠল। তিনি চীৎকার ক'রে উঠলেন, "নাঃ, এ একেবারে চরম হয়রানি। অসহ্য!" ক্রোধের উত্তেজনায় মুখ তাঁর বিবর্ণ হ'য়ে গিয়েছে। ওখান থেকে বেরিয়ে এলেন ব্যারন। রান্নাঘরের মধ্যে দমকা হাওয়ার মতো ঢুকে পড়লেন তিনি। ভয়ে কম্পিত আনার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমার বাক্স গুছিয়ে দাও এক্ষুনি। বন্দুকের বাক্সটাও নিয়ে এসো। এক সপ্তাহের জন্য শিকার করতে যাচ্ছি। এই নরকে ভূতপ্রেতরাও বাস করতে চাইবে না।"

আনা চোখ তুলে তাকিয়ে রইল লেডারশাইমের দিকে। দৃষ্টিতে ওর হাসিখুশীর ভাষা। মনিবটি তার শেষ পর্যন্ত নিজের কর্তৃত্বস্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন। অত্যন্ত কর্কশ স্বরে হেসে উঠল আনা এবং মন্তব্য করল, "হ্যাঁ, আপনার কথাই ঠিক। এই সব বিশ্রী ব্যাপারের শেষ হওয়াই উচিত।"

অপরিমিত উদ্যমে এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ছোটাছুটি ক'রে জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে লাগল আনা। নিজের ঘাড়ে ক'রে বাক্স এবং অন্যান্য জিনিস সব গাড়িতে তুলে দিয়ে এল সে। ব্যারন যখন ওকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে যাচ্ছেন তখন তাঁর নজরে পড়ল, লেপোরেলার ঠোঁটের ফাঁকে এক অদ্ভুত ধরনের হাসি ফুটে উঠেছে। হাসির মধ্যে অশুভ কামনার স্পষ্ট চিহ্ন। আগেও তিনি ওর মুখে এই ধরনের হাসি দেখেছেন এবং ভেতরে ভেতরে ভয়ও পেয়েছেন। এ যেন আক্রান্ত হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে শিকারের অবস্থা। আক্রমণের আভাস পর্যন্ত সে পায়নি। যাই হোক, সম্মানজনক ভঙ্গিতে ব্যারনকে বিদায় দিল আনা। সে বলল, "যতদিন বাইরে থাকবেন আমোদ-আহ্লাদ ক'রে সময় কাটাবেন। এদিকের ভার সামলাব আমি।"

এ যে ধৃষ্টতা তাতে আর সন্দেহ নেই। কারণ অন্তরঙ্গতার অনিবার্য আভাস ফুটে উঠল ওর বিদায়-সম্ভাষণে।

তিন দিন পর লেভারশাইম তাঁর এক খুড়তুতো ভাই আর্নেস্ট-এর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলেন, "খুব জরুরী। খবর পাওয়ামাত্র বাড়ি ফিরে আসুন।"

ভিয়েনা স্টেশনে পৌছেই আর্নেস্টকে দেখতে পেলেন ব্যারন। এবং ভাইয়ের মুখের অবস্থা দেখে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে, সাংঘাতিক কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘ'টে গিয়েছে। আর্নেস্ট দুঃসংবাদ দিল, ব্যারনেস ফন লেভারশাইমকে ঐ দিন তাঁর নিজের বিছানাতেই মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। তাঁর ঘরভর্তি গ্যাসবাষ্প। গ্যাসচুল্লী থেকে যে বাষ্প উঠেছে তাতে আর সন্দেহ নেই। আকস্মিক দুর্ঘটনা ব'লেও ভাবা যাচ্ছে না। ইচ্ছাকৃত মৃত্যু—কারণ, সারা গ্রীষ্মকালটায গ্যাসচুল্লী জ্বালানো হয়নি। তা ছাড়া, এমনিতেই আবহাওয়া বেশ গরম ছিল। উপরন্তু সেই রাত্রে ঘুম আসবার জন্য তিনি বারোটারও বেশি ঘুমের ট্যাবলেট খেয়েছিলেন। আপনার রাঁধুনী আনা একাই ছিল বাড়িতে। সে সাক্ষ্য দিয়েছে যে, মাঝরাত্রিতে মিসেস লেভারশাইমের পায়ের আওয়াজ শুনেছে সে। তিনি হেঁটে ড্রেসিং-রুমে গেলেন। ঐ সময় ড্রেসিং-রুমে যাওয়ার অর্থ কি? নিশ্চয়ই তিনি গ্যাসচুল্লীর মুখটা খুলে দিতে গিয়েছিলেন। নিরাপত্তার জন্যই গ্যাসচুল্লীটা শয়নকামরায় না রেখে ড্রেসিং-রুমে সরিযে দেওয়া হয়েছিল। এইসব প্রমাণাদি পাওয়ার পর পুলিশ-ডাক্তার এটাকে আত্মহত্যা ব'লে নিশ্চিতভাবে ঘোষণা করেছেন।

ব্যারনের হাত কাঁপতে লাগল। আর্নেস্ট যখন আনার সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করল তখন তাঁর সারা শরীরটাই কেঁপে উঠল। একটা ভয়ংকর ধরনের চিন্তা মনের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে তাঁর। কিন্তু আর্নেস্টকে বুঝতে দিলেন না কিছু, নিঃশব্দে আর্নেস্টের সঙ্গে বাড়িতে এসে পৌছলেন। শবদেহটা আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। তাঁর আত্মীয়স্বজনরা ড্রইং-রুমে অপেক্ষা করছিলেন। এঁদের মুখের ভাবভঙ্গী থেকে ব্যারনের বুঝতে অসুবিধা হ'ল না যে, সবারই মনোভাব বিরুদ্ধভাবাপন্ন। এবং শোকপ্রকাশের মধ্যেও সহৃদয়তার অভাব লক্ষ্য করলেন তিনি। তাঁকে যেন সবাই এঁরা অপরাধী করছেন এমন ভাব

দেখিয়ে বললেন যে, নেহাত কর্তব্যের খাতিরেই বলতে বাধ্য হচ্ছেন, এমন কলঙ্ককর ব্যাপারটা গোপন করা সম্ভব হবে না। কারণ, সকালবেলায়ই চাকরানীটি বাইরে ছুটে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "মেমসাহেব আত্মহত্যা করেছেন!" ভেবেছিলেন যে নিঃশব্দে কোনোরকমে সমাধির কাজটা শেষ ক'রে ফেলবেন, কিন্তু তাও হ'ল না। সমাজের অনেকেই এর মধ্যে অনেক রকমের খারাপ কথা বলতে শুরু ক'রে দিয়েছিল। মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনতে পারলেন না লেভারশাইম। অনিচ্ছাসত্ত্বেও শয়নকামরার দিকে দৃষ্টি ফেললেন একবার। তারপর আবার তিনি মুখ নিচু ক'রে চেয়ে রইলেন মেঝের দিকে। সেই ভয়ংকর চিন্তাব সূত্রটা তিনি পুনরায় মনে মনে খোঁজবার চেষ্টা করছিলেন বটে, কিন্তু পারলেন না। এঁদের বিরুদ্ধমনোভাবাপন্ন অর্থহীন কথাবার্তার জন্য চিন্তার সূত্র সব জট পাকিয়ে যেতে লাগল। অসন্তুষ্ট মনোভাব নিয়ে এঁরা সবাই আধঘণ্টা পর্যন্ত ব'সে রইলেন ড্রইং-রুমে। তারপর এক এক ক'রে প্রত্যেকেই চ'লে গেলেন। আধো অন্ধকার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন শুধু লেভারশাইম। সারা দেহে অবসাদ নেমেছে। এমন একটা অপ্রত্যাশিত আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। এত বেশি অবসন্ন বোধ করছেন যে, বসবার উদ্যম পর্যন্ত লোপ পেয়ে গেল। বাইরে থেকে কে যেন দরজায় আওয়াজ করছিল। তিনি ব'লে উঠলেন, "ভেতরে এসো।"

দরজা খুলে গেল। দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপের আওয়াজ কানে এল তাঁর। এ-পদক্ষেপ তাঁর চেনা। আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন ব্যারন। মনে হ'ল কে যেন তাঁর টুটি চেপে ধরেছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু পেরে উঠলেন না, ঘাড়ের মাংস সব জমাট বেঁধে গিয়েছে। মনের আদেশ পালনের সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো। ঘরের মাঝখানে নিঃশব্দে এবং কম্পমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। ব্যারন অনুভব করলেন, ঘরের এই পাপগ্রস্ত নৈঃশব্দ্যটা কী অপরিসীম ঘৃণার ব্যাপার। তারপর তাঁর পেছন থেকে সেই নীরস গতানুগতিক প্রাণহীন কণ্ঠস্বরটা ভেসে উঠল, "আমি শুধু জিজ্ঞাসা করতে এসেছি যে, সাহেব আজ রাত্রে বাড়িতে খাবেন কি না।"

ব্যারন এবার আরও বেশি ক'রে কাঁপতে লাগলেন। মনে হ'ল, হৃৎপিণ্ডের উপর ঠাণ্ডা বরফ চেপে ব'সে গিয়েছে। বার তিনেক চেষ্টার পর তিনি বললেন, "ধন্যবাদ। আমি কিছুই খাব না।"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার আগেই তিনি তার চ'লে যাওয়ার পায়ের শব্দ পেলেন। এবার তাঁর দেহের অসাড় ভাবটা কেটে গেল। গাছের পাতার মতো দেহটা একবার কেঁপে উঠল তাঁর। এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে। ভেতর থেকে চাবি লাগিয়ে দিলেন। ঐ জঘন্য পদক্ষেপের আওয়াজটা তিনি আর শুনতে চান না। সোফার ওপর এলিয়ে পড়লেন লেভারশাইম। মন থেকে সেই ভয়ংকর চিন্তাটা দূর করবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু পারলেন না। শেষ পর্যন্ত এই চিন্তাটা মনের একটা ব্যাধির মতো হ'য়ে দাঁড়াল। দিনের বেলাতেও পেয়ে বসে তাঁকে। সারা জীবনের চেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল তাঁর। রাত্রির ঘুম মাথা কুটে মরতে লাগল সেই একই চিন্তার বুকে।

সমাধির কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী থেকে পালিয়ে গেলেন ব্যারন। বন্ধু এবং আত্মীয়স্বজনদের বক্রদৃষ্টি তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। তাঁদের সান্ত্বনা প্রকাশের মধ্যেও বিচারকের মনোভাব দেখতে পেলেন তিনি। যেন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত নেই। কিংবা এটা ব্যারনের কল্পনা নয় তো? কল্পিত, অথবা বাস্তব যাই হোক না কেন চতুর্দিকের পরিবেশটা তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। এমন কি প্রাণহীন বস্তুগুলোও বুঝি তাঁর দিকে অভিযোগের দৃষ্টি তুলে চেয়ে থাকে। প্রতিটি আসবাব, বিশেষ ক'রে শয়ন-কামরার আসবাবগুলো চোখে পড়লেই বিরক্তিতে মন তাঁর ভ'রে ওঠে। ঘরের মধ্যে এখনো সেই গ্যাসবাষ্পের বেদনাদায়ক সুমিষ্ট গন্ধটা ভেসে বেড়াচ্ছে। একদা তিনি যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন সেই কুৎসিত চাকরানীটা কিন্তু দিনরাত্তির এমন অবিচলিতভাবে খালি বাড়িটার মধ্যে নিজের কাজকর্ম ক'রে যাচ্ছে যে, মনে হয় এখানে বুঝি কোনো দুর্ঘটনাই ঘটেনি। স্টেশনে পৌছে তাঁর খুড়তুতো ভাইয়ের কাছে যখন প্রথম এই দুঃসংবাদটা শুনলেন সেই সময় থেকেই ব্যারন আনার সঙ্গে যোগযোগ স্থাপনের কথা ভাবলেই ভয়ে অস্থির হ'য়ে ওঠেন। দূর থেকে তার পায়ের আওয়াজ কানে এলেই পালিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রবল হয়ে ওঠে। সেই তার কর্কশ কণ্ঠস্বর, তেলচিটে চুলের গুচ্ছ, আবেগহীন মুখের আকৃতি এবং পশুর মতো বে-দরদী নির্মম মনোভাব ইত্যাদির কথা মনে পড়লেই ঘৃণায় সারা শরীর তাঁর রি রি ক'রে ওঠে। ক্রোধের

যাত্রা আয়ত্তের বাইরে চ'লে যায়। চিন্তার ভূতটাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে দেওয়ার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেন তিনি। ডাইনীটার আঙুলগুলো থেকে নিজের টুঁটিটাকে মুক্ত করতে পারেন না। অতএব ভিয়েনা থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মুক্তির পথ তিনি খুঁজে পেলেন না। গোপনে নিজের কাপড়চোপড় গুছিয়ে ফেললেন ব্যারন। আনাকে কোনো কথাই জানতে না দিয়ে নিঃশব্দে গৃহত্যাগ করলেন। একটা টুকরো কাগজে শুধু লিখে রেখে গেলেন যে, ক্যারিনথিয়ায় চ'লে যাচ্ছেন। এবং সেখানেই বন্ধুদের কাছে আপাতত বাস করবেন তিনি।

গ্রীষ্ম শেষ না হওয়া পর্যন্ত ভিয়েনায় আর ফিরে এলেন না লেভারশাইম। মাঝখানে অবিশ্যি স্ত্রীর সম্পত্তি-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁকে একবার ভিয়েনায় আসতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি নিজের বাড়িতে বাস করেননি, হোটেলে গিয়ে উঠেছিলেন। অশুভলক্ষণসূচক আনার চেহারাটা দেখতে চাননি ব্যারন। আনা অবিশ্যি জানতে পারেনি যে, মনিবটি ওর ভিয়েনায় এসেছিলেন। সে তার চিরাচরিত অভ্যাসমতো নিজের মধ্যেই ডুবে ছিল। কাজকর্ম নেই, পেঁচার মতো বিষণ্ণ মুখে রান্নাঘরেই সময় কাটায়—আগে সে গীর্জায় যেত একবার। এখন যায় দু'বার। ব্যারনের উকীল ওকে টাকাপয়সা পাঠান এবং হিসেবপত্র পরীক্ষা ক'রে দেখেনও তিনি। মনিব সম্বন্ধে কোনো খবরই সে পায় না। চিঠিপত্র লেখেন না, খবরও দেন না। নিঃশব্দে প্রতীক্ষা করে আনা। এই সময়ে ওর মুখের রেখাগুলি কঠিনতর হ'য়ে আসে। আগের চেয়েও কৃশ ব'লে মনে হয়। পুরনো দিনের মতো চলাফেরার মধ্যে স্থবিরতা ফিরে আসতে বিলম্ব হয় না। অদ্ভুত ধরনের এক বেদনাবোধহীন মানসিক পরিবেশের মধ্যে কয়েকটা মাস কাটিয়ে দিল আনা।

শরৎকালে অবিশ্যি খুব একটা জরুরী কাজের জন্য ব্যারনকে ফিরে আসতে হ'ল নিজের ফ্ল্যাটে। বাড়ির সামনে এসে দ্বিধা করতে লাগলেন তিনি। বন্ধুদের সঙ্গে এতদিন বাস করবার পর অতীতের অনেক কথাই ভুলে গিয়েছিলেন। এখন আবার সেই স্ত্রীলোকটিকে স্বচক্ষে দেখবার সম্ভাবনায় লেভারশাইম পীড়িত বোধ করতে লাগলেন। গা গুলতে লাগল তাঁর। স্ত্রীর মৃত্যুর পরের দিনেও ঠিক এই ধরনের পীড়ায় তিনি কষ্ট পেয়েছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে এক-একটা ধাপ ওপরে উঠছেন আর মনে হচ্ছে, একটা অদৃশ্য

হাত এসে তাঁর টুঁটি চেপে ধরল। ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগলেন, চলার গতি ক্রমশই ক'মে আসছে। চাবি লাগিয়ে দরজা খোলবার জন্ত তাঁকে সবটুকু সামর্থ্যই প্রয়োগ করতে হ'ল।

আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রান্নাঘর থেকে ছুটে এল আনা। মনিবকে দেখতে পেয়েই মুখের রং গেল বিবর্ণ হ'য়ে। তারপর যেন সম্মানপ্রদর্শনের জন্ত মাথা নিচু করল সে—মেঝে থেকে মনিবের ব্যাগটা তুলে নিল হাতে। অভিবাদন জানাবার জন্ত একটি কথাও বলল না। ব্যারন নিজেও অমনোযোগী হ'য়ে পড়েছিলেন। তাঁর মুখ দিয়েও কথা বেরুল না একটি। নিঃশব্দে আনা তাঁর ব্যাগটা শয়ন-কামরায় নিয়ে চলল, ব্যারনও নিঃশব্দে হেঁটে চললেন ওর পিছু পিছু। ঘরে ঢুকে জানলা দিয়ে চেয়ে রইলেন, অপেক্ষা করলেন যতক্ষণ না আনা বাইরে বেরিয়ে গেল। তারপর তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন দরজার কাছে, ভেতর থেকে তালা বন্ধ ক'রে দিলেন।

দীর্ঘদিন অনুপস্থিতির পর এটাই হ'ল উভয়ের মধ্যে একমাত্র শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

আনা অপেক্ষা করছিল। ব্যারনও অপেক্ষা করছিলেন তাঁর সেই ঘৃণা-উদ্রেককর মনোভাবটা কেটে যাওয়ার জন্ত। আনাকে দেখলেই তাঁর বমনেচ্ছা হয়। কিন্তু অবস্থার কোনো উন্নতি হ'ল না। দেখা তো দূরের কথা, ওর খসখস পায়ের আওয়াজ কানে এলেই মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে, বমনের উদ্রেক হয়। আনার তৈরি খাবার একদিনও তিনি খেতে পারলেন না। জামাকাপড় প'রে প্রত্যেকদিনই সকালবেলা বাড়ি থেকে প্রস্থান করেন। রাত্রি বেশি না হ'লে বাড়ি ফেরেন না। আনাকে এড়িয়ে চলাই তাঁর প্রধান কর্তব্য হ'য়ে ওঠে। দু'চারটে কাজের হুকুম যা দেন তাও ওর দিকে না চেয়েই দেন।

রান্নাঘরে টুলে ব'সে নির্বাকভাবে সময় কাটায় আনা। নিজের জন্ত রান্না করে না কিছু। খিদেবোধ লোপ পেয়েছে ওর। এবং কাউকেই একটি কথাও বলে না সে। ভীরু মনে ব'সে থাকে—অপেক্ষা করে কখন ওর প্রভুটি ওকে ডেকে পাঠাবেন। বোধশূন্ত হ'য়ে গিয়েছে সে। ও শুধু জানে যে, দেবতার মতো মনিবটি তার ওর দিকে আর ফিরেও তাকান না। মনিবের অসন্তুষ্টি ওকে কাঁটার মতো বেঁধে।

ব্যারন ফিরে আসবার তিন দিন পর বাইরের দরজায় ঘণ্টা বেজে উঠল একদিন। দরজা খুলতে ছুটে গেল আনা। বুড়ো ধরনের একটি লোক হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে। ব্যবহার দেখে মনে হ'ল মানুষটি শান্ত প্রকৃতির। দাড়ি-গোঁফ কিছু নেই। ভেতরে ঢুকতে চাইল সে। আনা তাকে বাধা দিল। তখন সেই আগন্তুকটি বলল যে, সাহেব নিজেই তাকে বেলা দশটার সময় আসতে বলেছেন। সে হচ্ছে সাহেবের নতুন সাজভৃত্য। অতএব সাহেবের কাছে এক্ষুনি তার আগমন-সংবাদ পৌছানো দরকার। খড়িমাটির মতো আনার মুখ সাদা হ'য়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্য অনড়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল সে।

তারপর আনা তিক্ত স্বরে ব'লে উঠল, "তুমি নিজেই গিয়ে মনিবকে তোমার খবর জানাও গে যাও।" কথা শেষ ক'রে চ'লে গেল সে। বিস্ময়াভিভূতভাবে লোকটি দাঁড়িয়ে রইল। আনা দ্রুতপায়ে ফিরে এল রান্নাঘরে—সজোরে দরজাটা বন্ধও ক'রে দিল।

ভৃত্যটি কাজ করতে লাগল। অতঃপর আনার সঙ্গে বাক্যালাপের কোনো প্রয়োজনই রইল না ব্যারনের। হুকুম যা যা দেওয়ার দরকার সবই তিনি দিতে লাগলেন ভৃত্যটির মারফৎ। এ শুধু শান্ত প্রকৃতির মানুষ নয়, কাজও করেছে অনেক ভালো ভালো লোকের কাছে। রান্নাঘরের বাইরে কি যে ঘটছে আনা আর জানতে পারল না। এখানকার জীবনপ্রবাহ ওর মাথার ওপর দিয়ে ব'য়ে যেতে লাগল, যেমন পাথরের ওপর দিয়ে জলের স্রোত যায় ব'য়ে।

এই দুঃখজনক অবস্থা দিন পনরো পর্যন্ত বলবৎ রইল। আনার ওপর এর প্রতিক্রিয়া ভালো হ'ল না। ক্ষয়রোগের মতো ভেতর থেকে খেয়ে যেতে লাগল। মুখের রেখা গেল ভেঙেচুরে, কপালের ওপর চুলের গুচ্ছ পেকে উঠল। আগে যদি কাঠের পুতুলের মতো চলাফেরা ক'রে থাকে, তাহ'লে এখন সে পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। অনড়ভাবে ব'সে ব'সে সময় কাটায়, জানলার মধ্যে দিয়ে চেয়ে থাকে উদাস দৃষ্টিতে। কিন্তু যখন কাজ করতে হয় তখন সে পাগলের মতো প্রচণ্ড উদ্যমে কাজ ক'রে চলে। কাজ নয় যেন বিস্ফোরণ!

পনরো দিন পর সাজভৃত্যটি একদিন সকালবেলা অযাচিতভাবে মনিবের

ঘরে এসে প্রবেশ করল। এমন বিনীত ভঙ্গিতে সে অপেক্ষা করতে লাগল যদ্দারা অনুমান করা যায় যে, একটা খবর পৌঁছবার জন্যই সে নীরবে অপেক্ষা ক'রে আছে। আগেও একবার সে ঐ গেঁয়ো স্ত্রীলোকটির আপত্তিকর ব্যবহারের বিরুদ্ধে মনিবের কাছে নালিশ জানিয়েছিল। এবং স্ত্রীলোকটিকে কাজ থেকে বরখাস্ত করবার নোটিশ দেওয়ার জন্য সুপারিশও করেছিল। সেই সময় আনার প্রতি করুণা প্রকাশের জন্যই ব্যারন তাঁর সাজভৃত্যের সুপারিশটা অনুমোদন করেননি। দ্বিতীয়বার আর সে কথাটা বলতে সাহস পায়নি। কিন্তু এবারকার আর্জিটা তার খুব জরুরী ব'লে মনে হ'ল। লেভারশাইম তবুও বললেন যে, বহুদিনের পুরনো চাকরানী সে, এবং বরখাস্ত করবার যথেষ্ট কারণ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। এর পরেও ভৃত্যটি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো ব্যারনের দিকে চেয়ে রইল এবং বরখাস্তের আর্জিটা পেশ ক'রে বলতে লাগল, "সার, আপনি আমাকে নিশ্চয়ই বোকা ভাববেন, কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে……ঐ স্ত্রীলোকটিকে আমি ভয় পাই… পেছনে পেছনে কথা বলার চোরা মনোবৃত্তি ওর, আর বিদ্বেষপরায়ণতাও বটে …সাহেব নিশ্চয়ই অবগত নন যে, কী সাংঘাতিক ধরনের একজন পরিচারিকা তাঁর সংসারে বাস করছে।"

লেভারশাইম আতঙ্কিত বোধ করলেন বটে, কিন্তু লোকটির অভিযোগগুলো তাঁর কাছে অত্যন্ত অস্পষ্ট ব'লেই মনে হ'ল। তিনি বললেন, "অ্যান্টন তোমার কথামতো যদি আমায় কাজ করতে হয় তাহ'লে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট ক'রে বলা দরকার।"

"দেখুন সাহেব, নিশ্চিতভাবে আমি কিছু বলতে পারব না। আমার মনে হয়, আনার প্রকৃতি বন্য পশুর মতো—পুরোপুরি পোষ মানেনি এখনো। যে-কোনো দিন আমার কিংবা আপনার ক্ষতি ক'রে বসতে পারে। যেসব কাজের হুকুম দিয়েছিলেন আপনি, কাল যখন সেগুলো ওকে বলছিলাম তখন সে চোখ তুলে তাকাল …..সার, কী সাংঘাতিক ওর দৃষ্টির ভঙ্গী……ঝলমল করছে ওর জ্বলন্ত দৃষ্টি, যেন আমার ওপর লাফিয়ে প'ড়ে গলায় দাঁত বসাতে চায়। সত্যি কথা বলতে কি, ওর রান্না করা খাবার খেতে ভয় করে আমার। যে-কোনো দিন আমাকে কিংবা আপনাকে বিষ খাওয়াতে পারে সে। সাহেবের ধারণা নেই যে, কী সাংঘাতিক ধরনের স্ত্রীলোক! কথা শুনে বিচার

করা অসাধ্য। কারণ সে কোনো কথাই বলে না। ও যে খুন করতে পারে সে সম্বন্ধে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

শঙ্কিতভাবে লেভারশাইম অভিযোগকারীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। লোকটি কি কোথাও গুজব শুনেছে? কিংবা সত্যিকারের সন্দেহ কিছু হয়েছে? ব্যারন বুঝতে পারলেন তাঁর হাতের আঙুলগুলো কাঁপছে। জলন্ত সিগারটা তিনি ছাইদানির ওপর নামিয়ে রাখলেন, নইলে সাজভৃত্যের কাছে ধরা প'ড়ে যেতেন। কিন্তু অ্যান্টনের মুখ দেখে মনে হ'ল সে অবিচলিত রয়েছে। ব্যারন সংশয়ের দোলায় দুলতে লাগলেন। সাজভৃত্যের ইচ্ছার সঙ্গে এবার তাঁর নিজের ইচ্ছাও মিশে গেল। হ্যাঁ, আনাকে বিদায় ক'রে দেওয়াই ভালো। তিনি বললেন, "আমি জোর ক'রে কোনো কিছু করতে চাই না। বোধহয় তোমার কথাই ঠিক। কিন্তু আরও ক'টা দিন অপেক্ষা ক'রে দেখা যাক। এর পরে আবার যদি সে তোমার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করে তাহ'লে অবিশ্যি আমাকে জিজ্ঞাসা না ক'রেই ওকে তুমি বরখাস্তের নোটিশ দিতে পারো। ওকে বলবে আমার হুকুমমতোই কাজ করছ তুমি।"

"এই ভালো হ'ল, স্যার।" জবাব দিল অ্যান্টন।

ব্যারন এবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। স্বস্তি অনুভব করলেন তিনি। যদিও এই অদ্ভুত জীবটির কথা মনে পড়তেই সারাটা দিন তাঁর তিক্ততায় নষ্ট হ'য়ে গেল। সবচেয়ে ভালো হয়, আনাকে যদি তাঁর অনুপস্থিতকালে কাজ থেকে বরখাস্ত করা যায়। বড়দিনের সময় হয়তো তিনি ভিয়েনার বাইরে যাবেন। ডাইনীটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চিন্তায় মনে মনে শান্তি অনুভব করলেন ব্যারন। হ্যাঁ, বড়দিনের সময়টাই সবচেয়ে ভালো। তখন তিনি বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাবেন বাইরে।

পরের দিন সকালবেলা চা খাওয়া শেষ ক'রে খবরের কাগজ পড়ছিলেন লেভারশাইম। দরজায় আওয়াজ হ'ল। তিনি বললেন, "ভেতরে এসো।" কথাটা ভেবে বলেননি। সহসা তিনি দেখলেন সেই ডাইনীটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পরিবর্তন লক্ষ্য ক'রে চমকে উঠলেন ব্যারন। আগের চেয়েও চেহারাটা খারাপ হ'য়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে, কালো কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত দেহটা একটা কঙ্কাল। তাঁর বিদ্বেষের ভাবটা ক'মে এল যখন তিনি দেখলেন চাকরানীটা সভয়ে এবং নতমস্তকে খানিকটা দূরে এসে দাঁড়িয়ে

পড়ল। সামনে এগিয়ে আসতে আর সে সাহস পাচ্ছে না। নিজের মনোভাব বুঝতে না দিয়ে ব্যারন জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার আনা ?" চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যারন তাঁর কণ্ঠস্বরের উষ্মা গোপন করতে পারলেন না। আনা সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল, মেঝের কার্পেটের দিকে চেয়ে ছিল সে, মুখ তুলল না। অনেকক্ষণ বিরতির পর সে কোনো রকমে বলল, "অ্যান্টন···অ্যান্টন বলছিল যে, সাহেব নাকি আমায় জবাব দিয়েছেন।"

লেডারশাইম এবার সত্যি সত্যি দুঃখ বোধ করলেন। উঠে পড়লেন তিনি। ব্যাপারটা যে এত তাড়াতাড়ি ঘটবে তেমন ধারণা ছিল না তাঁর। ধীরে ধীরে কথা বলতে লাগলেন ব্যারন। অ্যান্টন বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো ক'রে ফেলেছে। আনা যদি অ্যান্টনের প্রতি সংব্যবহার করত তাহ'লে গণ্ডগোল সব সহজেই মিটে যেত। চাকরবাকরদের উচিত একের প্রতি অপরের ভদ্র ব্যবহার করা, ইত্যাদি।

মনিবের কথাগুলোর প্রতি আনার যেন বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই। মেঝের দিকে চোখ নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনিবের মুখ থেকে যে-কথাটা সে শুনতে চেয়েছিল সেটা এখনো তিনি বলেননি। বিশ্রী রকমের একটা নিঃশব্দ পরিবেশ বিরাজ করতে লাগল। মিনিট তিন পর সে বলল, "আমি জানতে চাই যে সাহেব কি সত্যি সত্যি আমাকে জবাব দেওয়ার কথা অ্যান্টনকে বলেছেন কি না।" কথাগুলো যেন আনা ব্যারনের দিকে তীব্র ভঙ্গিতে ছুঁড়ে মারল। শাসিয়ে উঠল কি সে ? কি বলতে চায় স্ত্রীলোকটা ? ব্যারনের মন থেকে ভয় এবং সহানুভূতি সবই গেল উবে। এতদিনকার পুঞ্জীভূত বিদ্বেষের ভাবটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চ'লে গেল তাঁর। যেন প্রচণ্ড জলের স্রোত বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। সব সম্পর্কই এবার তিনি চুকিয়ে দিতে চান। সহসা গলার স্বর বদলে ফেললেন ব্যারন। সোজাসুজি তিনি বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ, অ্যান্টনকে জবাব দেওয়ার কথা আমিই বলেছিলাম। গণ্ডগোল সব মিটিয়ে ফেলবার জন্যই ওকে আমি সংসারের সব দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি। সে যদি তোমায় জবাব দিয়ে থাকে, তাহ'লে তোমায় যেতেই হবে। অবিশ্যি তুমি যদি ওর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করো তাহ'লে না গেলেও চলে। আমি তবে ওকে বলব তোমার অপরাধ সব ক্ষমা ক'রে দিতে। নইলে তোমায় চ'লে যেতেই হবে, এবং যত তাড়াতাড়ি যাবে ততই ভালো।"

আনা যদি সত্যি সত্যি শাসাতে এসে থাকে, তাহ'লে ওর সঙ্গে কড়া ব্যবহার করাই উচিত হয়েছে। ওর ঔদ্ধত্য সহ্য করা অসম্ভব।

আনা এবার মুখ তুলল। ভয় দেখাবার ভাবটা আর নেই। ভুতুড়ে পশুর মতো মনে হ'ল।

ভাঙা-ভাঙা স্বরে সে বলল, "ধন্যবাদ সাহেব। আমি এক্ষুনি চ'লে যাচ্ছি। আমি আপনাকে আর বিরক্ত করতে চাই না।"

সেই দিন সন্ধেবেলা থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরলেন ব্যারন। চিঠিপত্র কি এসেছে দেখবার জন্য তিনি লাইব্রেরীতে ঢুকলেন। হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল যে, টেবিলের ওপর একটা ছোট্ট কাঠের বাক্স রয়েছে। আগে কখনো এটা চোখে পড়েনি তাঁর। বাক্সতে চাবি লাগানো নেই। তিনি দেখলেন, বাক্সের মধ্যে ছোটখাটো নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় ক'টা জিনিস সাজানো রয়েছে। জিনিস ক'টা তাঁর নিজেরই দেওয়া। শিকার করতে গিয়েছিলেন একবার ব্যারন। সেই সময় কয়েকটা পোস্টকার্ড তিনি আনাকে লিখেছিলেন। এখন দেখলেন, পোস্টকার্ডগুলো রয়েছে এই বাক্সটার মধ্যে। দু'টো থিয়েটারেব টিকিট, আর একটা রুপোর আংটিও চোখে পড়ল তাঁর। এগুলোও আনাকে দিয়েছিলেন তিনি। তাছাড়া কতগুলো টাকার নোট ছিল এতে। আনার সারাজীবনের সঞ্চয় এই টাকা। বিশ বছর আগে টাইরলে থাকতে একটা ফোটো উঠিয়েছিল সে। সেই ফোটোখানাও দেখলেন তিনি।

হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলেন ব্যারন। অ্যাণ্টনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর টেবিলের ওপর আনা কেন এইসব জিনিস ফেলে গিয়েছে। সাজভৃত্যটি গেল তার পরম শত্রু আনার কাছে এর কৈফিয়ৎ চাইবার জন্য। কিন্তু রান্নাঘরে তাকে দেখতে পাওয়া গেল না। এমন কি সারাটা বাড়ি খুঁজে দেখল সে, আনা কোথাও নেই। পরের দিন খবরের কাগজে ছোট্ট একটা খবর বেরুল। চল্লিশ বছর বয়স্কা একটি স্ত্রীলোক ড্যানুব নদীতে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে আত্মহত্যা করেছে। মনিব এবং ভৃত্য দু'জনের কাছেই লেপোরেলার পরিণতিব কথা আর অজ্ঞাত রইল না।

— ———

স্তেফান জ্বোয়াইগ পরিচিতি

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় সাহিত্যের ইতিহাসে স্তেফান জ্বোয়াইগ একটি স্মরণীয় নাম। আঠার শ' একাশি খৃষ্টাব্দের আটাশে নভেম্বর অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে এক সম্ভ্রান্ত ধনী ইহুদী পরিবারে জ্বোয়াইগের জন্ম হয়।

স্কুলের পড়া শেষ করে জ্বোয়াইগ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং দর্শন-শাস্ত্রে ডক্টরেট লাভ করেন। দেশভ্রমণ নেশা আর বইই ছিল তাঁর জীবনের পরম আকর্ষণ। এই ভ্রমণের নেশায় তিনি ভারতবর্ষেও এসেছিলেন এবং এখানকার তাজমহল তাঁকে যে কতখানি মুগ্ধ করেছিল সে কথাও লিখে গেছেন একটি অনবদ্য কবিতায়—তাজমহলের উপর।

স্কুলে থাকতেই জ্বোয়াইগ লিখতে আরম্ভ করেন এবং তাঁর লেখা সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। কবিতা, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, জীবনী, প্রবন্ধ ও অনুবাদ—প্রতিটি সাহিত্যকর্মেই তাঁর গভীর জ্ঞানের পরিচয় মেলে। প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক জুল রোঁমার ভাষায়—স্তেফান জ্বোয়াইগ ছিলেন ইউরোপের সাতজন মনীষীর একজন। ইউরোপের বহু ভাষা তিনি ভালভাবেই জানতেন এবং অনুবাদকর্মে ছিল তাঁর অসাধারণ দক্ষতা। অনুবাদ করাকে তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা বলেই মনে করতেন।

জ্বোয়াইগের সাহিত্যকর্মের মূল প্রেরণা মানবতা ও নীতিবোধ। এই দুইয়ের শ্রেষ্ঠত্বই প্রাধান্য লাভ করেছে তাঁর সমুদয় লেখার মধ্যে। মানবচরিত্র-চিত্রণে ও বিশ্লেষণে তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু ফ্রয়েডের মনোবিজ্ঞানের ধারা অনুসরণ করতে দেখা যায় তাঁকে। নবীন প্রতিভাবানদের তিনি ছিলেন পরম উৎসাহদাতা। রাজনীতির প্রতি ছিল তাঁর একান্ত বীতরাগ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ইংলণ্ডে চলে গিয়ে উনিশ শ' চল্লিশ খৃষ্টাব্দে সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করে চলে যান আমেরিকায় এবং শেষ পর্যন্ত ব্রেজিলের পেট্রোপলিশ শহরে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের অভিলাষী হন। কিন্তু তাঁর জীবনের সৌন্দর্য-বোধ ও স্বপ্নের সঙ্গে কুৎসিত বাস্তব জগতের সংঘাতজনিত মানসিক দ্বন্দ্বে অবসন্ন জ্বোয়াইগ তাঁর সহধর্মিণীকে নিয়ে হিংসায় উন্মত্ত এই নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে স্বেচ্ছায় বিদায় গ্রহণ করেন উনিশ শ' বিয়াল্লিশের তেইশে ফেব্রুয়ারি।